উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। ২০২১-এ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে "এ" গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এবং ২০২৪-এ সমগ্র দেশের মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাক্ষেত্রে NIRF মূল্যায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পাশাপাশি, ২০২৪-এই 12B-র অনুমোদন প্রাপ্তি ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP, ২০২০)-র নির্দেশনামায় সিবিসিএস পাঠক্রম পদ্ধতির পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP)-এ চার বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমকে ছ'টি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল- "কোর কোর্স", "ইলেকটিভ কোর্স", 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স' "স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স", "এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স" এবং ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স। ক্রেডিট পদ্ধতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। জাতীয় শিক্ষানীতি পরিমাণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF), National Credit Framework (NCrF) এবং National Skills Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রস্তুতির দিশা দেখিয়েছে। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক, যা অবিচ্ছিন্ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি-র জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি
উপাচার্য

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

চতুর্বার্ষিক স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম

Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes)

স্নাতক (সাম্মানিক) বাংলা পাঠক্রম **(NBG)**

কোর্স : ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক কোর্স **(DSC)**

কোর্সের শিরোনাম : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (বিংশ শতাব্দী)

কোর্স কোড : **6CC-BG-07**

প্রথম মুদ্রণ : মার্চ, 2025

বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত
Printed in accordance with the regulations of the
Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

চতুর্বার্ষিক স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম

Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF)
& Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes)

স্নাতক (সাম্মানিক) বাংলা পাঠক্রম (NBG)

কোর্স : ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক কোর্স (DSC)

কোর্সের শিরোনাম : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (বিংশ শতাব্দী)

কোর্স কোড : 6CC-BG-07

মডিউল : ১, ২, ৩, ৪ Module : 1, 2, 3, 4

কোর কোর্স ঃ ২/ Core Course : CC-07	লেখক Course writer	সম্পাদক Course Editor
মডিউল ঃ ১ Module: 1	কানাইলাল সেন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, দমদম মতিঝিল কলেজ	ড. নীহারকান্তি মণ্ডল সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মুরলীধর গার্লস কলেজ কলিকাতা অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
মডিউল ঃ ২ Module: 2	তপনকুমার দত্ত অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, লাভপুর কলেজ	
মডিউল ঃ ৩ Module: 3	নবনীতা বসু অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, সিঙ্গুর মহাবিদ্যালয়	
মডিউল ঃ ৪ Module: 4	তপনকুমার দত্ত অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, লাভপুর কলেজ তারাপদ বেরা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়	

ফর্ম্যাট এডিটিং : সায়নদীপ ব্যানার্জি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

ঃ স্নাতক-বাংলা বিষয় সমিতি ঃ

ড শক্তিনাথ ঝা, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, কৃষ্ণনাথ কলেজ, মুর্শিদাবাদ
বাণীমঞ্জরী দাস, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা, বেথুন কলেজ, কলিকাতা
ড নীহারকান্তি মণ্ডল, সহযোগী অধ্যাপক, মুরলীধর গার্লর্স কলেজ, কলিকাতা
ড চিত্রিতা ব্যানার্জি, সহযোগী অধ্যাপক, শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ, কলিকাতা
আব্দুল কাফি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
ড অনামিকা দাস, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
ড. প্রতুলকুমার পণ্ডিত, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ ও
অধিকর্তা, মানববিদ্যা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ঃ আমন্ত্রিত সদস্য ঃ

ড প্রাপ্তি চক্রবর্তী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
সায়নদীপ ব্যানার্জি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গীতশ্রী সরকার, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ উপকরণের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে এই পাঠ উপকরণের কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা পুনরুৎপাদন এবং কোনোরকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ বে-আইনি ও নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় বিধিসম্মত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

অনন্যা মিত্র
নিবন্ধক (অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত)

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

চতুর্বার্ষিক স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম

Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes)

স্নাতক (সাম্মানিক) বাংলা পাঠক্রম (NBG)

কোর্স : ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক কোর্স (DSC)

কোর্সের শিরোনাম : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (বিংশ শতাব্দী)

কোর্স কোড : 6CC-BG-07

মডিউল : ১, ২, ৩, ৪ Module : 1, 2, 3, 4

মডিউল-১ ঃ কাব্য - কবিতা

একক-১	❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৯
একক-২	❑ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৩৩
একক-৩	❑ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মোহিতলাল মজুমদার	৩৮
একক-৪	❑ কাজী নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাশ	৪৬
একক-৫	❑ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে	৫৮
একক-৬	❑ সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬৪
একক-৭	❑ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং কবিতা সিংহ	৭৫

মডিউল-২ ঃ নাটক ও নাট্যকার

একক-৮	❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮৫
একক-৯	❑ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	৯১

একক-১০	❑	বিজন ভট্টাচার্য	৯৭
একক-১১	❑	তুলসী লাহিড়ী, মন্মথ রায়	১০৩
একক-১২	❑	উৎপল দত্ত, বাদল সরকার	১১১

মডিউল-৩ ঃ কথাসাহিত্য

একক-১৩	❑	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২১
একক-১৪	❑	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১২৯
একক-১৫	❑	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৫
একক-১৬	❑	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪২
একক-১৭	❑	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪৮
একক-১৮	❑	সতীনাথ ভাদুড়ী	১৫৪
একক-১৯	❑	জগদীশ গুপ্ত, পরশুরাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবোধ ঘোষ	১৫৯
একক-২০	❑	নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, আশাপূর্ণা দেবী	১৬৯

মডিউল-৪ ঃ প্রবন্ধ ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা

একক-২১	❑	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৮১
একক-২২	❑	প্রমথ চৌধুরী, গোপাল হালদার, সৈয়দ মুজতবা আলী, বুদ্ধদেব বসু	১৯০
একক-২৩	❑	সবুজপত্র, কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, প্রবাসী	১৯৯
একক-২৪	❑	ভারতবর্ষ, শনিবারের চিঠি, পরিচয়, কবিতা, কৃত্তিবাস	২০৬

মডিউল-১
কাব্য - কবিতা

একক-১ ❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গঠন

১.১. উদ্দেশ্য
১.২ প্রস্তাবনা
১.৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য আলোচনা
১.৩.১ প্রথম পর্ব
১.৩.২ দ্বিতীয় পর্ব
১.৩.৩ তৃতীয় পর্ব
১.৩.৪ চতুর্থ পর্ব
১.৩.৫ পঞ্চম পর্ব
১.৩.৬ ষষ্ঠ পর্ব
১.৪ সারাংশ
১.৫ অনুশীলনী
১.৬ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে বাংলা সাহিত্যের শিক্ষার্থীরা আধুনিক বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন। বাংলা কাব্যধারায় বিভিন্নপর্বে রবীন্দ্রনাথ যে-সমস্ত কাব্য-কবিতা রচনা করেছেন সেই ধারার পরিচয় পাওয়া যাবে। এই এককে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা আছে। আছে কাব্যগুলোর শ্রেণিবিভাজন করা এবং সেগুলির পরিচয় দান করা। এই একক থেকে জানা যাবে বিভিন্ন পর্বে রবীন্দ্রকাব্যের ধারায় পরিবর্তন এসেছে নানাভাবে। এসেছে গতিবাদ, জীবনদেবতা, সৃষ্টিতত্ত্বের কথা। বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বার বার নতুন নতুন ধারা যেভাবে আনার চেষ্টা করেছেন সেগুলো জানানো এই এককের উদ্দেশ্য।

১.২ প্রস্তাবনা

১৮৬১ খ্রিঃ প্রকাশিত হয় মধুসূদনের সাহিত্যিক মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য'। বাংলা কাব্যে শুরু হল নতুন যুগের। রামপ্রসাদের মাতৃ আরাধনামূলক ভক্তিগীতি, কবিওয়ালাদের তাৎক্ষণিক মনোরঞ্জনের উপাদান সম্বলিত কবিগান এবং ঈশ্বর গুপ্তের খণ্ড কবিতার পর্যায় অতিক্রম করে বাংলা কবিতা প্রতিষ্ঠিত হল ক্লাসিক রূপরীতির বলিষ্ঠ ভিত্তিতে। বাংলা কবিতা প্রবাহিত হল নতুন প্রত্যয়, নতুন জীবন বিশ্বাসের অভিমুখে। সেদিক থেকে মধুসূদন যথার্থই বাংলা কাব্যের ভগীরথ। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দেই মধুকবি লিখলেন আত্মোদঘাটন মূলক কবিতা 'আত্মবিলাপ'। অস্পষ্ট হলেও এই কবিতাতেই প্রথম শোনা গেল বাংলা গীতিকবিতার আগমনী সুর।

মধুসূদন তখন বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। খ্যাতির গৌরব তাঁর করায়ত্ত। যশ-দীপ্ত কবির 'আত্মবিলাপ'-এর আক্ষেপ মহৎ কবির রোমান্টিক বিষণ্ণতার অভিব্যক্তির কথাই মনে করায়। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দেই জন্ম বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব 'কবি সার্বভৌম' রবীন্দ্রনাথের। যাঁর হাতে ১৯ শতকের শেষ পর্বে বাংলা গীতিকবিতার স্বর্ণযুগের সূচনা এবং বিকাশ।

বাংলা কবিতার বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনার ভূমিকা রূপে উপরিউক্ত প্রসঙ্গটি উল্লেখিত হল। পৃথিবীর কবিতার ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেখানে কবিতার ক্লাসিক ও রোমান্টিক রীতির আবর্তন ঘটে চক্রাকারে। ক্লাসিক রীতির সুদৃঢ় বাঁধন, রূপ-রীতির কঠিন অনুশাসনের অনুবর্তিতায় কবিতার যুগান্তরের যাত্রাপথে অজানা কোনো ইঙ্গিতে আবার সূচনা হয় অন্তরমুক্তির বন্দনা গানের। সুউচ্চ পর্বতচূড়ায় ঘনীভূত তুষার রাশি হৃদয়-সূর্যের উত্তাপে বিগলিত হয়ে ছোটো ছোটো ঝরণার আকারে ছন্দিত কলতানে মুক্তির উৎসবে মেতে ওঠে। ক্লাসিক রীতির বন্ধন মুক্তির শেষে শুরু হয় রোমান্টিক গীতিকবিতার উৎসব। বাংলা কবিতার ইতিহাস এর ব্যতিক্রম নয়। মধুসূদনের ক্লাসিক কাব্যরীতি অনুসরণ করেছিলেন নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রমুখ। তাঁরাই ছিলেন এই রীতির ধারক ও বাহক। 'ভোরের পাখি' বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯) কাব্যের মাধ্যমেই বাংলা কাব্যে গীতিকবিতা ধারার যথার্থ প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথের দিগন্ত প্রসারী প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শে গীতিকবিতার অপ্রতিহত জয়যাত্রা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুগান্তরের নির্দেশক। উনিশ শতকের শেষ দুই দশক এবং বিশ শতকের চার দশক রবীন্দ্রনাথের কবিতার বহু বিস্তৃত ইতিহাস। রবীন্দ্র প্রভাব মুক্তির দুরন্ত বাসনা এবং বিরুদ্ধতার পথ ধরেই বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলা কাব্যে নতুন ধারার সূত্রপাত। এই নব্যধারা ক্রমে প্রবল হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিজয় গৌরবের আসনটি সৃষ্টির অপার সম্মোহনে অবিচল থেকেছে।

১.৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য আলোচনা

১.৩.১ প্রথম পর্ব ঃ

রবীন্দ্র কবিমনের প্রারম্ভিক পর্বের সূচনা যথার্থ বিচারে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থ থেকে। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর প্রকাশকাল ১৮৮২। সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালাবার প্রয়োজনে যেমন পূর্বাহ্নেই সলতে প্রস্তুতির প্রয়াস থাকে, তেমনি 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' প্রকাশের আগেই রবীন্দ্রমননে চলেছিল কাব্য সাধনার প্রস্তুতি পর্ব। সে সময়ের অপরিণত সৃষ্টিগুলি হল— 'কবি কাহিনী', 'বনফুল', 'ভগ্নহৃদয়'। এগুলি লেখা হয়েছিল ১৮৭৮ থেকে ১৮৮১ সালের মধ্যে। কবির কাব্যসৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্বের কাব্যগ্রন্থগুলি হল 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২), প্রভাত সঙ্গীত (১৮৮৩), ছবি ও গান (১৮৮৪), 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি' (১৮৮৪), 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬)।

এরপর নবসৃষ্টির উল্লাসে মেতে উঠলেন কবি। শুরু হল অপরূপ ভাব-ভাবনার বর্ণময় কাব্য-মালা গাঁথা। বাংলা কাব্য ভুবন সাজিয়ে তুললেন অভূতপূর্ব বর্ণময়তায়। শুরু হল রোমান্টিক কবির সৌন্দর্য অভিসার। কবির এই সমৃদ্ধি পর্বের সৃষ্টি মানসী (১৮৯০), সোনার তরী (১৮৯৪), চিত্রা (১৮৯৬), কণিকা (১৯০০), কথা ও কাহিনী (১৯০০), কল্পনা (১৯০০), ক্ষণিকা (১৯০০)। এই সমৃদ্ধি পর্বের বিস্তার ১৯১০ সালে লেখা 'খেয়া'র পূর্ব পর্যন্ত ধরা যেতে পারে। এ সময়ে প্রকাশিত হয় নৈবেদ্য (১৯০২), স্মরণ (১৯০৩), শিশু (১৯০৩), উৎসর্গ (১৯০৪)। 'শিশু' কাব্যগ্রন্থে সে সময়ে লেখা শিশু বিষয়ক কবিতাগুলির সঙ্গে পূর্ববর্তীকালে লেখা এই পর্যায়ের অনেকগুলি কবিতাও যোগ করা হয়েছিল।

'খেয়া' (১৯০০) রবীন্দ্র কাব্যের সুর পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী। এখানে কবি অন্তর্গভীরে ডুব দিয়েছেন। এর পরবর্তী কাব্যগুলিতে বেজে উঠেছে অরূপভাবনার উদাস রাগিনী। বাইরের জগত থেকে দূরে এসে তিনি ডুব দিয়েছেন অন্তর গভীরে অরূপ রতনের সন্ধানে। এই পর্বের কাব্যগুলি— গীতাঞ্জলি (১৯১১), গীতিমাল্য (১৯১৪) গীতালি (১৯১৫)।

কবি দীর্ঘদিন অরূপ জগতে আবদ্ধ থাকেননি। পৃথিবীর জনকোলাহলের বাতাবরণে ফিরে এসেছেন। আবার দুরন্ত গতির আবর্তে সৃষ্টির তরণী ভাসিয়েছেন। রবীন্দ্র কাব্যবীণায় নতুন রাগিনীর ঝংকার শোনা গেছে। এই নতুন পর্বের কাব্য বলাকা প্রকাশিত হয়েছে ১৯১৬ সালে। এরপর পলাতকা (১৯১৮), শিশু ভোলানাথ (১৯২২), পূরবী (১৯২৫), লেখন (১৯২৭), মহুয়া (১৯২৯) বনবাণী (১৯৩১) পরিশেষ (১৯৩২)।

এর পরবর্তী পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা অস্তরাগের আভায় দূরাগত বিষণ্ণতার বর্ণলেপনে ধূসর। গোধূলির রক্তিমতায় দিনান্তের আভা। এই পর্বে কবির কাব্য সৃষ্টি পুনশ্চ (১৯৩২), বিচিত্রিতা (১৯৩৩), শেষ সপ্তক (১৯৩৫), বীথিকা (১৯৩৫) পত্রপুট (১৯৩৬) শ্যামলী (১৯৩৬) প্রান্তিক (১৯৩৮), সেঁজুতি (১৯৩৮), প্রহাসিনী (১৯৩৮), আকাশ প্রদীপ (১৯৩৯), নবজাতক (১৯৪০), সানাই (১৯৪০), রোগশয্যায় (১৯৪০), আরোগ্য (১৯৪১), জন্মদিনে (১৯৪১), শেষ লেখা (১৯৪১- মৃত্যুর পর প্রকাশিত)। কৌতুক রসের কাব্য খাপছাড়া (১৯৩৭), ছড়ার ছবি (১৯৩৭)।

১.৩.২ দ্বিতীয় পর্ব ঃ

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির সূচনা পর্ব ধরা হয় 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে। এই কাব্যেই কবি প্রথম নিজেকে খুঁজে পান। নিজের চেতনা উৎস থেকে যে ভাবনার উন্মেষ তাকেই রূপায়িত করেছেন এ সময়ের কবিতায়। কাব্য হিসাবে এই সৃষ্টিগুলির যে খুব বেশি মূল্য নেই একথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর বদ্ধতার মোহজাল কেটে কবির মুক্তি ঘটেছে 'প্রভাতসঙ্গীত'-এর নব্যচেতনার রাগিনীতে। বিশ্ব পৃথিবীর উদার পটভূমিতে কবিচিত্ত শুনেছে মুক্তির গান। 'প্রভাত উৎসব' কবিতায় তারই স্বীকারোক্তি। এখানে কবি দ্বিধাহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন— 'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি/জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।' হৃদয়ের অন্তর্জগত থেকে এখানে বহির্বিশ্বের উদার জগতের মুক্তির বার্তা কবি শুনেছেন। 'প্রভাতসঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে 'জীবনস্মৃতি'তে কবি বলেছেন— 'জগতে কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর'— ও একটা বয়সের বিশেষ অবস্থা। যখন হৃদয়টা সর্বপ্রথম জাগ্রত হয়ে দুই বাহু বাড়িয়ে দেয় তখন মনে করে সে যেন সমস্ত জগৎটাকে চায়, যেমন নবোদগত-দন্ত শিশু মনে করেন সমস্ত বিশ্ব-সংসার তিনি গালে পুরে দিতে পারেন। ... প্রভাতসঙ্গীত আমার অন্তর-প্রকৃতির প্রথম বহির্মুখ উল্লাস, সেইজন্য ওটাতে কিছুমাত্র বাছবিচার নেই।"

এখানে কবি বিশ্বের সমগ্র আনন্দময় সত্তাকে অনুভব করেছেন। এই পর্যায়ে কবি মনে অঙ্কুরিত হয়েছে সীমার মধ্যে অসীমের অনুভূতির ভাবনা। 'প্রভাতসঙ্গীত'-এর পর্বে কবি বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার অপার আনন্দের আস্বাদ পেয়েছেন। আবার এরই পাশাপাশি জড়জগৎ ও মানবজীবনের স্থায়িত্ব সম্পর্কেও একটা সংশয়— তাঁর মনে প্রশ্ন তুলেছে। এ জগতে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়, কবির নিজের গানও একদিন নিঃশেষিত হবে। তিনি বলেছেন—

"এ আমার গানও দুদণ্ডের গান
রবে না রবে না চিরদিন,

পূরব আকাশ হতে উঠিবে উচ্ছ্বাস

পশ্চিমেতে হইবে বিলীন’

মৃত্যুর লীলা কবি প্রত্যক্ষ করেছেন—

“কোটি কোটি ছোট ছোট মরণেরে লয়ে

বসুন্ধরা ছুটিয়ে আকাশে,

হাসে খেলে মৃত্যু চারিপাশে।

এই ধরণী মরণের পথ,

এ জগৎ মৃত্যুর জগৎ।

এর পাশাপাশি অন্য এক জীবন সত্যে কবি উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন “মৃত্যু অনন্ত জীবনধারার এক একটা বাঁক মাত্র। মৃত্যু কেবল সেই নিত্যস্রোতের বেগকে বিভিন্ন মুখে ফিরাইয়া দিয়াছে। মৃত্যু বারেবারে জীবনকে নব নব রসে পূর্ণ করিতে করিতে চলিয়াছে— নব নব সম্ভাবনায় ভরিয়া দিয়াছে।” নিঃসংশয় কবি কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে এই প্রত্যয়। তিনি বলেছেন—

“নাই তোর নাইরে ভাবনা,

এ জগতে কিছুই মরে না।”

এবং

“মরণ বাড়িবে যত কোথায় কোথায় যাব

বাড়িবে প্রাণের অধিকার,

বিশাল প্রাণের মাঝে কত গ্রহ কত তারা

হেথা হোথা করিবে বিহার।”

‘প্রভাতসঙ্গীত’-এর ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ কবিতা আসলে রবীন্দ্রনাথের হৃদয় মুক্তির গান। ‘সন্ধ্যাসঙ্গীত’-এর বদ্ধ জগৎ থেকে কবি বাইরের পৃথিবীতে এসে দাঁড়িয়েছেন। বদ্ধ হৃদয়ের তুহিনে পড়েছে সূর্য করোজ্জ্বল আশীর্বাদের উত্তাপ। বদ্ধ কঠিন তুহিন স্তূপ থেকে নির্ঝরের মুক্তি ঘটেছে। বিগলিত হয়ে দুরন্ত গতিতে নির্ঝরের অবাধ জলরাশি মুক্তির উল্লাসে উদ্বেল। কোনো বাধাই সে মানবে না। কোনো বাঁধনেই তাকে বাঁধা যাবে না। কবিতাটি রচনার পর ১২৮৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা ‘ভারতী’ পত্রিকায় প্রকাশের সময় এর ছত্রসংখ্যা ছিল ২০১। ১২৯০ বঙ্গাব্দে ‘প্রভাতসঙ্গীত’এ সংযোজনের সময় এর ছত্র সংখ্যা হয় ২৬৮। পরিমার্জনার পর ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ বর্তমান রূপ পায়। এর ছত্রসংখ্যা হয় ১৫৪। এটি সংক্ষিপ্ত আকারে ৪৩টি ছত্রসংখ্যায় ‘সঞ্চয়িতা’য় স্থান পায়। এই কবিতা মুক্তি উন্মাদনার উন্মুখতার সংবাদ।

অন্ধকার গুহায় আবদ্ধ নির্ঝরিণীর কানে মুক্তির সংবাদ পৌঁছেছে। গুহার অভ্যন্তরে পৌঁছেছে রবির কিরণ, শোনা গেছে প্রভাত পাখির গান। প্রবল উন্মাদনায় মুক্ত পৃথিবীতে নেমে আসতে চাইছে নির্ঝরিণীর উদ্দাম জলধারা। নিজের বদ্ধ হৃদয় মুক্তির বাণী কবি এখানে তুলে ধরেছেন গিরিগুহায় তুহিন স্তূপে আবদ্ধ ঝর্ণার মুক্তি উন্মুখ প্রবল উন্মাদনার রূপকে। ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ কবিতায় কবি বলেছেন—

''জাগিয়া উঠিছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে, প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।
থর থর করি কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।''

অন্ধকার পাষাণ কারা ভেঙে ঝর্ণার মুক্ত জলরাশি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে। একক আবদ্ধ জীবন বৃহৎ বিশ্বজীবনের মিলন স্বপ্নে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। ক্ষুদ্র প্রাণে সঞ্চারিত হয়েছে অফুরন্ত প্রাণশক্তি। আজ কোনও বাধাই বাধা নয়। 'প্রভাতসঙ্গীত'-এর মর্মবাণীর উচ্চারণ শোনা গেছে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায়।

'ছবি ও গান' এ কবি রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি ও মানবজীবনের বিচিত্র সৌন্দর্য শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে উপভোগ করতে চেয়েছেন। শব্দ আর সংগীতের মিলনে সৃষ্টি হয়েছে অপরূপ কাব্যচিত্র। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি লিখেছেন — প্রভাত সংগীতে একটা পর্ব শেষ হইয়াছে। 'ছবি ও গান' হতে পালাটা আবার আর একরকম শুরু হইল। 'কড়ি ও কোমল' এ কবি এসে দাঁড়িয়েছেন মানুষের মাঝখানে। প্রকৃতি ও মানবজীবনকে তিনি প্রাণভরে ভালোবাসতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন

'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'

'প্রভাতসঙ্গীত'-এ কবি উপলব্ধি করেছেন যে বিরাট চিরন্তন তরঙ্গে এই বিশ্ব তরঙ্গিত, মানুষের ক্ষুদ্র প্রাণও তারই অংশ, এই বিরাট বিশ্বের বিচিত্র লীলার সঙ্গে যুক্ত হয়েই মানবজীবনের সার্থকতা। কবির দুরন্ত সৌন্দর্য পিপাসা দেখা গেছে এই পর্বে। প্রথম যৌবনের মোহে নারীদেহ কবি চিত্তে যে অভূতপূর্ব বিস্ময় সৃষ্টি করেছে কবি তাই কাব্য ছন্দে ধরতে চেয়েছেন। সমালোচক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা'য় বলেছেন — ''যৌবনের সোনার কাঠির স্পর্শে কবির চিত্তে সুপ্ত সৌন্দর্য স্পৃহা জাগিয়ে উঠিয়াছে। চক্ষে যৌবনের মোহাঞ্জন লাগিয়াছে— চিত্তে রঙিন স্বপ্নের জাল বোনা হইতেছে। তাঁহার প্রাণের রঙে সারা পৃথিবী আজ অপূর্ব সৌন্দর্য মণ্ডিত— আমার যৌবনস্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ। *** নারীকে কেন্দ্র করিয়াই কবির নবযৌবনের সৌন্দর্য ভোগতৃষ্ণা জাগরিত হইয়াছে। এই কাব্যগ্রন্থে তিনি নারীর এক অপরূপ সৌন্দর্যের চিত্র আঁকিয়াছেন। *** নারীর ক্ষণিক স্পর্শে কবির দেহ-মনে এক অপূর্ব সংগীত ঝংকৃত হইয়া উঠিয়াছে। জীবনকুঞ্জে বসন্ত সমীরণ বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, নবপল্লবের মতো হৃদয়ের বিস্মৃত বাসনাগুলি আবার জাগরিত হইয়াছে। কবি বুঝিতে পারিয়াছেন— প্রিয়ার বারতা বুঝি এসেছে আমার''। **** 'কড়ি ও কোমল'এ নারীর দেহ সৌন্দর্যকে কবি অপরূপভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাকেই একান্ত করিয়া দেখেন নাই— দেহের মধ্যে দিয়াই দেহতীত সৌন্দর্যে উপনীত হইয়াছেন।''

'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'প্রভাতসঙ্গীত', 'ছবি ও গান', 'কড়ি ও কোমল'-এর যুগকে কোনো কোনো সমালোচক 'উচ্ছ্বাস যুগ' রূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। এটা ভাবীকালের একজন কালজয়ী কবির প্রতিভা উন্মেষের প্রথম পর্ব।

এখানে উচ্ছ্বাস ও আবেগের প্রবলতাই বেশি। এই প্রস্তুতি পরীক্ষা পর্বের সমাপ্তি ১৮৮৬ সালে।

১.৩.৩. তৃতীয় পর্ব ঃ

১৮৯০ সালে প্রকাশিত 'মানসী' কাব্যগ্রন্থ থেকেই রবীন্দ্রকাব্যের নবযুগের সূচনা। এরপর ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত 'সোনারতরী' কাব্যেই রবীন্দ্র প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ উদ্ভাসিত হল। পরিণত পর্বের এই সূচনা লগ্নের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ প্রসঙ্গে সমালোচক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত 'বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস'-এ বলেছেন ''মানসীর কোথাও কোথাও অপরিণতজনিত দ্বিধা আছে। মানসী কাব্যে কবির প্রেমবোধে ইন্দ্রিয়ানুগ তীব্রতা কোথাও কোথাও প্রকাশিত, কিন্তু অতি দ্রুত Sublimation-এর সিদ্ধিতে পৌঁছে কবি নিশ্চিত হয়েছেন। এ কাব্যে কবির প্রেমবোধ অনেকগুলি কবিতাকে আশ্রয় করেছে। এই যুগের অপর কোনো কাব্যে এতগুলি প্রেম বিষয়ক কবিতা নেই। 'সোনারতরী', 'চিত্রা'য় সৌন্দর্য ও প্রেমচেতনা সমন্বিত রূপ লাভ করেছে। 'মানসী' কবির যৌবনকালের কাব্য। ইন্দ্রিয়ানুগ প্রেমচেতনাকে ইন্দ্রিয়াতীত ভাবসর্বস্বতায় উত্তীর্ণ করতে কবিকে অন্তরে অন্তরে সংগ্রাম করতে হয়েছে। 'মানসী' তে প্রকৃতিচেতনার বিশিষ্টতা দানা বাঁধতে আরম্ভ করেছে। কোনো কোনো কবিতায় স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে চিরন্তন সৌন্দর্যের জন্য কবির রোমান্টিক বিরহাকুতি। 'সোনারতরী'-তে এই অকারণ অনির্দেশ্য ও অনির্বাচ্য সৌন্দর্যের জন্য নিরুদ্দেশ যাত্রার কামনা যেমন একদিকে প্রবল হয়ে উঠেছে তেমনি অন্যদিকে মর্তমমতা প্রথম তীব্র গভীরভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রিয়জনকে দেবতার আসনে বসিয়েছেন কবি। মায়াবাদী ধরিত্রী-বিমুখ তাত্ত্বিকদের ধিক্কার দিয়েছেন। কিন্তু মৃত্যুর স্রোতে ভাসমান জীবনের ক্ষণিক অস্তিত্ব তাকে ব্যাকুল করে তুলেছে। জীবনের প্রতি প্রেম ও মৃত্যুর রহস্য জটিল অনিবার্যতা এখনও কবি চিত্তে সমন্বিত ভাবরূপ সৃষ্টি করেনি। নিসর্গচেতনা অবশ্য একটা তাত্ত্বিক উপলব্ধির পূর্ণতা লাভ করল এই কাব্যে। নিখিল বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করলেন কবি। জড় প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের অস্তিত্বে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল।"

রবীন্দ্রকাব্যের পরিণত পর্বে কবির প্রেম ভাবনা যে দেহ উর্ধ্বায়িত রোমান্টিক চেতনা আশ্রয় করেছিল, প্রেমের ধ্যান ও পূজা প্রেমের তত্ত্ব দর্শন কাব্যে রূপায়িত হয়েছিল 'মানসী'র কয়েকটি কবিতায় তারই পূর্বরাগ লক্ষ্য করা গেছে। 'ছিন্নপত্রে' কবি লিখেছেন— ''ভালোবাসা মাত্রেই আমাদের ভিতর দিয়ে বিশ্বজগতের অন্তরস্থিত শক্তির সজাগ আবির্ভাব যে নিত্য আনন্দ নিখিল জগতের মূলে সেই আনন্দের ক্ষণিক উপলব্ধি।" সেই জাতীয় কবিতার সূচনা 'মানসী'তে। এই কাব্যের প্রেম ভাবনা সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরিকে কবি লিখেছিলেন— ''আমি ভালোবাসি অনেককে কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেছি সে মানসেই আছে, সে আর্টিস্টের হাতে রচিত ঈশ্বরের অসম্পূর্ণ প্রতিমা।" শরীরী রূপ নয় আত্মার অনুসন্ধানে কবি চিত্তের ব্যাকুলতা নান্দনিক ভাবে প্রথম লক্ষ্য করা গেল 'মানসী'র কবিতায়। অনন্ত প্রেমানুসন্ধানেই কবিচিত্ত মুক্তি খুঁজেছে। কামনার বেড়াজাল থেকে, মোহের আবেষ্টনী থেকে মুক্তি পিপাসু কবি চিত্ত মোহ মুক্ত প্রেম প্রার্থনা করেছেন 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায়। কবিতার পূর্বনাম ছিল 'আঁখির অপরাধ'। মোহময়, স্থূল প্রেম বাসনা থেকে মুক্তি, অন্তর্দৃষ্টির আলোকে নারীর সৌন্দর্য সন্ধানের প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে এই কবিতায়।

প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ, সংগীত রবীন্দ্রপ্রাণে যে ভাবাবেগ তরঙ্গায়িত করেছে, সে ভাব সমন্বিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা আছে 'মানসী' কাব্যে। তারমধ্যে 'একাল ও সেকাল', 'বর্ষার দিনে', 'মেঘদূত', 'অহল্যার প্রতি' অন্যতম। 'মেঘদূত' কাব্য রবীন্দ্রকাব্যে ও বিভিন্ন লেখায় কি গভীর প্রভাব ফেলেছিল সে তথ্য সর্বজনবিদিত। 'মানসী'র 'মেঘদূত' কবিতা সেই বিস্ময়কর প্রভাবেরই প্রথম প্রতিচ্ছবি। মর্ত পৃথিবীর সঙ্গে কবি তথা বিশ্বমানবের যে জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক তার উপক্রমণিকা লক্ষ্য করা যায় 'অহল্যার প্রতি' কবিতায়। সেদিক থেকে 'মানসী' কাব্যগ্রন্থকে

রবীন্দ্র কবি-মনের পরিণত। ভাবনার প্রবেশ দ্বার রূপে চিহ্নিত করা যায়।

গ্রাম বাংলার উন্মুক্ত প্রকৃতি এবং মানুষের সঙ্গে কবির নিবিড় পরিচয় ঘটেছে 'সোনারতরী' পর্বে। জমিদারি তদারকির দায়িত্ব পড়েছিল যুবক রবীন্দ্রনাথের ওপর। শিলাইদহ, শাহজাদপুর, কালিগ্রাম, পাতিসর প্রভৃতি অঞ্চলের পদ্মাবক্ষে তিনি কাটিয়েছেন অনেকগুলি দিন। প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যায় পদ্মার ওপর বোটে বসে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান করেছেন। প্রকৃতিকে তিনি নিবিড়ভাবে ভালোবাসলেন। প্রকৃতির রূপ-রস-ছন্দ গানে কবি খুঁজে পেলেন অপরূপ সৌন্দর্যজগৎ। প্রকৃতির সঙ্গে জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক আবিষ্কার করলেন। ''প্রকৃতির নিজস্ব অন্তঃপুরে কবির সহিত চিরজীবনের তরে তাহার মালা বদল হইয়া গেল।'' 'ছিন্নপত্র'-এর বিভিন্ন পত্রে রয়েছে এর নিবিড় পরিচয়। সেখানে হৃদয় উৎসারিত ভালোবাসায় তিনি লিখেছেন — ''ঐ যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি। ওর এই গাছপালা, নদী, মাঠ, কোলাহল নিস্তব্ধতা, প্রভাত, সন্ধ্যা সমস্তটা সুদ্ধ দু'হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম?'

তিনি আরও লিখেছেন— ''এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান। এক সময় যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম। যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরীরে আলো পড়ত, সূর্য কিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত— আমি কত দূর-দূরান্তর কত দেশ দেশান্তরের জল-স্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নিচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে থাকতুম, তখন শরৎ সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। ''এবং'' এই পৃথিবীটা আমার অনেকদিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নূতন আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে।' কবির অন্তর্লোকে প্রকৃতি সুনিবিড়ভাবে স্থান করে নিল। প্রকৃতির পাশাপাশি গ্রাম্য সরল সহজ মানুষগুলির সঙ্গে কবি জড়িয়ে পড়লেন গাঢ় অন্তরঙ্গ সম্পর্কে। 'সোনারতরী' রবীন্দ্রজীবনের এই সোনার মুহূর্তের দুর্লভ সোনার ফসল। বিশ্ববোধ বিশ্বসৌন্দর্য ও রহস্য অনুভূতি জন্ম দিল নতুন কাব্য ভাবনার। 'মানসী'র আদর্শগত ভাবনার দ্বন্দ্ব এখানে নেই। এখানে রয়েছে অনাবিল সৌন্দর্য ভাবনা, সুনিবিড় প্রকৃতি প্রেম তথা বিশ্বাত্মবোধ এবং অনির্বচনীয় রোমান্টিক রহস্যময়তার অবগুণ্ঠন উন্মোচনের একান্ত আন্তরিকতা।

'সোনারতরী' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা 'সোনারতরী'। এই কবিতার রূপকার্থ, নিহিতার্থ অনুসন্ধানে যে বিতর্ক উঠেছে, সমকালে এবং পরবর্তীকালে, বাংলা কোনো কবিতা সম্পর্কে সম্ভবত এত বিপরীত ভাবনার অবতারণা হয়নি। তবুও সর্ববাদী সম্মত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব হয়েছে একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা এক পত্রে লিখেছিলেন— ''ছিলাম তখন পদ্মায় বোটে। জলভারনত কালো মেঘ আকাশে, ওপারে ছায়াঘন তরুশ্রেণির মধ্যে গ্রামগুলি, বর্ষায় পরিপূর্ণ পদ্মা খরবেগে বয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে পাক খেয়ে ছুটছে ফেনা। নদী অকালে কূল ছাপিয়ে চরের ধান দিনে দিনে ডুবিয়ে দিচ্ছে। কাটা ধানে বোঝাই চাষিদের ডিঙ্গি নৌকা হুহু করে স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। এই অঞ্চলে এই চরের ধানকে বলে জলিধান। আর কিছু দিন হলেই পাকত। ভরা পদ্মার উপরকার ঐ বাদল দিনের ছবি 'সোনারতরী' কবিতার অন্তরে প্রচ্ছন্ন ও তার ছন্দে প্রকাশিত।'' এটি কবিতার বাইরের চিত্র। সোনারতরী রূপক কবিতা। রূপক আবরণের অন্তরালে রয়েছে গভীরতম ভাব সত্য। যা চিরন্তন সত্যের প্রতীক এবং বার্তাবহ। কবি একটি ব্যক্তিগত পত্রে কবিতার রূপক অর্থ সম্পর্কে কিছু কথা বলেছিলেন। চিঠিটি লেখা হয়েছিল বীরেশ্বর গোস্বামীকে ৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৩ বঙ্গাব্দে। কবি

লিখেছিলেন— ''সংসার আমাদের সমস্ত কাজ গ্রহণ করে কিন্তু আমাদিগকে তো গ্রহণ করে না। আমার চিরজীবনের ফসল যখন সংসারের নৌকায় বোঝাই করিয়া দিই তখন মনে এ আশা থাকে যে আমারও ঐ সঙ্গে স্থান হইবে, কিন্তু সংসার আমাদের দুই দিনেই ভুলিয়া যায়। যাহারা যুগে যুগে নানারূপে মানুষকেই গড়িয়া তুলিতেছে তাহাদের কাজ আমাদের মধ্যে অমর হইয়া আছে, কিন্তু তাহারা নাম-ধাম সুখ-দুঃখ লইয়া কোনো বিস্মৃতির মধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছে। ** আমাদের জীবনের ফসল কোনো না কোনো আকারে থাকিয়া যায়, কিন্তু আমরা থাকি না।''

''মানুষের এই একটা ব্যাকুলতা, এই বেদনা চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের ভালোবাসার মধ্যেও এই ব্যথা আছে; আমাদের সেবা, আমাদের প্রেম আমরা দিতে পারি, সেই সঙ্গে নিজেকে দিতে গেলেই সেটা বোঝা হইয়া পড়ে। আমরা প্রীতিদান করিব, কর্মদান করিব, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাকেও চালাইতে যাইব না, ইহাই জীবনের শিক্ষা।

'এ পারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা' একলা নয় তো কী। আমরা প্রত্যেকেই যে একলা— আমাদের প্রত্যেকের চারিদিকে যে অতলস্পর্শ স্বাতন্ত্র্যের ব্যবধান আছে তাহা কে অতিক্রম করিবো; এই ব্যবধানের মধ্যে, প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্যের অন্তরালে আপনার জীবনের ক্ষেত্রটুকু লইয়া কাজ করিয়া যাইতেছি। এ সমস্তই আমাকে দিয়া যাইতে হইবে। কাহাকে দিয়া যাইব। তাহাকে চিনি এবং চিনি না, সে আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে কিন্তু আমাকে লয় না **** এই অপরিচিত অথচ পরিচিত মানবসংসারকেই আমাদের যাহা কিছু সমস্ত দিয়া যাইতে হইবে, নিজে তো কিছুই লইয়া যাইতে পারিব না।। নিজেকেও দিয়া যাইতে পারিব না।''

''সোনারতরী'' কাব্যের ''বসুন্ধরা'' কবিতায় কবি বসুন্ধরার সঙ্গে তাঁর আত্মার সম্পর্ক, নাড়ীর যোগের কথা বলেছেন। কবি একদিন বসুন্ধরার সঙ্গে একীভূত হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন—

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের; তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনী দিন
যুগযুগান্তর ধরি, আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু।

যেখান থেকে কবির উদ্ভব সেই বসুন্ধরার বুকেই তিনি আবার ফিরে যেতে চেয়েছেন। তার অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে চেয়েছেন। কবির নিবিড় প্রার্থনা

আমারে ফিরায়ে লহ
সেই সর্বমাঝে, যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে, মুকুলিছে, মঞ্জুরিছে প্রাণ

শতেক সহস্ররূপে— গুঞ্জরিছে গান
শত লক্ষ সুরে, উচ্ছ্বসি উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য ভঙ্গিতে, প্রবাহি যেতেছে চিত্ত
ভাবস্রোতে,

নিখিলের বিচিত্র আনন্দ কবি সকলের সঙ্গে এক হয়ে আস্বাদন করতে চেয়েছেন। সমস্ত দেহে তিনি প্রকৃতির নিবিড় অস্তিত্ব অনুভব করেছেন। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাতেও কবি সমুদ্রের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, সমুদ্রের বিরাট জঠরে ভ্রূণ রূপী পৃথিবীর দেহের সঙ্গে লীন হয়ে থাকার অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন—

''মনে হয়, যেন মনে পড়ে—
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে।
অজাত ভুবন-ভ্রূণ মাঝে, লক্ষকোটি বর্ষ ধরে
এই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে,
মুদ্রিত হইয়া গেছে; সেই জন্ম-পূর্বের স্মরণ—
গর্ভস্থ পৃথিবী'পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের— ''

'মানস সুন্দরী' কবিতায় সমগ্র বিশ্বসৌন্দর্যের সার কবি একটি নারী মূর্তির মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন। সে কবির মানস সুন্দরী। আশৈশব সে কবির অনুরাগিনী। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রূপে সে কবির কাছে ধরা দিয়েছে। মানস সুন্দরী বিশ্বের আবহমান কালের সমস্ত প্রিয়ার প্রতীক। কবির কল্পনায় যে নারী পূর্বজন্মে কেবল তাঁর জীবনেই আবদ্ধ ছিল এ জন্মে তা বিস্তারিত হয়েছে বিশ্ব চরাচরে। বিচ্ছিন্ন খণ্ড সৌন্দর্যগুলি অখণ্ড সৌন্দর্যরূপে কবির চেতনায় ধরা দিয়েছে। 'সোনারতরী'র মাঝি, 'মানস সুন্দরী'র প্রেমিকা এবং 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র রহস্যময়ী অপরিচিতা কবি রবীন্দ্রনাথের সমস্ত প্রেরণার উৎস, তাঁর সৃষ্টির চালিকা শক্তি—জীবনদেবতা।

'চিত্রা' কাব্যে কবির সৌন্দর্য অনুভূতি, সৌন্দর্য এষণা বিশ্বসৌন্দর্যের সঙ্গে একীভূত হয়েছে। বস্তু নিরপেক্ষ সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়জ কামনায় বাঁধা পড়ে না। সেই ভাবময় সৌন্দর্যকেই কবি নানারূপে, নানারসে অনুভব করেছেন 'চিত্রা' কাব্যে। কবির সৌন্দর্য অনুভূতির চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা গেছে 'চিত্রা', 'উর্বশী', 'বিজয়িনী' প্রভৃতি কবিতায়। জীবনদেবতার ভাবনা রূপায়িত হয়েছে 'জীবনদেবতা', 'অন্তর্যামী' প্রভৃতি কবিতায়। এই কাব্যের অন্য স্বাদের কবিতাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল '১৪০০ সাল', 'এবার ফিরাও মোরে'।

'চিত্রা'র সৌন্দর্য ভাবনার কবিতাগুলি সম্পর্কে সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেছেন 'উর্বশী' ও 'বিজয়িনী'— যে দুইটি কবিতা চিত্রায় আছে, তাহার মধ্যে সৌন্দর্যকে সমস্ত মানব সম্বন্ধের বিকার হইতে, সমস্ত প্রয়োজনের সংকীর্ণ সীমা হইতে দূরে তাহার বিশুদ্ধতায়, অখণ্ডতায় উপলব্ধি করিবার তত্ত্ব আছে।'

'অন্তর্যামী' কবিতায় কবি স্বীকার করেছেন তাঁর যে সৃষ্টি সেখানে সৃষ্টিকর্তা রূপে তাঁর কোনো অস্তিত্ব নেই, সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক একান্ত ভাবেই অন্তর্যামী। কবির কুণ্ঠাহীন স্বীকারোক্তি—

অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,

মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুর।
**** **** ****
তুমি যে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মতো।

কবির কাব্যের প্রকৃত তাৎপর্য বা অন্তর্নিহিত অর্থ অন্তর্যামী ছাড়া কেউ জানেন না। কবির সমস্ত সৃষ্টির অনুপ্রেরণার কেন্দ্র জীবনদেবতা। তাই সমস্ত সৃষ্টির মূলে তিনিই আছেন।

'কল্পনা' কাব্যে কবির রোমান্টিক কল্পনার সুদূরাভিসারের সার্থক পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। পুরনো পৃথিবীর পরিপূর্ণ জগতে কবির সৌন্দর্য পিপাসু মন মুক্তি খুঁজেছে। স্বপ্নলোক উজ্জয়িনী তীরে পৌঁছে গেছেন কবি, কল্পনার মেঘকে সঙ্গী করে। অতীত পৃথিবীতে কল্পনাকে পৌঁছে দিতে কবির উল্লাস, অন্যদিকে অতীতের বর্ণাঢ্য সৌন্দর্য বাস্তবে অনায়ত্ত হওয়ার বেদনাও প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কণ্ঠে।

'ক্ষণিকা' কাব্যে আশ্চর্যভাবে বিচ্ছুরিত হয়েছে ক্ষণকালের দীপ্তি। এই পর্বে লেখা অন্যান্য কাব্যগুলোর সঙ্গে এর পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। এই কাব্যের কবিতায় একটা প্রচ্ছন্ন পরিহাসের আবরণ আছে। এগুলি অর্থপূর্ণ কিন্তু কৌতুকহাস্যে উজ্জ্বল। জীবন ও জগৎকে এখানে দেখা হয়েছে সহজ সারল্যে। কবি বলেছেন—

শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে।

এই কাব্য সম্পর্কে অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেছেন ''ব্যথা, বিবেচনা, সমস্যা, সন্ধান — সব সরাইয়া ফেলিয়া ক্ষণ প্রকাশের বুকে মুহূর্তে মুহূর্তে যে অমৃত রূপ ফুটিয়া উঠিতেছে, কবি তাহাই চোখ ভরিয়া দেখিতেছেন এবং প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতেছেন।" রবীন্দ্রনাথের কাব্যের এই পর্ব সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে ড. ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন— 'চৈতালি' থেকে আরম্ভ করে নৈবেদ্য কাব্য পর্যন্ত কবি বিশেষ ভাবে প্রাচীন ভারতে মানস ভ্রমণ করেছেন। চৈতালি-কল্পনায় সেকালের বর্ণাঢ্য সৌন্দর্য সম্ভোগ, 'কথা ও কাহিনী'র গাথা কবিতা ও কাব্যনাট্যে সেকালীন জীবনাদর্শ ও চরিত্র মাহাত্ম্যের বর্ণনা, 'ক্ষণিকা'য় লঘু চটুল সুরে সেকালের সৌন্দর্যের স্বাদ এবং 'নৈবেদ্যে' সেকালীন ধর্মীয়, বিশেষত ঔপনিষদিক আদর্শ কবিতার বিষয়বস্তু রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।"

১.৩.৪. চতুর্থ পর্ব :

'নৈবেদ্য'র প্রায় এক দশক পর 'খেয়া' কাব্যের প্রকাশ। এর মধ্যে 'স্মরণ' ও 'শিশু' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের কবি জীবনের ব্যক্তিগত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ছায়া পড়েছে। কবি পত্নীর মৃত্যুতে কবি হৃদয়ের যে বেদনা তারই প্রকাশ 'স্মরণ' কাব্যে দেখা যায়। 'স্মরণ' কাব্যের চারটি কবিতায় সে বেদনার গভীর ছায়া রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য কবিতাগুলিতে রয়েছে স্ত্রী সম্পর্কিত বিভিন্নভাবনা স্মৃতি, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি পত্নীকে নতুন করে পাবেন এই ভাবনার মধ্যে তিনি সান্ত্বনা খুঁজেছেন।

'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' এই চারটি কাব্য লেখা হয়েছিল ১৯১০ থেকে ১৯১৫ খ্রিঃ মধ্যে। 'খেয়া' কাব্যে কবি পার্থিব সৌন্দর্যের জগৎ থেকে অরূপানুভূতির অভিমুখে যাত্রা করেছেন। তাঁর কানে বেজেছে বৈরাগ্যময় জীবনের আহ্বান। সে আহ্বানে সাড়া দিলেও পরিচিত সৌন্দর্যের জগতের মায়া কবি অতিক্রম করতে পারছেন না। বন্ধন এবং বন্ধনমুক্তির দ্বন্দ্ব কবিতায় ছায়া ফেলেছে। 'গীতাঞ্জলি'তে অরূপকে লীলাময়রূপে কবি কাছে পেয়েছেন। দু'জনের মধ্যে গড়ে উঠেছে হৃদয়ের সম্পর্কে। 'খেয়া'তে রবীন্দ্রকাব্যে যে মিস্টিক অনুভূতি ছায়া ফেলেছিল 'গীতাঞ্জলি'তে পাওয়া গেল তারই পরিণত রূপ। 'খেয়া'র 'আগমন' কবিতায় কবি যখন আহ্বান জানান —

ওরে দুয়ার খুলে দে রে বাজা শঙ্খ বাজা
গভীর রাতে এসেছে আজ আঁধার ঘরের রাজা।
বজ্র ডাকে শূন্য তলে
বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,
ছিন্ন শয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা।
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল
দুঃখ রাতের রাজা।

প্রিয়তম রাজা আসবেন রুদ্রমূর্তিতে, সমস্ত দারিদ্র্য রিক্ততা অসহায়ত্বের মধ্যেও তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। দুঃখ বেদনার রাতেই রাজাকে লাভ করা যাবে। মিস্টিক ভাবনার ছায়া এখানে সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটকগুলিতে রাজাকে কেন্দ্র করেই নাটকীয় সংঘাতের পরিকল্পনা করা হয়েছে। রাজাকে চিনেও চেনা যায় না। জেনেও জানা যায় না। 'গীতাঞ্জলি' ও 'গীতিমাল্যে'র মধ্যে ভাবগত সাদৃশ্য থাকলেও, দু''টি কাব্যের কিছুটা পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়। বিশিষ্ট রবীন্দ্র সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেছেন — 'গীতাঞ্জলি' যেন দেবতার পায়ে সসম্ভ্রমে গীতি নিবেদন সেখানে 'দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে, বন্ধু বলে দু'হাত ধরিনে। 'গীতিমাল্য' বঁধুর গলায় গীতিমাল্যের উপহার। দূরত্বের বাধা দূর হইয়া অত্যন্ত নিকট নিবিড় পরিচয়।' 'গীতালি'তে অরূপ ভাবনার ধূসর পৃথিবীতে বাইরের পৃথিবীর আলো এসে পড়েছে। কবি আবার পুরনো পৃথিবীতে ফেরার আহ্বান শুনেছেন। অরূপানুভূতির আলোকে কবি জীবনকে নতুন করে দেখছেন। বেদনার আগুনে জীবনকে নতুন দীপ্তি, নতুন মহিমা দিতে উৎসুক হয়েছেন কবি —

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পুণ্য করো দহন দানে
আমার এই দেহখানি তুলে ধর
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ কর,
নিশিদিন আলোক শিখা জ্বলুক গানে
**** **** ****
ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্ব পানে। (গীতালি - ১৮)

আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার মধ্যেই কবি নতুন ভাবে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন পুরনো পৃথিবীতে। নতুন কামনা, নতুন প্রেম, ভালোবাসায় ভরে দিতে চেয়েছেন মর্ত ধরণীকে। কবি বলেছেন—

আবার যদি ইচ্ছা করো
আবার আসি ফিরে,
দুঃখসুখের ঢেউ-খেলানো
এই সাগরের তীরে।
আবার জলে ভাসাই ভেলা,
ধুলার পরে করি খেলা,
হাসির মায়া-মৃগীর পিছে
ভাসি নয়ন-নীরে।
**** **** ****
নূতন প্রেমে ভালোবাসি
আবার ধরণীরে। (৮৬ নং)

১.৩.৫ পঞ্চম পর্ব ঃ

১৯১৬ সালে প্রকাশিত 'বলাকা' কাব্য রবীন্দ্রকাব্যের গতিধারায় গুরুত্বপূর্ণ বাঁক। এখান থেকে কবির ভাব-ভাবনা, কল্পনা অনুভূতির পরিবর্তনের সুর স্পষ্ট হয়েছে। নিরন্তর গতির মধ্যেই পৃথিবীর প্রাণশক্তির প্রকাশ এই সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে কবির অন্তর। যৌবনের গতি-বেগের মধ্যেই উপলব্ধি করলেন জীবনের সত্য পরিচয়। যেখানে অফুরন্ত যৌবন, সৌন্দর্য, আনন্দ সেখানেই কবি অবস্থান নির্দিষ্ট করলেন। এর সঙ্গে যুক্ত হল গতিবাদের দর্শন, বিশ্বচরাচরের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ভাবনার তত্ত্ব। গতিমানতার মধ্যেই জীবন সত্যকে তিনি নতুন ভাবে চিনলেন। ইউরোপের বিশ্বযুদ্ধের মারণ উল্লাস কবি চিত্তকে আলোড়িত করলো। ব্যথিত কবি ধ্বংসের বিরুদ্ধে সৃষ্টি, মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্য, মৃত্যুর বিরুদ্ধে অমৃতকে প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানালেন। নতুন পৃথিবী সৃষ্টির জন্য দুরন্ত, অবুঝ, অশান্ত, প্রমুক্ত শক্তির অধিকারী সবুজ তারুণ্যের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করলেন। তাঁর কাব্যে শোনা গেল নতুন শক্তির উচ্চারণ-আহ্বান। এই দৃঢ় বলিষ্ঠ উচ্চারণই 'বলাকা'র মূল সুর।

নিখিল বিশ্বের মধ্যে অবিরাম গতির চলমানতা উপলব্ধি করলেন কবি। কবি বুঝলেন তাঁর এত দিনের সমস্ত সঞ্চয়, তাঁর ভাব-সাধনা, সমস্ত অর্জন মান, খ্যাতি এক কূলে রেখে তাঁকে ভেসে যেতে হবে গতির অনির্দেশ্য স্রোতে। তিনি শুনলেন চিরন্তন গতির আহ্বান—

ওরে দেখ সেই স্রোত হয়েছে মুখর,
তরণী কাঁপিয়ে থর থর।।
তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক তীরে,
তাকাস নে ফিরে।
সম্মুখের বাণী

নিক তোরে টানি।

মহাস্রোতে

পশ্চাতের কোলাহল হতে

অতল আঁধারে— অকূল আলোতে।

হংস বলাকার পাখায় কবি শুনলেন নিরন্তর গতির সুর। চলে যাওয়াই জীবনের শাশ্বত সত্য। জন্ম জন্মান্তরের পথের যাত্রী মানুষকে একদিন সব ছেড়ে চলে যেতে হয়। সে চিরন্তন আলোর পথের অভিযাত্রী। কবি কণ্ঠে শোনা গেল এই সত্যের উচ্চারণ—

তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ

তাই তব জীবনের রথ

পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার

বারম্বার।

তাই

চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।

বলাকার 'গতিবাদ' তত্ত্বে ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ-র গতিতত্ত্বের প্রভাব আছে। কিন্তু বার্গসঁ-র গতিতত্ত্ব পরিণামহীন। সে চলা অকারণ, অবারণ চলা পরিণামহীন। কিন্তু অরূপভাবনা ঋদ্ধ রবীন্দ্রনাথের গতিবাদ পরিণামমুখী।

'বলাকা'র বেশ কয়েক বছর পর 'পূরবী' (১৯২৫) কাব্যের প্রকাশ। 'পূরবী' কাব্যে রয়েছে পুরনো স্মৃতি রোমন্থনের ব্যাকুলতা। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে কবি যৌবনের স্মৃতি রোমন্থন করতে চেয়েছেন। কবি ফিরে যেতে চেয়েছেন 'সোনার তরী' পর্বের সোনার স্বপ্নভরা দিনগুলিতে। 'কোন ভুলে' সেই দিনগুলিতে প্রবেশ দ্বারের ''চাবি'' কবি হারিয়ে ফেলেছিলেন। সেই হারিয়ে যাওয়া চাবি কবি আবার খুঁজে পেয়েছেন। এবার তিনি সেই স্মৃতি মদির সৌন্দর্যের মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন।

কবি বললেন—

সে একান্তে আসে

মোর পাশে

পীত উত্তরীয়তলে লয়ে মোর প্রাণদেবতার

স্বহস্তে সজ্জিত উপহার

নীলকান্ত আকাশের থালা,

তারি পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পিয়ালা।

মিলনবেলার সুর শোনা গেছে 'খেলা' কবিতাতেও—

তোমার বীণার ধ্বনির সাথে, আমার বাঁশির রবে

পূর্ণ হবে রাতি।

তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে খেলা হবে,
নয় আরতির বাতি।

যৌবনের দিনগুলির মধুর স্মৃতির পাশাপাশি পরিণত বয়সের কবির ক্লান্তির সুরও শোনা গেছে 'পূরবী'র কোনো কোনো কবিতায়। নিজের অক্ষমতায় কবির বেদনাও সেখানে ধরা পড়েছে—

দেখ না কি, হায়, বেলা চলে যায়—
সারা হয়ে এল দিন।
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিনীর বীণ।
এতদিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সে দিনের সেই বাঁশি,
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিশ্বাসি
গানহারা উদাসীন।

'বলাকা' এবং 'পূরবী'র মধ্যবর্তী দুটি কাব্য 'পলাতকা' ও 'শিশু ভোলানাথ'। এই দুটি কাব্যে সহজ সরল দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখেছেন কবি। জটিল জীবন আবর্ত থেকে নেমে এসেছেন প্রসন্ন, স্নিগ্ধ পারিপার্শ্বিকতায়। 'পলাতকা'র, 'মুক্তি' কবিতায় মধ্যবিত্ত বাঙালির একান্নবর্তী পরিবারের বধূর যে বৈচিত্র্যহীন, আলোহীন বন্দি দিনযাপন, এর মধ্যে যে দুঃখ বেদনার দীর্ঘশ্বাস, অসহায়তা এবং নির্মম হৃদয়হীনতা আছে তার করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

ইউরোপ, আমেরিকা ভ্রমণ, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কর্মব্যবস্থার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিমন মুক্তি প্রত্যাশী হয়ে উঠেছিল। এ সময়ে কবি লেখেন 'শিশু ভোলানাথ' এর কবিতাগুলি। 'পশ্চিম যাত্রী ডায়ারি'তে ('যাত্রা') কবি এ প্রসঙ্গে লিখেছেন- .. কিছুকাল আমেরিকার প্রৌঢ়তার মরুপারে ঘোরতর কার্যপটুতার পাথরের দুর্গে আটকা পড়েছিলুম।.... কিছু কালের জন্য আমি শ্বাসরুদ্ধ প্রায় অবস্থায় কাটিয়েছিলুম। তখন আমি এই ঘন দেয়ালের বাইরের রাস্তা থেকে চিরপথিকের পায়ের শব্দ শুনতে পেতুম..... আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই 'শিশু ভোলানাথ' লিখতে বসেছিলুম। বন্দি যেমন ফাঁক পেলেই ছুটে আসে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে তেমনি করে।... অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকো-লোকান্তরে বিস্তৃত। সেই জন্য কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।' শিশু মনের অজানা রহস্য, তার কৌতূহল প্রবণতা, অনুসন্ধিৎসা, অনাবিল ভাবনা, কল্পনার রাজ্যে কবি নিজেকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। শিশুর মন নিয়ে সে জগতে তিনি পৌঁছতে চেয়েছেন। যেমন 'শিশু' কাব্য গ্রন্থে, তেমনি শিশু ভোলানাথে।

১.৩.৬. ষষ্ঠ পর্ব :

রবীন্দ্র কাব্যের গোধূলি পর্যায়ের শুরু ''পুনশ্চ'' কাব্য থেকে। ১৯৩২ খ্রিঃ থেকে কবির মৃত্যুকাল ১৯৪১ পর্যন্ত এর বিস্তার। এখানে কবি যেন নতুন ভাবনা, নতুন চিন্তায় যাত্রা শুরু করলেন। নতুনত্বের ব্যাপারে সবচেয়ে প্রথমেই আসবে কবিতার রূপগত পরিবর্তনের কথা। আঙ্গিক পরিবর্তনের সূত্রে গদ্যছন্দের নতুন বিন্যাস পাওয়া গেল। 'লিপিকা'য় কবি গদ্য কবিতা লিখেছিলেন, প্রবহমান পয়ারের ব্যাপারটা রবীন্দ্রকাব্যে আগেও দেখা গেছে। ছন্দের

মুক্তি ঘটিয়ে ছত্র বিন্যাসে বৈচিত্র্য এনে 'বলাকা'-র কাব্য শরীর অনেকক্ষেত্রে নির্মিত হয়েছে। 'পুনশ্চ' গদ্যছন্দ এল পূর্ণরূপে নতুন ভাবে। এই নতুন রীতি গ্রহণের কারণ হিসাবে 'পুনশ্চ' কাব্যের ভূমিকায় কবি বলেছেন—

''গদ্যকাব্যে অতি-নিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, গদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশ-রীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীনক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসঙ্কুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি।'' এই গদ্য কবিতার নতুন ছন্দের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের নিকটবর্তী সাঁওতাল পাড়ার নদী কোপাইয়ের সাদৃশ্য দেখিয়েছেন কবি। তিনি লিখলেন—

কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথী করে নিলে,
সেই ছন্দের আপোষ হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে,
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালী।
তার ভাঙা তালে হেঁটে চলে যাবে ধনুক হাতে সাঁওতাল ছেলে;

কবি আরও বলেছেন—

পদ্য হোলো সমুদ্র
সাহিত্যের আদি যুগের সৃষ্টি
তার বৈচিত্র্য ছন্দতরঙ্গে,
কলকল্লোলে।
গদ্য এলো অনেক পরে।
বাঁধা ছন্দের বাইরে জমালো আসর।
সুশ্রী কুশ্রী ভালোমন্দ তার আঙিনায় এলো।
ঠেলাঠেলি করে।

ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনে এই ছন্দে একসঙ্গে সংগীত আর আটপৌরে অনুষঙ্গ। এর বিখ্যাত কবিতা 'শিশুতীর্থ', 'শাপমোচন', 'ছেলেটা', 'সাধারণ মেয়ে', 'ক্যামেলিয়া' ইতাদি।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য জীবনের শেষ পর্যায়ের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন— 'শেষ সপ্তক হইতেই কবির ভাব জীবনে এই ঔপনিষদিক যুগের আরম্ভ। তারপর 'বীথিকা', 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী'র মধ্য দিয়া এই ভাবধারা আগাইয়া চলিয়াছে এবং 'প্রান্তিক' হইতে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত ইহার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে।' আত্মবিশ্লেষণ ও মানবসত্তার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় 'শেষ সপ্তক' কাব্যের কেন্দ্রীয় সুর। সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যুর অভিঘাতে উদ্বেলিত না হয়ে, ব্যক্তিগত অহংকার পরিত্যাগ করে নিরাসক্ত চিত্তে আত্মতত্ত্ব চিন্তায় মগ্ন থাকতে চেয়েছেন কবি। তিনি বলেছেন—

হে নির্মম, দাও আমাকে তোমার ঐ সন্ন্যাসের দীক্ষা।
জীবন আর মৃত্যু, পাওয়া আর হারানোর মাঝখানে
সেখানে আছে অক্ষুব্ধ শান্তি

সেই সৃষ্টি-হোমাগ্নিশিখার অন্তরতম
স্তিমিত নিভৃতে
দাও আমাকে আশ্রয়।

এই কাব্যে কবি কামনা করেছেন নিভৃত পবিত্র অন্ধকার। নাম-খ্যাতির অহংকার থেকে তিনি দূরে থাকতে চেয়েছেন। সেই পবিত্র অন্ধকার কবি কামনা করেছেন, যার মধ্যে নামের অতীত, বিশ্বচিত্রের রূপকার স্তব্ধ বসে আছেন। আনন্দেই যার প্রকাশ। এখানে কবির অধ্যাত্ম ভাবনার নিবিড়তা প্রকাশিত। 'পত্রপুট' কাব্যে কবি বলেছেন—

আজ আমার এই পত্রপুঞ্জের
ঝরবার দিন এলো জানি।
শুধাই আজ অন্তরীক্ষের দিকে চেয়ে
কোথায় গো সৃষ্টির আনন্দনিকেতনের প্রভু
জীবনের অলক্ষ্য গভীরে
**** **** ****
যে রূপের দ্বিতীয় নেই কোনোখানে কোনো কালে
তাকে রেখে দিয়ে যাব কোন্ গুণীর কোন্ রসজ্ঞের দৃষ্টির সম্মুখে
কার দক্ষিণ করতলের ছায়ায়,
অগণ্যের মধ্যে কে তাকে নেবে স্বীকার করে।

এ পর্বে 'মনের মানুষ' সন্ধানই কবির সাধনার কেন্দ্র-প্রবণতা।

'শ্যামলী' কাব্যের নামকরণ করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের মাটির ঘর 'শ্যামলী'র নাম অনুসারে। 'শেষ সপ্তক'-এর ৪৪ সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন

আমার শেষবেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে
তার নাম দেব শ্যামলী।

বসুন্ধরার সঙ্গে কবি জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক অনুভব করেছেন। 'মানসী', 'সোনার তরী' কাব্যে বিভিন্ন কবিতায় তিনি সে প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। শেষ জীবনে সেই মাটির বুকে তিনি চিরশক্তির আশ্রয় খুঁজেছেন। মাটির বুকে আশ্রয় নিয়েই তিনি ভুলতে চান জীবনের সমস্ত শোকতাপ যন্ত্রণা এবং কর্মখ্যাতিও। কবি বলেছেন—

আজ আমি তোমার ডাকে
ধরা দিয়েছি শেষ বেলায়।
এসেছি তোমার ক্ষমাস্নিগ্ধ বুকের কাছে,
যেখানে একদিন রেখেছিলে অহল্যাকে
নবদুর্বাশ্যামলের

করুণ পদস্পর্শে
চরম মুক্তি জাগরণের প্রতীক্ষায়,
নব জীবনের বিস্মৃত প্রভাতে।

এই মাটির কুটির শ্যামলী কবির আধ্যাত্মিক জীবন সাধনার অনুকূল ক্ষেত্র বলে কবির মনে হয়েছে। মাটির ঘরে নীড় যেমন সহজে বাঁধা যায়, ভাঙাও যায় তেমন সহজেই। এ বাসাই চির পথিক মানবের যথার্থ বাসভূমি। কবি চলে যাবেন, নিরাসক্ত মাটি যেমন আছে, তেমনি পড়ে থাকবে। কবি বলেছেন—

যাব আমি
তোমার ব্যথাবিহীন বিদায় দিনে
আমার ভাঙাভিটের পরে গাইবে দোয়েল ল্যাজ দুলিয়ে।
এক সাহানাই বাজে তোমার বাঁশিতে, ওগো শ্যামলী,
যেদিন আসি, আবার যেদিন যাই চ'লে।

শ্যামলীর পরবর্তী তিনটি কাব্য 'খাপছাড়া', 'ছড়ার ছবি', 'প্রহাসিনী' কৌতুক কবিতার সংকলন। 'খাপছাড়া' প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ খ্রিঃ। উদ্ভট কল্পনা, লঘু কৌতুকের এই সংকলনে কবির নিজের হাতে আঁকা ছবিও যুক্ত হয়েছে। অন্যদিকে একই বছরে প্রকাশিত 'ছড়ার ছবি' শিল্পী নন্দলাল বসুর কিছু রেখাচিত্র অবলম্বনে লঘু হাস্যরসাত্মক কাব্য সংকলন। 'প্রহাসিনী' লঘু ছড়া জাতীয় কবিতার সঙ্গে রয়েছে আত্মীয় পরিচিতাদের জন্য লেখা কয়েকখানি পরিহাস পূর্ণ ব্যক্তিগত পত্র। এই বইগুলি সম্পর্কে ড. ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন''সম্ভবত পূর্ববর্তী কাব্যগুলির বিচিত্র মানস পরীক্ষায় ক্লান্ত কবি লঘু কৌতুকের রাজ্যে বিশ্রাম খুঁজেছেন। (বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস)

রবীন্দ্র কাব্যের শেষ রাগিনী শোনা গেল 'প্রান্তিক' (১৯৩৮) কাব্যে। এ সময় কবি আকস্মিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর চৈতন্যলোপ পর্যন্ত ঘটে। মৃত্যুর মুখ থেকে তিনি ফিরে আসেন। এ অবস্থা, কবির অভিজ্ঞতায় মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের সংগ্রাম। অচেতনের সঙ্গে চেতনের। মুক্তি আকাঙ্ক্ষা কবি অন্তরে প্রবল হয়ে উঠলো। কিন্তু সে মুক্তি আত্ম-অস্বীকার নয়। এ মুক্তি 'সহজে ফিরিয়া আসা সহজের মাঝে।' কবি জানেন এ নিখিল বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছে মহা আনন্দের উৎসার। সেই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত আনন্দ সাগরে ডুব দিয়ে সহজ আনন্দ উপলব্ধি করতে চেয়েছেন কবি। সমালোচক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন— ''মৃত্যুদূতের স্পর্শে কবি নূতন জীবনে জাগিয়া উঠিয়া পুরাতনকে বিসর্জন দিলেন বটে, কিন্তু ধরণী ও জীবনের উপর তাহার অসীম কৃতজ্ঞতা। এই সত্য ও ছলনায় মিশ্রিত জীবনেই তিনি অপরূপ অনির্বচনীয়ের স্পর্শ পাইয়াছেন। তাই—

ধন্য এ জীবন মোর
এই বাণী গাব আমি......
আজি বিদায়ের বেলা
স্বীকার করিব তারে, সে আমার বিপুল বিস্ময়।
মৃত্যুর সংগ্রাম শেষে নবতর বিজয় যাত্রায়।।

'প্রান্তিক'-এর পরবর্তী কাব্য 'সেঁজুতি'। জীবন সন্ধ্যায় কবি জ্বাললেন সেঁজুতি অর্থাৎ সাঁঝের প্রদীপ। এই কাব্য কবি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর চিকিৎসক ডাক্তার নীলরতন সরকারকে। উৎসর্গ পত্রে কবি জানিয়েছেন, মৃত্যুর

অন্ধকার গুহা থেকে তিনি ফিরে এসেছেন নতুন জীবন স্রোতে। তবে কবি জানেন, চির চঞ্চল ও ধ্বংসশীল জগৎ ও জীবনকে ছেড়ে যেতেই হবে। তাই তো জীবনের আলো-আঁধারের ফাঁকে ফাঁকে তিনি 'অজানা তীরের বাসা' দেখতে পান। জীবন অভিজ্ঞতার পথেই তিনি নিজের আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। জেনেছেন জীবন-সত্য। এই কাব্যের 'জন্মদিন' কবিতায় কবি বলেছেন—

জন্মোৎসবে এই যে আসন পাতা
হেথা আমি যাত্রী শুধু, অপেক্ষা করিব, লব টিকা
মৃত্যুর দক্ষিণ হস্ত হতে নূতন অরুণশিখা
যবে দিবে যাত্রার ইঙ্গিত ।.......

'অমর্ত্য' কবিতায় কবির প্রত্যাশা—

সকল প্রিয়ের মাঝখানে যে প্রিয়,
পেরিয়ে মরণ সে মোর সঙ্গে যাবে
কেবল রসে, কেবল সুরে কেবল অনুভাবে।

'আকাশ প্রদীপ' কাব্যে অধ্যাত্ম উপলব্ধি বা দার্শনিক চিন্তা নেই। এখানে সহজ সরল কল্পনার লীলায় কবির প্রত্যাবর্তনের সুরই প্রাধান্য পেয়েছে। স্মৃতি রূপায়ণের আকাঙ্ক্ষার কাব্য হিসেবে একে চিহ্নিত করা যায়। স্মৃতির আকাশে পূর্ব পরিচিতরা নির্মীয়মান। জীবন সন্ধ্যায় কল্পনার প্রদীপ জ্বেলে সেই প্রায় হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিগুলিকে নতুন আলোকে দেখতে চেয়েছেন কবি।

'নবজাতক' কাব্যের ভূমিকায় কবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'আমার কাব্যের ঋতু পরিবর্তন ঘটেছে বারেবারে । প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। কালে কালে ফুলের ফসল বদল হতে থাকে তখন মৌমাছিদের মধু জোগান নতুন পথ নেয়। **** কাব্যে এই যে হাওয়া বদল থেকে সৃষ্টি বদল এ তো স্বাভাবিক, এমনি স্বাভাবিক যে এর কাজ হতে থাকে অন্যমনে। কবির এ সম্বন্ধে খেয়াল থাকে না। বাইরে থেকে সমাজদারের কাছে এর প্রবণতা ধরা পড়ে। হয়তো এরা বসন্তের ফুল নয়, এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে। তাই যদি না হবে তাহলে ব্যর্থ হবে পরিণত বয়সের প্রেরণা।"

'নবজাতক' কাব্যের নাম কবিতায় কবি নতুন আগন্তুকের আগমন প্রতীক্ষার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। কবি বলেছেন—

নবীন আগন্তুক,
নব যুগ তব যাত্রার পথে
চেয়ে আছে উৎসুক।
**** **** ****
মানবের শিশু বারে বারে আনে
চির আশ্বাসবাণী,

নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো
বুঝিবা দিতেছে আনি।

কবি জানেন 'সুন্দর ও কুৎসিত', 'রূপ ও বিরূপে'র নৃত্যই সৃষ্টির রঙ্গভূমিতে চিরকাল ফসল ফলিয়েছে। কিন্তু কবি নিজে তাঁর কাব্যে চিরকাল সুন্দরের উপাসনা করেছেন। তিনি জানেন একটা বাদ দিলে সংগীত পরিপূর্ণ হয় না। 'রূপ ও বিরূপ' কবিতায় কবি নিজের সেই অপূর্ণতা মোচন করার চেষ্টায় আন্তরিক হবেন এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। 'শেষ কথা' কবিতায় কবির প্রত্যাশা—

জানি না বুঝিব কি না প্রলয়ের সীমায় সীমায়
শুভ্রে আর কালিমায়
কেন এই আসা আর যাওয়া,
কেন হারাবার লাগি এতখানি পাওয়া।
জানি না এ আজিকার মুছে ফেলা ছবি
আবার নতুন রঙে আঁকিবে কি তুমি শিল্পী কবি।

কবি রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্বের কাব্যে চলমান সৃষ্টি ধারায় মানবসত্তার ভূমিকা, অবস্থান, আসন্ন মৃত্যুর পটভূমিতে জীবন মৃত্যুর অবিরাম কক্ষ পরিবর্তন বিষয় ভাবনায় গভীর দার্শনিক চিন্তার জটিলতায় নিজেকে আবদ্ধ রেখেছিলেন সুদীর্ঘ সময়। 'সানাই' কাব্যে কবি আবার ফিরেছেন স্বচ্ছন্দ ও সহজ কল্পনার লীলায়। ফিরেছেন গীতিকাব্যের লীলায়িত ছন্দে, সুরে। বহুকাল বিস্মৃত লীলাসঙ্গিনী, যে কবির কাব্যরচনার প্রেরণা উৎস, তাকে আবার মনে পড়েছে। কিন্তু আজ আর তার সে বেশ নেই, লীলাও নেই। লীলাসঙ্গিনীর সেই সৌন্দর্য-মাধুর্য হারিয়ে যাবার বেদনার ছায়া পড়েছে কোনো কোনো কবিতায়। অন্যদিকে 'এলোচুলে অতীতের বনগন্ধ' নিয়ে সে আজ এলেও তাকে বরণ করে নেওয়ার ক্ষমতা কবির নেই। 'শেষ অভিসার' কবিতায় কবি বলেছেন—

এই তব শেষ অভিসারে
ধরণীর পারে
মিলন ঘটায়ে যাও অজানার সাথে
অন্তহীন রাতে।

জীবনের শেষ প্রান্তে ১৯৪০ খ্রিঃ প্রকাশিত হয় কবির 'রোগশয্যায়' কাব্য। কালিম্পঙে অসুস্থ কবিকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। রোজগার জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যেও নতুন প্রাণশক্তির উত্তাপ ছড়িয়ে আছে এ কাব্যের অনেকগুলি কবিতায়। লক্ষ্য করার বিষয় গভীর অসুস্থ অবস্থায় লেখা কাব্য তার অন্তর্শক্তি হারায়নি। অস্তলগ্নেও কবির প্রতিভা সমান দীপ্ত, সমান বর্ণময়। কবি-পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী তাঁর 'নির্বাণ' গ্রন্থে লিখেছেন—

''এই নয় মাসে ধীরে ধীরে চেহারা বদলে গিয়েছিল, তিনি শীর্ণ হয়েছিলেন কিন্তু তাতে তাঁকে ব্যাধিগ্রস্ত দেখাত না, তাঁর চোখের উজ্জ্বলতা একটি করুণায় পূর্ণ হয়েছিল, তাকে ইদানীং মনে হোত তপঃক্লিষ্ট ঋষি, আধ্যাত্মিক জ্যোতির মধ্যে দিয়ে চলেছেন মহাপ্রস্থানের পথে, মুখে ঠিকরে পড়ত একটি প্রীতি ও শান্তির ধারা।'

'আরোগ্য', 'রোগশয্যায়'-এর পরবর্তী কাব্য। এখানে রোগযন্ত্রণা মুক্ত কবির অপূর্ব প্রশান্তির ছবি ধরা পড়েছে। শিশুর সারল্য এবং বিস্ময়ে তিনি পৃথিবীকে দেখছেন। পৃথিবীর সৌন্দর্য এবং মানবের স্নেহ-প্রেম কবির দৃষ্টিতে

নতুন তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। কবি-চিত্ত পূর্ণতার আশীর্বাদে পরিপূর্ণ। প্রশান্ত এবং কৃতজ্ঞ চিত্তে বিদায়ের জন্য তিনি প্রস্তুত। কবির প্রসন্ন দৃষ্টিতে 'আজ পৃথিবী সুন্দর, মানুষ সুন্দর, পশুপক্ষী তরুলতা সুন্দর'—এর মধ্যে তিনি উপলব্ধি করেছেন সত্যের আনন্দ স্বরূপ। কাব্যের ১ সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন—

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি,
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই চরিতার্থ মহামন্ত্রখানি জীবনের বাণী। .....
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি।
এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি।

শেষ বিদায় লগ্নে অকুণ্ঠ চিত্তে জীবনের অজস্র দানের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেছেন — ২৯ সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন—

এ জীবনে সুন্দরের পেয়েছি মধুর আশীর্বাদ,
মানুষের প্রীতিপাত্রে পাই তারি সুধার আস্বাদ।
দুঃসহ দুঃখের দিনে।
অক্ষত অপরাজিত আত্মারে লয়েছি আমি চিনে।
**** **** ****
জীবনের বিধাতার যে দাক্ষিণ্য পেয়েছি জীবনে
তাহারি স্মরণলিপি রাখিলাম সকৃতজ্ঞ মনে।

জীবনের অন্তিম লগ্নে শেষ জন্মদিনে কবি রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন তাঁর কাব্যের অপূর্ণতার কথা। তাঁর কবিতা বিচিত্র পথগামী হলেও তা সর্বত্রগামী হয়নি। আপামর জনগণের শ্রম-ঘাম- রক্তের ইতিহাস তাঁর কাব্যে ধরা পড়েনি। এজন্য তিনি ভাবীকালের অখ্যাত জনের নির্বাক মনের কবির আগমন প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে আছেন। যে হবে সত্যিকার মানুষের কবি। সর্বজনের কবি। রবীন্দ্রনাথের 'জন্মদিনে' কাব্য প্রকাশিত হয় ১৯৪১ খ্রিঃ। এই কাব্যের মূল্যায়ণ প্রসঙ্গে সমালোচক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'রবীন্দ্র কাব্য' পরিক্রমায় বলেছেন—'জন্মদিনে'-এ কবি নিজের জন্মদিন উপলক্ষ করিয়া বিশ্বসৃষ্টির ধারা, নিজের অন্তরতম রহস্য ও অপরিমেয়তা, এই পৃথিবীর সঞ্চয়ের মূল্য প্রভৃতি পর্যালোচনা করিয়াছেন। ঐ সঙ্গে নিজের কবি-কৃতির মূল্য সম্বন্ধেও দুই একটি কবিতা আছে। কয়েকটি কবিতায় বিগত বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলায় কবি মনের প্রতিক্রিয়া রূপলাভ করিয়াছে।"

কবি জানেন জন্মদিনের অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়, মানুষের মর্তজীবনে জন্মগ্রহণের নির্ঘণ্টের হিসাবে। কিন্তু জীবনের অন্তরতম সত্তা দূরান্তের পথিক। তাই জন্মদিন উদ্‌যাপনের ক্ষণে কবি তাঁর অন্তর গভীরে সেই দূরের অন্তরতম সত্তার যোগসূত্র অনুভব করেছেন। কাব্যের ১ সংখ্যক কবিতায় সেই ভাবনা প্রকাশিত—

"আজি এই জন্মদিনে
দূরত্বের অনুভব অন্তরে নিবিড় হয়ে এল।
যেমন সুদূর ঐ নক্ষত্রের পথ

নীহারিকা-জ্যোতির্বাষ্প মাঝে
রহস্যে আবৃত,
আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি দুর্গমে,
অলক্ষ্য পথের যাত্রী অজানা তাহার পরিণাম।
আজি এই জন্মদিনে
দূরের পথিক সেই তাহারি শুনিনু পদক্ষেপ
নির্জন সমুদ্রতীর হতে।”

পরিণত বয়সের কবি জন্মদিনের অনুষ্ঠানে জন্মদিন আর মৃত্যুদিনের মুখোমুখি বসেছেন। প্রাজ্ঞ কবি জানেন, মৃত্যু মানুষের জীবনের ম্লান বিষণ্ণ অবশেষ। গোলাপের পাপড়ির মতোই আয়ুহীন মানুষের পবিত্র ঝরে যাওয়া। এ যেন 'সমুজ্জ্বল গৌরবের প্রণত সুন্দর অবসান।' মৃত্যুকে কবি শেষ সুন্দরের ঝরে যাওয়ার তুল্য মনে করেছেন। কবি ২৬ সং সংখ্যক কবিতায় বলেছেন—

''জন্মদিন মৃত্যুদিন দোঁহে যবে করে মুখোমুখি
দেখি যেন সে মিলনে
পূর্বাচল অস্তাচলে
অবসন্ন দিবসের দৃষ্টি বিনিময়।”

জীবনের শেষ পর্বে কবি প্রকৃত সত্যদ্রষ্টা মানুষ, যারা জগতকে সত্যের পথ, মঙ্গলের পথ দেখিয়েছেন তাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এই মানুষেরাই সংশয়ের অন্ধকারে পৃথিবীর আলোর পথ-দিশারী। কবি বলেছেন—

''রেখে যাই আমার প্রণাম
তাঁদের উদ্দেশে যাঁরা জীবনের আলো
ফেলেছেন পথে যাহা বারে বারে সংশয় ঘুচালো।”

নিজের কবিতার অপূর্ণতার কথা স্বীকারেও কবি রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠ, 'জন্মদিনে'র কবিতায় সে কথা দ্বিধাহীন কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন—

''আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।”

জীবনের অন্তিম লগ্নে এসেও কবি আত্মমগ্নতার বেড়াজালে নিজেকে আড়াল করেননি। পৃথিবীর সমস্যা, মানুষের যন্ত্রণা, অসহায়তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকেননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ধ্বংস গ্লানি থেকে যে বিশ্ব মুক্ত হয়নি সমাজ-সচেতন, বিশ্ব-মানবতাবাদী কবি তা জানেন। তিনি বিশ্বাস করেন— 'এ পাপ— যুগের অন্ত হবে।' 'চিতাভস্ম শয্যাতল' থেকে নতুন সৃষ্টির সূর্যোদয় ঘটবে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ আর শোষকের যে একদিন অবসান ঘটবে এ প্রত্যয়ে কবি অবিচল। কবির ক্লান্ত দু'চোখ ভরে আছে সুন্দর আর পরিপূর্ণ পৃথিবীর স্বপ্নে। ''জন্মদিনে'' কবির জীবৎকালে প্রকাশিত শেষ কাব্য। 'শেষ লেখা' কবির জীবনের অন্তিম লগ্নের রচনা। কাব্যটি প্রকাশিত হয় কবির মৃত্যুর পর। বইয়ের 'বিজ্ঞপ্তি' অংশে কবি পুত্র রথীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন : ''এই গ্রন্থের নামকরণ পিতৃদেব করিয়া যাইতে পারেন নাই।'' 'শেষ লেখা'র অধিকাংশ কবিতা গত সাত-আট মাসের মধ্যে রচিত। ইহার মধ্যে কয়েকটি তাঁহার স্বহস্তে লিখিত, অনেকগুলি শয্যাশায়ী অবস্থায় মুখে মুখে রচিত, নিকটে যাহারা থাকিতেন তাঁহারা সেগুলি লিখিয়া লইতেন, পরে, তিনি সেগুলি সংশোধন করিয়া মুদ্রণের অনুমতি দিতেন।'' প্রান্তিক থেকে শুরু করে 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', ''জন্মদিনে'' কাব্যগুলির মধ্যে জন্ম-মৃত্যুর স্বরূপ সম্পর্কে কবিমনে আলো-আঁধারি মানসিকতার যে প্রবাহ চলেছিল তার পরিপূর্ণ রূপ পাওয়া গেল 'শেষ লেখায়'। এখানে ভাবনা গাঢ় কিন্তু প্রকাশ সহজ সংহত নিরাভরণ স্নিগ্ধ। ভাবনার দিক থেকে প্রত্যয়ের ধারাবাহিকতা, চিন্তার শৃঙ্খলার একটুও বিচ্যুতি ঘটেনি। মৃত্যুর প্রশান্ত রূপ তাঁর চোখে পড়েছে। জন্ম ও মৃত্যুকে তিনি উপলব্ধি করেছেন একই প্রবাহিত ধারার চলমানতায়। তিনি বুঝেছেন, জীবনকে নিঃশেষ করার শক্তি মৃত্যুর নেই। জীবন চিরসত্যের দীপ্তিতে ভাস্বর। প্রকৃতির সৌন্দর্য তাই চোখে মায়াঅঞ্জন আঁকে, পাখির কলতান কানে মধুবর্ষণ করে। ভালোবাসাই শেষ সত্য। সেই সত্যের আলোকেই কবি জীবনকে দেখেছেন। এই পর্যায়ে কবি চিরন্তন সত্যদ্রষ্টা। জীবনকে ভালোবেসেই তিনি মৃত্যুকে ভালোবেসেছেন। এ যেন মরণের সঙ্গে জীবনের কথা বলা-পূর্ণতার পথ চলা। সম্ভবত সে কারণেই 'ডাকঘর' নাটকের জন্য লেখা 'সম্মুখে শান্তির পারাবার' গানটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেহান্তের পর যেন গীত হয়, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিলেন। ''রূপ-নারাণের কূলে'' জেগে ওঠা কবি মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করলেন শান্তির পারাবারের উদ্দেশে। কণ্ঠে তখনও শেষ পারানির কড়ি-গান। কাব্য-কবিতা- গানেই কবির অনন্য, অক্ষয় প্রতিষ্ঠা।

১.৪ সারাংশ

সাহিত্যের বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত রবীন্দ্র প্রতিভার অন্যতম ও বিশিষ্ট পরিচয় কবিরূপে। নিজেকে কবি রূপে চিহ্নিত করতেই তিনি স্বচ্ছন্দ ছিলেন। 'আমি কবি মাত্র', একথা তিনি বিভিন্ন ভাবে বারবার উচ্চারণ করেছেন। সদর স্ট্রীটের বাড়ির ছাদে দিনের শেষের সূর্যাস্তের বিচ্ছুরিত লাল আভা কবির মনে যে বিস্ময়, যে মায়াজাল বিস্তার করেছিল, সমস্ত জীবনের কাব্য সাধনার বিচিত্র পথের অভিযাত্রী কবি কবিতার ছন্দে বর্ণে লাবণ্যে তারই উপাচার সাজিয়েছেন। রবীন্দ্রকবিতার উন্মেষ পর্ব থেকে শুরু করে জীবনের শেষ প্রহর পর্যন্ত তারই ঐন্দ্রজালিক প্রভাব শতাব্দীর নানা উত্থান-পতনের মধ্যেও নিজের প্রতিষ্ঠাভূমি অবিচল রেখেছে। আর নিত্যনতুন অভিনব আস্বাদনের পথ ধরে তার মাত্রা বিস্তারিত হয়েছে ভাব-ভাবনার বিচিত্র পথে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য জীবনের প্রারম্ভ থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যে অবিশ্রাম কাব্য সাধনার প্রবাহ সে সৃষ্টি সম্ভার প্রাচুর্যে, বৈচিত্র্যে, বর্ণময়তা এবং ভাবগভীরতায় এত বিশাল ও অতলান্ত যে তার পরিমাপ প্রায় দুঃসাধ্য। নিতান্ত বালক বয়সে যার সূত্রপাত দীর্ঘ জীবন পথ অতিক্রম করে আশি বছরেও সে প্রতিভা সমান দীপ্ত, সমান

আকর্ষণীয়। বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষা এবং বাংলা কাব্য-সাহিত্যের পরিচিতি এবং সম্মান অর্জনের যে ইতিহাস সেখানে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা অসামান্য এবং অনন্য।

১.৫ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) কবি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখুন।

২) রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম পর্বের কাব্যগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৩) রবীন্দ্রকাব্যের দ্বিতীয় পর্বের কাব্যগুলির পরিচয় দিন।

৪) রবীন্দ্রকাব্যের তৃতীয় পর্বের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৫) রবীন্দ্রনাথের 'সোনারতরী' কাব্যে প্রকৃতির প্রভাবের দিকটি নির্দেশ করুন।

৬) রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' কাব্যের আলোকে কবির অরূপ ভাবনার দিকটি দেখান।

৭) 'বলাকা' কাব্য রবীন্দ্রকাব্যজীবনের গতিধারা এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁক। এই পর্বের কাব্য আলোচনা করে তার সত্যতা নিরূপণ করুন।

৮) রবীন্দ্রকাব্যের গোধূলি পর্যায়ে গদ্যছন্দের নতুন বিন্যাস পাওয়া যায় 'শ্যামলী' থেকে — আলোচনা করুন।

৯) রবীন্দ্রকাব্যের অন্তপর্বের পরিচয় দিন।

১০) রবীন্দ্রনাথের শেষ দুটি কাব্য 'জন্মদিনে' ও 'শেষলেখা' অবলম্বনে রবীন্দ্র মননের স্বরূপ দেখান।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) 'সংগীত' দিয়ে রবীন্দ্রনাথের তিনটি কাব্যের নাম লিখুন।

২) রবীন্দ্রনাথ কোন্ কাব্যে মুক্তক ছন্দের প্রথম ব্যবহার করেন?

৩) 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতার পূর্বনাম কী ছিল?

৪) 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরেজি অনুবাদের নাম লিখুন।

৫) রবীন্দ্রকাব্যে জীবনদেবতা বিষয়টি কী?

৬) কবি কালিদাসের কোন্ কাব্য রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লেখায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল?

৭) রবীন্দ্র কাব্যজীবনের ঐশ্বর্য পর্ব কোন্‌টি?

৮) বৈষ্ণব সাহিত্য কেন্দ্রিক রবীন্দ্রকাব্যটির নাম লিখুন।

৯) 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থটি কার স্মৃতির উদ্দেশ্যে রচিত।

১০) রবীন্দ্রনাথের হাস্যপরিহাসযুক্ত দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন।

১.৬ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা— উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

২) রবীন্দ্রসরনী— প্রমথনাথ বিশী।

৩) রবীন্দ্রনাথ— সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।

৪) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ)— সুকুমার সেন।

৫) বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (৩য় ও ৪র্থ পর্যায়)— ভূদেব চৌধুরী।

৬) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১০ম)— অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

একক-২ ❑ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য
২.২ প্রস্তাবনা
২.৩ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
২.৪ সারাংশ
২.৫ অনুশীলনী
২.৬ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে জানা যাবে— রবীন্দ্র অনুরাগী হয়েও কীভাবে স্বতন্ত্রপন্থী ভাবনার দ্বারা বাংলা কবিতায় নতুন সুর সংযোজন করে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত আধুনিক যুগের পতাকাবাহী হয়ে উঠেছিলেন। বাংলা ছন্দের নানান কারুকার্য তাঁর হাতে বিচিত্র ঐশ্বর্য লাভ করেছিল। তাঁর কবিতায় সামাজিক অনাচার, অর্থনৈতিক অব্যবস্থার উল্লেখ আছে। দেশি-বিদেশি শব্দের ব্যবহারে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এ সমস্ত জানানোই এই এককের উদ্দেশ্য।

২.২ প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব মাথায় নিয়ে, পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্তের সংস্কারমুক্ত নির্মোহ মন নিয়ে, পিতা রজনীনাথ দত্তের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্যতম ভাবনা নিয়ে বাংলা কবিতার আসরে তাঁর আবির্ভাব। ব্যক্তিগত আবেগ, কাব্যে গীতিধর্মিতা ও কল্পনা তাঁর ছিলই। পাশাপাশি প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশভাবনা, সমসাময়িক কালের ঘটনা হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু। রবীন্দ্রনাথের কথায় তিনি ছন্দ সরস্বতীর বরপুত্র। বেশ কিছু অনুবাদ করেছেন তিনি। যুক্ত ছিলেন 'ভারতী' পত্রিকার সঙ্গে। অল্প বয়সে কাব্যজগৎ থেকে বিদায় না নিলে হয়ত তিনি বাংলা সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারতেন।

২.৩ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

রবীন্দ্রানুসারী কবিদের অগ্রগণ্য ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর জন্ম ১৮৮২ খ্রিঃ ১১ ফেব্রুয়ারি (১২৮৮ বঙ্গাব্দের ৩০ মাঘ) চব্বিশ পরগনা জেলার নিমতা গ্রামে, মাতুল কালীচরণ মিত্রের বাড়িতে। তিনি ছিলেন বাংলা ভাষার অন্যতম পণ্ডিত প্রাবন্ধিক অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র। সত্যেন্দ্রনাথের পিতা রজনীনাথ দত্ত। মাতা মহামায়া দেবী। দত্ত পরিবারের আদি নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার চুপি গ্রামে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন স্বল্পায়ু। মাত্র চল্লিশ বৎসর জীবৎকালের মধ্যে তিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। ছান্দসিক কবি হিসেবেই তাঁর পরিচয় চিহ্নিত। কবি

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত স্নেহ ভাজন। কবিতা-নাটক-উপন্যাস-অনুবাদ সাহিত্যের বিচিত্র ধারায় ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ।

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগুলিকে সাধারণ ভাবে দু'টি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায় ক) মৌলিক কাব্যগ্রন্থ এবং খ) অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ। তাঁর মৌলিক কাব্যগ্রন্থগুলি হল — সবিতা (১৯০০), সন্ধিক্ষণ (১৯০৫), বেণু ও বীণা (১৯০৬), হোমশিখা (১৯০৭), ফুলের ফসল (১৯১১), কুহু ও কেকা (১৯১২), তুলির লিখন (১৯১৪), অভ্র আবীর (১৯১৬), হসন্তিকা (১৯১৭), বেলা শেষের গান (১৯২৩), বিদায় আরতি (১৯২৪)। 'হসন্তিকা' কাব্যটি ব্যঙ্গ কবিতার সংকলন। সত্যেন্দ্রনাথ এটি লিখেছিলেন 'নবকুমার কবিরত্ন' ছদ্মনামে। 'বেলাশেষের গান', 'বিদায় আরতি' এবং দুটি কবিতা সঙ্কলন 'কাব্য সঞ্চয়ন' (১৯৩০) এবং 'শিশু কবিতা' (১৯৪৫) প্রকাশিত হয়েছিল কবির লোকান্তরের পর।

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ তীর্থ সলিল (১৯০৮), তীর্থ রেণু (১৯১০) এবং মণি মঞ্জুষা (১৯১৫)।

তাঁর লেখা উপন্যাস 'জন্মদুঃখী'র প্রকাশ ১৯১২ সালে। 'ডঙ্কা নিশান' নামে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে তিনি লিখছিলেন "প্রবাসী" পত্রিকায়। ১৩৩০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় থেকে কার্তিক এই পাঁচটি সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল। কবির অকাল প্রয়াণের কারণে উপন্যাসটি অসমাপ্ত থেকে যায়। সত্যেন্দ্রনাথের মৌলিক নাটিকা ও একাঙ্ক নাটকের সংকলন 'ধূপের ধোঁয়া' প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর। তাঁর অনুবাদ নাট্যসংগ্রহ 'রঙ্গমল্লী' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৩ খ্রিঃ। সত্যেন্দ্রনাথ 'ছন্দ সরস্বতী' নামে ছন্দ বিষয়ক একটি গবেষণা মূলক প্রবন্ধ লেখেন ১৩২৫ বঙ্গাব্দে। ইংরেজি প্রবন্ধের অনুবাদ 'চিনের ধূপ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১২ সালে।

সত্যেন্দ্রনাথ প্রচুর কবিতা লিখেছেন। কবিতাগুলির বিষয় বৈচিত্র্য নিঃসন্দেহে কবির পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডল পর্যবেক্ষণ, কৌতূহলী মনন, সৌন্দর্য দর্শন ও উপভোক্তা মনের পরিচায়ক। প্রকৃতি, স্বদেশ প্রেম, গ্রাম বাংলার লোকসংস্কৃতি এমন কি সমাজ সমস্যামূলক বিষয়গুলির মধ্যেও তিনি কবিতার উপকরণ খুঁজেছেন। তবে তাঁর কবিতায় লঘু তরল কল্পনা বিলাস, কৌতূহল সৃষ্টির প্রয়াস যতটা আছে, ভাবগভীরতা সে পরিমাণে নেই। ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টি, গতির উন্মাদনা সৃষ্টিতেই কবি বেশি মনোযোগী ছিলেন। ছন্দের সুললিত ঝংকার এবং রামধনুর বর্ণময় চিত্র সম্মিলনে কবিতার যে অবয়ব সত্যেন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন তার সুর এবং অঙ্গসজ্জা পাঠককে চমকিত করে, বিস্মিত করে; কিন্তু ভাবনার সম্মোহন, বিস্ময় পাঠককে আলোড়িত করে না।

সত্যেন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার স্বরূপ নির্ণয়ে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন— "কবি কল্পনার যে দুইটি প্রকারভেদ স্বীকৃত হইয়াছে, ইংরাজিতে যাহাদিগকে Fancy ও Imagination বলে ও যাহাদিগকে কল্পনাবিলাস ও কল্পনা নিষ্ঠা এই দুই বাংলা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে, তাহাদের মধ্যে Fancy বা কল্পনার লঘুলীলাই সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ছড়ার ঝোঁকে ছন্দের নৃত্যহিল্লোলে, অনভিজাত ও বিদেশ হইতে আহূত চটুল শব্দের ধ্বনিময় প্রয়োগে, রং ও তুলির লঘু টানে, সৌন্দর্যের অনায়াসসিদ্ধ চিত্রাঙ্কণে, সর্বোপরি মানস উল্লাস ও উত্তেজনায় উপচাইয়া পড়া উচ্ছলতায় তিনি তাঁহার কবিতায় এই কল্পনালীলাকে মনোহর, সহজ অনুভবযোগ্য **** রূপ দিয়াছেন। তাঁহার হাতে কবিতার উৎকর্ষ ও বিশুদ্ধির মান কিছুটা হ্রাস পাইলেও কাব্যপরিধি যে অনেক বাড়িয়াছে ও জীবনের সহিত কাব্যের সংসক্তি যে আরও বহুমুখী ও নিবিড় হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।" সত্যেন্দ্রনাথের কবি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত-এ তিনি লিখেছেন— "তিনি (সত্যেন্দ্রনাথ) কানের দাবি মেটাতে যতটা ব্যস্ত হয়েছিলেন, প্রাণের দাবি মেটাতে ঠিক ততখানি উদাসীন ছিলেন। প্রেম সৌন্দর্যকে তিনি শব্দমন্ত্রে বশীভূত করেছিলেন, কিন্তু

জীবন সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কোনো বক্তব্য ছিল না। অধরা অপ্রাপণীয় কোনো সংকেত তাকে ব্যাকুল করেনি, কোনো গূঢ় রহস্য তাঁর কবিতাকে স্থূল সীমা ছাড়াতে সাহায্য করেনি।' সত্যেন্দ্রনাথের প্রেম বিষয়ক কবিতায় প্রেমের রঙিন বর্ণময়তা থাকলেও প্রেমের অনুভূতির গভীরতা নেই। আবার গভীর গম্ভীর ভাবাত্মক কবিতায় ছন্দ বিলাসের প্রাধান্যের কারণে মহত্তর গাম্ভীর্যের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথের কবি মনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সৌন্দর্য তৃষ্ণা। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভাবুকতা। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'ছন্দের যাদুকর' রূপে চিহ্নিত করেছেন। তিনি নিঃসন্দেহে ছন্দের যাদুকর। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি শব্দ ও রঙেরও যাদুকর। শব্দ ব্যবহারে তাঁর কুশলতা, বর্ণ-লেপনে তাঁর নিপুণতা বিস্ময়কর উচ্চতায় পৌঁছেছিল। তাঁর কবিতায় আর একটি বৈশিষ্ট্য বড়ো হয়ে উঠেছে তা হল ব্যক্তির চেয়ে সেখানে বস্তুর গুরুত্ব বেশি। পারিপার্শ্বিকতা তাঁর কবিতায় যে গুরুত্বের স্থান পেয়েছে কবি ব্যক্তিত্ব কিন্তু তেমন ভাবে প্রাধান্য পায়নি। রোমান্টিক কবির আত্ম অনুধ্যান, আত্মরতি, নিবিড় একাগ্র আবেগ সত্যেন্দ্রনাথে অনুপস্থিত। তাঁর কবিতায় ছন্দের ঝংকার আছে, বর্ণমালার বর্ণময়তা আছে, চিত্রের প্রত্যক্ষতা আছে; নেই গভীর অনুভবের ধ্যানমগ্নতা।

পারিপার্শ্বিকতা যেমন সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার বিষয়, তেমনি সমকালীন বিষয়ের পাশাপাশি পুরাণ ও ইতিহাসকেও স্বচ্ছন্দে তাঁর কবিতার বিষয় করেছেন। স্বদেশপ্রেম ও মানবপ্রেম তাঁর কাব্যভুবনের অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। বিশ্বের কাব্যভাণ্ডারকে অনুবাদের মাধ্যমে সত্যেন্দ্রনাথ বাঙালি পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, পাণ্ডিত্য এবং রসবোধ অভিনন্দনযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অত্যন্ত স্নেহভাজন সত্যেন্দ্রনাথকে স্মরণ করে লিখেছিলেন—

তুমি বঙ্গভারতীর তন্ত্রী পরে
একটি অপূর্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে।

প্রকৃতপক্ষে একান্ত রবীন্দ্রনুরাগী হয়েও বাংলা কাব্যধারায় রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র সুরের সাধনা করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁর কবি প্রতিভার এমন একটি বিশিষ্টতা ছিল যাকে রবীন্দ্রনাথ 'অপূর্ব' বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। আধুনিক কবিতার স্বরূপ লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'বিষয়ের আত্মতা'র দিকটি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। রোমান্টিক কাব্যের 'বিষয়ীর আত্মতা' থেকে স্বতন্ত্র সেই বস্তুতন্ময়তাই ছিল সত্যেন্দ্রনাথের কবি বৈশিষ্ট্যের অন্যতম দিক। একারণেই সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা অনুভূতিময় আবেগ সৃষ্টি না করলেও মনঋদ্ধ রূপোল্লাস সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। প্রথম কাব্য 'সবিতা'র ভূমিকায় কবি লিখেছিলেন 'দর্শনের অবসাদ ঔদাস্য যথেষ্ট হইয়াছে— আর নয়। যদি স্বজাতীয়ের বিলোপ বাঞ্ছিত না হয় তবে এখনও দার্শনিক নিশ্চেষ্টতা পরিহার করিয়া বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানোন্নত শিল্পশিক্ষা কর্তব্য।" সত্যেন্দ্রনাথের জ্ঞানস্পৃহার পরিচয় রয়েছে কাব্যের নাম কবিতায়। এই কবিতাটি সম্পর্কে কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন— "সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় জ্ঞানের শুভ্র আলোক -মহাসরস্বতীর সেই জ্যোতি ভাবে ও রূপে বর্ণময় হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের অতীত সাধনায় মানুষের যে গৌরব—সেই গৌরবের গর্ব এবং সেই জাতিরই বর্তমান অধঃপতনে তীব্র গ্লানিবোধ-ইহাই তাঁহার কবিতার ভাবের দিক। কিন্তু জ্ঞানের সেই শুভ্র আলোক যে অনুভূতির আবেগে রঙিন হইয়া উঠে তাহাও জাগ্রত অনুভূতির আবেগ-স্বপ্ন কল্পনার রঙ নয়।"

সত্যেন্দ্রনাথের মানবানুরাগ বিভিন্নভাবে তাঁর কবিতায় ছায়া ফেলেছে। বঙ্গভঙ্গ যুগে মানবতার অপমান, অসহায়তা

তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ কবি কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে

মানি না গীর্জা মঠমন্দির, কল্কি পেগম্বর,
দেবতা মোদের সাম্য-দেবতা, অন্তরে তার ঘর,
রাজা আমাদের বিশ্ব-মানব, তাঁহারি সেবার তরে,
জীবন মোদের গড়িয়া তুলেছি শত অতন্দ্র করে;

নিরীশ্বর বিজ্ঞানবুদ্ধিজাত আধুনিকতার সুস্পষ্ট উচ্চারণ এখানে লক্ষ্য করা যায়।

শব্দ ব্যবহারের সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার তাৎপর্যপূর্ণ দিক। তদ্ভব, দেশি, বিদেশিসব রকম শব্দই ধ্বনিসৌষম্যে ব্যবহারের কৃতিত্ব কবি দেখিয়েছেন। নজরুলের আগেই বাংলা কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগে তিনি ঈর্ষণীয় সাফল্যের পরিচয় রেখেছেন। সার্থক সনেট রচয়িতা রূপে সত্যেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। সনেটের আঙ্গিকগত সংহতি কবিকে রূপনির্মাণে সংযমী করেছে। তুলনামূলক ভাবে ক্ষুদ্র-দেহ কবিতায় কবি বেশি সার্থক। লঘুভাবের কবিতা রচনায় সত্যেন্দ্রনাথের সাফল্য নির্দেশ করতে গিয়ে অধ্যাপক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত ''বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস''-এ লিখেছেন, ''যেসব কবিতায় তরল লঘু ভাব ও সুরের আলাপ করেছেন কবি সেখানে প্রায়ই তিনি সফল হয়েছেন। এদের মধ্যে ভাবগভীরতা নেই, কিন্তু চিত্ররচনার নৈপুণ্য আছে। খেয়ালখুশিতে নানা হালকা রঙ আর মিঠে সুর মিশিয়ে কবি এই বিচিত্র রামধনু গড়ে তুলেছেন যেন। এই অপূর্ব দায়িত্বহীনতার স্বাদ সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার একটি বড়ো অবদান।''

২.৪ সারাংশ

রবীন্দ্র অনুরাগী স্বতন্ত্র কবিগোষ্ঠীর তিনি একজন। তবে স্বকীয় প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যে তিনি বিশিষ্ট। ভাষা, ছন্দ, আঙ্গিক— এসব ক্ষেত্রে তিনি বাংলা কবিতায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছিলেন। কবি রূপে পরিচিত হলেও তিনি ভিন্ন ধারার সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। বিভিন্ন দেশের কবিতার অনুবাদ করেছেন। প্রাচীন যুগের ভারতভাবনা তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল। ছন্দকে বাংলাভাষায় সহজভাবে প্রয়োগ করে তিনি 'ছন্দের যাদুকর' হয়ে উঠেছিলেন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মূল্যায়নে লিখেছেন— ''সত্যেন্দ্রনাথ যুক্তির দ্বারা কল্পনাকে সংযত করেছেন, বাস্তব প্রত্যয়ের দ্বারা আবেগকে সীমার মধ্যে টেনে এনেছেন এবং মর্তের বুকে দাঁড়িয়ে স্বর্গকে কামনা করেছেন। মোটামুটি তাঁকে প্রত্যক্ষতার কবি বলা যেতে পারে।''

২.৫ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) ছান্দসিক কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২) সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৌলিক কাব্যগ্রন্থগুলির পরিচয় দিন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে 'ছন্দের যাদুকর' নাম কে দিয়েছিলেন?

২) সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগুলিকে কটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?

৩) সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ কাব্যগুলির নাম লিখুন।

৪) অক্ষয়কুমার দত্ত কে ছিলেন?

৫) সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা ছন্দ বিষয়ক প্রবন্ধটির নাম লিখুন।

২.৬ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (৫ম খণ্ড)—সুকুমার সেন।

২) বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত— অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩) বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস—ক্ষেত্র গুপ্ত।

একক-৩ ❑ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মোহিতলাল মজুমদার

গঠন

৩.১. উদ্দেশ্য
৩.২ প্রস্তাবনা
৩.৩ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
৩.৪ মোহিতলাল মজুমদার
৩.৫ সারাংশ
৩.৬ অনুশীলনী
৩.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবেন কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও কবি মোহিতলাল মজুমদার এরা দুজনেই রবীন্দ্রযুগে বেড়ে উঠেছিলেন, রবীন্দ্র সাহিত্যকে তাঁদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছেন, কিন্তু কাব্য-কবিতা রচনায় নিজেদের মৌলিক চিন্তার দ্বারা এক অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত হয়ে বাংলা কবিতায় কীভাবে নতুন পথ সৃষ্টি করা যায় তার ইঙ্গিত এদের রচনায় মেলে। জগৎ ও জীবনের মূলভাবকে ফুটিয়ে তোলাই এই কবিদের উদ্দেশ্য ছিল।

৩.২ প্রস্তাবনা

বাংলা কাব্যে আধুনিকতার সুর সঞ্চারকারী কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। বৃত্তিতে ইঞ্জিনিয়ার হয়েও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ ও নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা তিনি বাংলা কবিতার সংস্কার ভাঙতে চেয়েছেন। বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন। তাঁর কবিতায় জীবনের ভয়াবহতা লক্ষ্য করা যায়। আবেগপ্রবণ বাংলা কাব্যে বুদ্ধিকেন্দ্রিক চমক সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। একইভাবে কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারও কাব্য ও জীবনকে পাশাপাশি রেখেছেন। তাঁর রচনায় বলিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায়। নিজের রচনার গুণে মোহিতলাল মজুমদার আজও বাংলা কবিতায় তাঁর জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে পেরেছেন।

৩.৩ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র কবিভাবনার জন্য রবীন্দ্রযুগের অন্যতম ব্যতিক্রমী কবিরূপে মান্যতা পেয়েছেন। সর্ব নশ্বরতার ভাবনা এবং তার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কিত জীবনতৃষ্ণা, যা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্ট সত্য এবং জ্ঞান বুদ্ধির সীমায় যাকে ধরা যায় এমন ভাবনা সঙ্গে নিয়ে যতীন্দ্রনাথ তাঁর অনন্য কাব্যভুবন সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কাব্য ভাবনার অন্যতম দিক দুঃখবাদ। তাঁর দুঃখবাদী ভাবনার কেন্দ্রে কোনো দুর্জ্ঞেয় অতীন্দ্রিয়তার চেতনা

নেই। বুদ্ধির আলোকে তাকে বিশ্লেষণ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের সম্মোহন থেকে কবিতাকে, কবিতার বিষয়কে তিনি নামিয়ে এনেছিলেন বাস্তবতার রুক্ষভূমিতে। সে সময়ের তরুণ বুদ্ধিবাদী কবি বুদ্ধদেব বসু যতীন্দ্রনাথের কবিতায় পেয়েছিলেন কবিতার নতুন পরিকাঠামোর আশ্বাস। তিনি স্বীকার করেছেন— ''এই আশ্বাস যে আবেগের রুদ্ধশ্বাস জগৎ থেকে সাংসারিক সমতলে নেমে এসেও কবিতা বেঁচে থাকতে পারে।'' এবং তিনি এই বিশ্বাসে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন যে, 'একটি উদাহরণ যে পরিশীলিত ভাষা ও সুবিন্যস্ত ছন্দের বাইরে চলে এলেও কবিতার জাত যায় না।''

যতীন্দ্রনাথের কবিতার মৌলিক লক্ষণ নির্দেশ প্রসঙ্গে সমালোচক কবি মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন ''রবীন্দ্রকাব্যের সেই গূঢ় অন্তর্নিহিত রস সাধারণের পক্ষে দুর্লভ হইয়া রহিল বটে, কিন্তু ঐ কাব্যকলাই একটি নূতন কাব্য সম্প্রদায়ের উপজীব্য হইয়া উঠিল। তাহাতে বাংলা কবিভাষা ও কাব্যছন্দের যে অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছে তাহা আমরা সকলেই সগর্বে স্বীকার করি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেই রসকল্পনার দুঃসাধ্য অনুকরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইয়াছে। তাহার ফলে বাস্তবকে অস্বীকার করিয়া অতি উচ্চ ভাব কল্পনার অভিমানে— মানব হৃদয়ের যে সত্য, দেহ সংস্কারের যে অতিজাগ্রত অনুভূতি ও আকুতি তাহার প্রতি মিথ্যাচারণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া ছিল। কবি যতীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন।''

যথার্থ বিশ্লেষণে এই সত্যে পৌঁছনো যায়, রবীন্দ্রনাথের ''অবিরল অতীন্দ্রিয়তার পরে'' যতীন্দ্রনাথের কাব্যের এই বিদ্রোহের সুরেই বাংলা কবিতার আধুনিক পূর্বরাগিণী শোনা গিয়েছিল। যতীন্দ্রনাথের কবিতায় পাওয়া গেল তারই সহজ ভাষা। কবি লিখলেন —

''কল্পনা, তুমি শ্রান্ত হয়েছ, ঘন বহে দেখি শ্বাস,
বারোমাস খেটে লক্ষ কবির একঘেয়ে ফরমাস?
সেই উপবন, মলয় পবন, সেই ফুলে ফুলে অলি,
প্রণয়ের বাঁশি, বিরহের ফাঁসি, হাসা কাঁদা গলাগলি।
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঐ ছুটে যায় লক্ষ মরণ-ঘোড়া,
প্রেমের বলগা বৃথাই কসিছে সোয়ার সে জোড়া জোড়া,
ঢেলে সাজো, সেজে ঢালো,
সকল দুঃখ সূক্ষ্ম হউক, যত সাদা সব কালো।''

অত্যন্ত সচেতন বিশ্বাসে যতীন্দ্রনাথ রোমান্টিকতার স্বপ্নস্বর্গের আবেষ্টনী থেকে কবিতাকে মুক্ত করে তাকে প্রতিষ্ঠা দিলেন দুঃখদীর্ণ বাস্তবতায়, প্রাত্যহিকতার সমতলে। রবীন্দ্র অনুসারী কাব্যের সুখবাদের প্রবলতার বিরুদ্ধতায় যতীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যভাবনার কেন্দ্র সত্য রূপে স্বীকৃতি দিলেন দুঃখকে। তাঁর কাব্যে সব দুঃখ যথার্থই ''সূক্ষ্ম'' হয়েছে এবং ''সাদা''র অন্তর্বর্তী ''কালো''কে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। এ কারণেই দুঃখবাদী অভিধায় চিহ্নিত হয়েছে তাঁর কবি সত্তা। জগতের সব কিছুর মধ্যেই তিনি দুঃখের নিদারুণ অভিঘাত লক্ষ্য করেছেন। কবিবন্ধু যতীন্দ্রনাথ বাগচী তাঁর এই সর্বাত্মক দুঃখময় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি কটাক্ষ করে রচনা করেছিলেন 'দুঃখবাদী' কবিতা। তারই প্রতিক্রিয়ায় যতীন্দ্রনাথ লিখলেন ''সুখবাদী'' কবিতা। সেখানে কবি দ্বিধাহীন কণ্ঠে বললেন সুখ-দুভি ছাপায়ে বন্ধু উঠে দুঃখেরই জয়। যতীন্দ্রনাথের ভাবনায় মরুভূমির দাবদাহে তৃষ্ণার্ত যাত্রীর কাছে মরীচিকা যেমন সত্য, এ জগতে সুখও তেমনি

সত্য। কবির সমস্ত কাব্য জুড়ে বারবার এসেছে মরুভূমির অনুষঙ্গ। জীবনযন্ত্রণার সঙ্গে মরুভূমির দাহকে মিশিয়েছেন কবি। তাঁর কবি স্বভাবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল মরুভাবনা। তাঁর কবিতায় মরুভূমির রূপকে এসেছে বাস্তব জীবনের সুতীব্র দুঃখ যন্ত্রণার কথা। নিজের কাব্য ভাবনা সম্পর্কে যতীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি— ''আমি চিরশ্যামল বাংলা কাব্যে মরুভূমির পর মরুভূমি আমদানি করে একটা কৌতূহল জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলাম।'' তবে একথা মান্যতা পাবে যে, শুধু কৌতূহল জাগাবার প্রয়োজনে মরুভূমির অনুষঙ্গ তিনি কাব্যে আনেননি, তাঁর কবি অন্তরে মরুভূমির ভাবনা ছিল ওতপ্রোত জড়ানো। তবে এই মরু ভাবনাকে তিনি আদর্শায়িত করতে চাননি।

যতীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের কাব্যের নামকরণে মরুদহনের প্রভাব সুস্পষ্ট। মরীচিকা (১৯২৩), মরুশিখা (১৯২৭), মরুমায়া (১৯৩০) কাব্যের এই নামকরণের মধ্যেই মরুচেতনার সুদূর প্রসারী প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। তাঁর প্রথম পর্বের কবিতায় প্রকৃতি ভাবনা, মানুষ কিংবা ঈশ্বর সব কিছুর মধ্যেই দুঃখের অস্তিত্ব সুস্পষ্ট। তাঁর ভাবনায় এই জগৎ 'হেঁয়ালি' মাত্র। এখানে নিয়ম থেকে অনিয়মই বেশি। সর্বত্রই 'গোঁজামিল'। জগৎ স্রষ্টাও দুঃখের শৃঙ্খলে বাঁধা। তাঁর থাকা না থাকা দুই-ই সমান। তাঁর কাব্যের কেন্দ্রে রয়েছে মানুষ—মানুষের বাস্তবজীবন। তাই কাব্যে শোনা যায় মন্দ্রিত ঘোষণা—

''শুনহ মানুষ ভাই।
সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা আছে বা নাই।''

কবি আরও বলেছেন—

''মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন সুখ;
সত্য সত্য সহস্রগুণ সত্য জীবের দুখ।''

কবি অসংকোচে নিজের উপলব্ধ জীবন সত্য উচ্চারণ করেছেন—

''সত্য দুখের আগুনে বন্ধু পরাণ যখন জ্বলে,
তোমার হাতের সুখ-দুখ দান ফিরায়ে দিলেও চলে।''

যতীন্দ্রনাথ কোনো তাত্ত্বিকতার আবরণে জীবনকে দেখেননি। কোনো কল্পিত স্বর্গের প্রত্যাশায় মানুষের সীমাহীন দুঃখের মধ্যে মিথ্যা আনন্দের রংমশাল জ্বালাতে চাননি। মরীচিকা কাব্যের 'ঘুমের ঘোরে', 'শীত', 'নব নিদাঘ' প্রভৃতি কবিতায় শোনা গেছে তীব্র বাস্তবতার সুর। 'মরুশিখা' কাব্যের 'অন্ধকার', 'দুখবাদী', 'লোহার ব্যথা' কবিতার মধ্যেও বাস্তব বিশ্বাসের দিকটি সুস্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত। 'মরুমায়া' কাব্যে জীবনকে দেখার তীব্রতা আরও গভীর। এখানে যুক্তির তীক্ষ্ণতা বেশি। দুঃখের কবি, 'কেতকী', 'লীলাকীর্তন', 'পাষাণ পথে' ইত্যাদি কবিতাগুলিতে জীবনকে দেখার তির্যক দৃষ্টি প্রাধান্য পেলেও যুক্তির স্থানে হৃদয়বত্তার সুর লক্ষ্য করা গেছে। অস্পষ্ট হলেও 'নবান্ন' কবিতায় এ সুর বিশেষ তাৎপর্যবহ। এই কবিতায় কবি লিখেছেন—

''তার চেয়ে এস প্রভাত আলোকে চেয়ে থাকি দূরে দূরে,
বাঁকা নদী যেথা চরের কাঁকালে জড়ায় জরির ডুরে।
যেথায় আকাশে ভুলে নেমে আসে মানস মরালশ্রেণী,
যেথা দিক্‌বালা শীতের বেলায় এলায় আঁচল বেনী।''

যতীন্দ্রনাথের উত্তরপর্বের তিনটি কাব্য— সায়ম (১৯৪০), ত্রিযামা (১৯৪৮), নিশান্তিকা। সায়ম কাব্যে দিক পরিবর্তনের সুর শোনা গেল। দীর্ঘ মরুপথ শেষ দিনান্তে যেন এসে পৌঁছলেন মরূদ্যানের শান্ত ছায়ায়। এই কাব্যের সর্বদেহে দিক পরিবর্তনের চিহ্ন সুস্পষ্ট। কবি হৃদয়ের এমন অনায়াস প্রকাশ এর আগে ঘটেনি। অবহেলিত প্রেমের সৌরভ এখানে কবি চিত্তের বেদনাকে সুরভিত করেছে। প্রবল নশ্বরতাবোধ কবিকে জড়বাদী করে তুলেছিল। এখানে জড় চেতনার আশ্রয়। খুঁজেছে। একদা অস্বীকৃত প্রেম-যৌবন-সৌন্দর্যবোধ এ কাব্যের আধারে ধরা পড়েছে করুণ বিষণ্ণতায়। এই কাব্যের ''বেদেনী'' কবিতা কবি-মানসের উত্তরণ তথা দিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহু। ''বেদেনী'' কবির অন্তরলক্ষ্মী। বাস্তব জীবনযাত্রার বাস্তব চিত্রের মধ্যে কবি এখানে সঞ্চার করেছেন রোমান্টিক ভাবনা। বেদেনীকে উদ্দেশ্য করে কবির তাই জিজ্ঞাসা—

‘কি হ’ল বেদেনী তোর?
উড়ো মেঘে রাখি নিশ্চল আখি
কোন বেদনায় ভোর ?’
কিংবা
''কেন উদাসীন আনমনা হেন।
বেদেনী বেদের মেয়ে?
দূরের বাঁশীর সুরে তুইও কিরে
উঠিবি কাদুনি গেয়ে।''

শুধু নামকরণেই নয়, বিভিন্ন চিত্রকল্পেও সায়াহ্নের আবহ ধরা পড়েছে। ‘জংশন স্টেশন’, ‘মন্ত্রহীন’, ‘কুয়াশা’, ‘কচিডাব’, ‘শাওনিকা’ ইত্যাদি কবিতায় এই ভাবনার প্রতিচ্ছবি।

‘ত্রিযামা’ কাব্যে কবি অন্তরের বেদনার সুর আরো গাঢ়। এই কাব্যের ‘ঘুমের সাথী’ কবিতায় বেজেছে বেদনার সুর। বর্ষণ মুখরিত শ্রাবণ রাতে কবির চোখেও শ্রাবণের ঘনঘোর। কবি তাঁর সাথির মধ্যে ঘুমের সখীর সন্ধান করেছেন।

''নয়নে ঘনালো শ্রাবণের ঘোর
বর্ষণ ঘন রাতি,
তোমার মাঝারে খুঁজি আজ সখি
আমার ঘুমের সাথী।''
এবং
''আমাদের সেই সোনার আঁচড়ে
একটি কোরকে যদি রং ধরে,
মেলে যদি দল একটি কমল
সার্থক হলে আমাদের ঘুম
নীলজল-শয্যাতে,

সার্থক হলে আমাদের ঘুম
আজি এ শ্রাবণ রাতে।”

দাম্পত্য প্রেমের গভীরেই তিনি খুঁজেছেন অন্তরের আশ্রয়। ‘শপথ ভঙ্গ’ কবিতার রোমান্টিকতার দিকটি লক্ষ্য করার মতো। ‘মনোরমা’ কবিতাতে কবি একদা অস্বীকৃত প্রেমের উদ্দেশ্যে ব্যথার অঞ্জলি নিবেদন করেছেন। কবি বলেছেন—

‘‘হাজার বার দেখেছি যারে—
আবারও চাই দেখিতে তারে।
শেষের দেখা যদি বা থাকে
দেখার শেষ নাই গো বুঝি।
**** ‘‘দুয়ার খোলো প্রদীপ জ্বালো দেখিবে কবি কবির প্রিয়া—
তোমারি মাঝে তোমারে, আর
হারানো মনোরমারে তার।”

‘নিশান্তিকা’য় যতীন্দ্রনাথের কাব্যবৃত্ত সম্পূর্ণ হয়েছে। যৌবনে অস্বীকৃত প্রেম-সৌন্দর্য-মাধুর্যের স্বরূপ কবি আবার নতুনভাবে পেতে চেয়েছেন। প্রথম জীবনের কাব্যে মরু ভাবনা সঞ্চারিত করার মধ্যে এক জাতীয় রোমান্টিকতার পরিচয় রয়েছে। কিন্তু এ রোমান্টিকতা পারিপার্শ্বিক বাস্তব দুঃখময় জীবন উৎস থেকে রস সঞ্চয় করেছে। তাই এ ভাবনা বা চেতনা রিয়ালিস্টেরই সগোত্র। আর উত্তর পর্বে কবি রোমান্টিকতার গভীরে অবগাহন করে নতুন সৃষ্টির উৎসবে মেতেছেন। যতীন্দ্রনাথের কবি মনের এই পালা বদলের স্বরূপ প্রসঙ্গে অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন, দ্বিতীয় পর্বে কবির দৃষ্টি রুদ্রের বামাস্য ছেড়ে প্রসন্ন দক্ষিণ মুখের ওপর পড়েছে এবং কবিতায় ধরেছে নানা রস ও বহু রং। কিন্তু এই বাম ও দক্ষিণ মুখ যে রুদ্রেরই মুখ একথা ভোলা যায় না। এ প্রসঙ্গে ড. ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন— ‘‘কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থগুলিতে রূপক রচনার প্রবণতা যেমন বেশি তেমনি ব্যাঙ্গের সুর তীব্র। শেষ কাব্যগ্রন্থে স্বরগ্রাম নিচে নেমেছে। কবি কতকটা আত্মনিষ্ঠ হয়েছেন। রূপকের স্থানে রূপকল্প এসেছে। কবির কাছে বার্ধক্যের বিদায় বেদনা বেজেছে।”

৩.৪ মোহিতলাল মজুমদার

কবি হিসেবে মোহিতলাল মজুমদার ক্লাসিক রীতির অনুবর্তী। তাঁর কবিতার শিল্পরীতিতে তথা আঙ্গিকে দৃঢ় শৃঙ্খলার অনুশাসন। তাঁর কাব্যরীতি বহিরঙ্গের দিক থেকে অনেকটাই উনিশ শতকের ক্লাসিক সংহতির কথা মনে করায়। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতার অন্যতম পুরোধা হিসেবে তাঁর স্থান অভিনব এবং স্বতন্ত্র। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি, সম্পর্কে ‘সাহিত্য বিতান’ গ্রন্থে মোহিতলাল লিখেছেন — ‘‘যাহা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি, তাহাতে Ideal-ও নাই Real-ও নাই, কিন্তু রোমান্স আছে—থাকিবেই। রোমান্স অর্থে অতিচারী কল্পনা নয়, সত্যকার কল্পনা। যে কল্পনা জড়কে চিন্ময় দেখে, খণ্ড ও বিচ্ছিন্নকে সমগ্র ও অর্থপূর্ণ করিয়া লয় — যাহা ভগ্নকে যুক্ত করে, অসংলগ্নকে সুসমৃদ্ধ করিয়ে তোলে। তাহাই সাহিত্যকে রোমান্স গুণযুক্ত করে—অর্থাৎ জীবনের খণ্ড রেখায় যে মণ্ডলাভাস আছে, তাহার পূর্ণ মণ্ডল আবিষ্কার করে। এই কল্পনার মূলে আছে প্রেম, ইহাই সুস্থ, কল্পনা যেখানে আত্মপরায়ণ বা আত্মদ্রোহী

সেখানে রূপ সৃষ্টির রোমান্স নাই; অবাস্তব ভাববিলাস, অথবা বাস্তবের বস্তু বিশ্লেষণ আছে।" কবি মোহিতলাল বিশ্বাস করতেন, রোমান্টিক কবি-কল্পনা ছাড়া কাব্যসৃষ্টি সম্ভব নয়। এদিকের বিচারে মোহিতলালও রোমান্টিক কবি। তবু জন্ম রোমান্টিক রবীন্দ্রোত্তর কাব্য ভুবনে আধুনিক কবিদের হাতে যে নতুন বাংলা কাব্য ধারার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল, মোহিতলাল ছিলেন সেই আধুনিক কবিদের অন্যতম পুরোধা।। রবীন্দ্র প্রভাবিত কাব্যবৃত্তের সমকালীন হয়েও সম্পূর্ণ নতুন সুরে, নতুন আঙ্গিকে, নতুন ভাবভাবনায় কাব্য রচনা করে মোহিতলাল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারার কবি হিসেবে নিজের অবস্থান সুস্পষ্ট করেছিলেন।

ইউরোপীয় রোমান্টিক কবিদের মতো কল্পনার বিস্ময়কর সুদূরাভিসার রবীন্দ্রকাব্যের বিশিষ্ট দিক। যার মূল সুর অনির্দেশ্য সৌন্দর্য ব্যাকুলতা, সুদূরের প্রতি গভীর পিপাসা, ফেলে আসা অতীত পৃথিবীর জন্য ব্যাকুল মমত্ববোধ এবং তা হারিয়ে যাবার কারণে নিবিড় বেদনা বোধ, রহস্যময় ভবিষ্যতের অবগুণ্ঠন মোচনের জন্য শান্ত অথচ তীব্রবাসনা। রবীন্দ্রনাথের এই রোমান্টিক ভাবনার পরিমণ্ডল থেকে সচেতনভাবে সরে এসেছিলেন মোহিতলাল। রবীন্দ্র প্রতিস্পর্ধীরূপে বিপরীতধর্মী রোমান্টিক ভাবনা নিয়ে এলেন বাংলা কবিতায়। তাঁর কাব্যগ্রন্থ স্বপনপসারী (১৯২২) এবং বিস্মরণী (১৯২৭) তে মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনার বিমূর্ত দ্যোতনার অভিক্ষেপ থেকে সরে এলেন। সূচনা করলেন ভিন্নমুখী রোমান্টিকতার। বিমূর্ত সৌন্দর্যবাদের পরিবর্তে মোহিতলাল আনলেন দেহবাদ। 'মোহমুদ্গার' কবিতায় কবি ঘোষণা করলেন তাঁর দেহবাদী সৌন্দর্য দর্শন। সেখানে তিনি বললেন—

"উর্ধ্বমুখী ধেয়াইয়া রাজাহীন রজনীর মল্লিকা মাধবী/ নেহারিয়া নীহারিকা ছবি— / কল্পনার দ্রাক্ষাবনে মধু চুষি নীরক্ত অধরে,/ উপহাসি দুগ্ধধারা ধরিত্রীর পূর্ণ পায়োধরে,/ বুভুক্ষু মানব লাগি রচি ইন্দ্রজাল / আপনা বঞ্চিত করি চির ইহকাল। / কতদিন ভুলাইবে মর্ত্যজনে বিলাইয়া মোহন আসব / হে কবি বাসব?" এখানে শ্লেষগর্ভ বক্তৃতায় মোহিতলাল রবীন্দ্র রোমান্টিকতার বাস্তবতাহীনতার দিকটি নির্দেশ করেছেন। তাঁর লক্ষ্য এখানে নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ। মানুষের কামনা বাসনা একান্ত স্নায়ু-শিরা-শোণিত ময়; এবং দেহগত অস্তিত্বময় জীবনেও রহস্যের অন্ত নেই। এই রহস্যময় অনিঃশেষ গহনে কবি কল্পনাকে সঞ্চারিত করেছিলেন কবি মোহিতলাল। রবীন্দ্র রোমান্টিকতার সঙ্গে এখানেই তাঁর দূরত্ব এবং বিরোধ।

রোমান্টিক কবি মোহিতলাল তাঁর নিজস্ব রোমান্টিক স্বভাব বৈশিষ্ট্যে নিজের মানসলক্ষ্মীর কল্পিত রূপ রচনা করেছেন। কিন্তু সে রূপের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিরন্তন মানসসুন্দরী অথবা শেলীর Intellectual Beauty-র কোনো মিল নেই। এই মানসী যেন কোনো একদিন কবির একান্ত পরিচিত ছিল, তাঁর দেহগত অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। সেই সুখের আবেশে আচ্ছন্ন কবি সেই মানসসুন্দরীকে পুনর্বার নিজের বাহুপাশে বাঁধতে চেয়েছেন। — "আর কি কখনও বাহুপাশে দিবে না ধরা/ হৃদয়সাগরে হয়ে গেছে তার কলস ভরা।" এখানেই ভোগবাদী মোহিতলালের ইন্দ্রিয়ময় দেহসৌন্দর্যবাদের বৈশিষ্ট্য। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল— স্মরগরল (১৯৩৬) হেমন্ত গোধূলি (১৯৪১) ছন্দ চতুর্দশী (১৯৫১) ইত্যাদি।

নব্যতান্ত্রিক মোহিতলালের জীবনের আদর্শ নীলকণ্ঠ। রবীন্দ্রনাথের নটরাজের সঙ্গে তাঁর অনেকটাই দূরত্ব। 'স্বপন পসারী' কাব্যের 'পাপ' কবিতায় তিনি বলেছেন—

> "ত্যাগ নহে, ভোগ,— ভোগ তারি লাগি, যেই জান বলীয়ান।
>
> নিঃশেষে ভরি লইবারে পারে এত বড় যার প্রাণ।
>
> যেজন নিঃস্ব, পঞ্জরতলে নাই যার প্রাণধন

জীবনের এই উৎসবে তার হয়নি নিমন্ত্রণ।"

দুঃখবাদী দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের মতো তিনিও জানেন জীবন অনিবার্য ভাবেই দুঃখময় তবু তাঁর ভোগবাদী মন বলে, 'বিষরস পান করি স্বাদ পাই স্বরগ সুধার।" 'পান্থ' কবিতায় কবির উচ্চকণ্ঠ ঘোষণা :

''চিনি বটে যৌবনের পুরোহিত প্রেম দেবতারে—
নারীরূপা প্রকৃতিরে ভালবেসে বক্ষে লই টানি,
অনন্ত রহস্যময়ী স্বপ্নসখী চির-অচেনারে,
মনে হয় চিনি যেন— এ বিশ্বের সেই ঠাকুরাণী,
নেত্র তার মৃত্যুনীল।"

মোহিতলাল এরূপ দেহময়, জ্বালাময় ও মৃত্যুময় জীবনের রসই আকণ্ঠ পানে তৃপ্ত হতে চেয়েছেন। এটাই কবির বিশিষ্ট ভোগবাদ।

স্বভাব-কবি গোবিন্দ দাসের ভোগবাদ কবিকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু গোবিন্দ দাসের ভোগবাদে পরিণামী বিবর্তন ছিল না, মোহিতলালের ভোগবাদী দর্শনে পরিণামমুখী গতিই কাব্যকে স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা দিয়েছে। এর মধ্যেই সুস্পষ্ট হয়েছে কবির মনোভাবনার পরিচয়। স্বভাবকবি গোবিন্দ দাসে ভোগবাদী ভাবনা একটি বিন্দুতেই সীমিত। যার উচ্চারণ— ''আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।" অন্যদিকে মোহিতলালের কণ্ঠে শেষপর্যন্ত ধ্বনিত হয়েছে—

''আমার পীরিতি দেহ-রীতি বটে, তবু সে যে বিপরীত—
ভস্মভূষণ কামের কুহকে ধরা দিল স্মরজিৎ।
ভোগের ভবনে কাঁদিছে কামনা—
লাখ লাখ যুগে আঁখি জুড়ালো না।
দেহেরি মাঝারে দেহাতীত করে ক্রন্দন সঙ্গীত। (স্মরগরল)।

এ কামনার দর্শন নিঃসন্দেহে বাংলাকাব্যের আধুনিকতার পথিকৃৎ। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত যথার্থই বলেছেন— ''মোহিতলালকে আমরা আধুনিকতার পুরোধা মনে করতাম। এক কথায় তিনি ছিলেন আধুনিকোত্তম।"

জীবনবাদী কবি মোহিতলালের কাব্য প্রতিভার মৌল বৈশিষ্ট্য সবল পৌরুষ, ব্যঞ্জনাময় জীবন বিশ্বাস তথা জীবন পিপাসা। কবির উনত্রিশ বছর বয়সের রচনা 'স্বপন পসারী' কাব্যগ্রন্থের 'অঘোর পন্থী' কবিতায় সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে তাঁর প্রদীপ্ত যৌবন বাসনা তপ্ত ভোগবাদী দর্শনের স্বরূপ। তান্ত্রিকের বীরাচারী সাধনার পটভূমিতে মৃত্যুঞ্জয় জীবনসাধনা ও জীবনোপভোগের উন্মাদনার এই দীপ্ত সুর সমকালীন বাংলাকাব্যে একেবারে অভিনব। আসব-নেশাচ্ছন্নতার জন্যই কবি ত্রিলোকের কেন্দ্রগত সুরটি শুনতে পেয়েছেন। সর্বত্রই তিনি শুনেছেন জীবন তৃষ্ণার জয়গান। জীবনবাদী ভোগবাদী কবির কাছে ভোগই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য, জীবনই সমস্ত মাধুর্যের উৎস। জীবনের শেষে দিন পর্যন্ত কবি ভোগের নিত্য নতুন উৎস অনুসন্ধানের মধ্যে আনন্দরূপ অমৃত সংগ্রহে নিমগ্ন থাকবেন। জীবনানন্দের দীপ্তিতে মৃত্যুর অন্ধকারও ভাস্বর হয়ে উঠবে। সোনা হয়ে উঠবে শ্মশানের ধূলি। এই ভাবনার পথেই মৃত্যুর ওপর জীবনের জয় ঘোষিত হয়েছে। কবি বলেছেন— ''জীবন মধুর ! মরণ নিঠুর— তাহারে দলিব পায়। যত দিন আছে মোহের মদিরা ধরণীর পেয়ালায়।"

৩.৫ সারাংশ

'রবীন্দ্রানুরাগী স্বতন্ত্রপন্থী কবিগোষ্ঠী'র মধ্যে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মোহিতলাল মজুমদার অন্যতম। এঁরা রবীন্দ্রসাহিত্যে অনুরক্ত হলেও প্রত্যেকের কাব্যে তাঁদের নিজস্বতার সুর ধ্বনিত হয়েছে। যতীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে রূঢ় বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর রচনায় ব্যবহৃত চিত্রকল্প পাঠককে মুগ্ধ করে। মোহিতলালও বাংলা সাহিত্যে নিজের পথ নিজে তৈরি করেছিলেন। তাঁর কাব্যে আছে দেহবাদের অকুণ্ঠ প্রকাশ। আছে ক্লাসিক ও রোমান্টিকতার সার্থক সমন্বয়। এই দুই কবি কাব্যের বিষয়বস্তু ছাড়াও ভাষা ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

৩.৬ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবি প্রতিভার বৈশিষ্ট্য দেখান।

২) যতীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের কাব্যের নামকরণে মরুদহনের প্রভাব সুস্পষ্ট— আলোচনা করুন।

৩) যতীন্দ্রনাথের উত্তর পর্বের তিনটি কাব্য— সায়ম, ত্রিযামা এবং নিশান্তিকার পরিচয় দিন।

৪) মোহিতলাল মজুমদারের কবিকৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৫) রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতার অন্যতম পুরোধা হিসাবে মোহিতলালের স্থান অভিনব এবং স্বতন্ত্র— আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে কী জাতীয় কবি আখ্যা দেওয়া হয়?

২) 'মরু' নাম দিয়ে যতীন্দ্রনাথের কটি কাব্য আছে?

৩) দুঃখবাদী দার্শনিক কাকে বলা হয়।

৪) মোহিতলাল মজুমদারকে কী জাতীয় কবি বলা হয়?

৫) কোন দুই কাব্যগ্রন্থে মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা থেকে সরে এলেন?

৩.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৫ম খণ্ড)— সুকুমার সেন।

২) বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত— অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩) বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস— ক্ষেত্র গুপ্ত।

৪) সাহিত্যবিতান— মোহিতলাল মজুমদার।

একক-৪ ❑ কাজী নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাশ

গঠন

৪.১. উদ্দেশ্য
৪.২ প্রস্তাবনা
৪.৩ কাজী নজরুল ইসলাম
৪.৪ জীবনানন্দ দাশ
৪.৫ সারাংশ
৪.৬ অনুশীলনী
৪.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে শিক্ষার্থী জানতে পারবেন— বিদ্রোহী কবি নজরুলের স্বরূপ। নজরুলের স্বাদেশিক মনোভাব, জাতি সম্প্রদায়হীন নিবিড় মানবিক ঐক্য, প্রেম-প্রকৃতির প্রতি আবেগ, তাঁর মনে জেগে ওঠা ভক্তিভাব। কবিতার মাধ্যমে কীভাবে পাঠককে স্বাধীনতার মন্ত্রে উৎসাহিত করা যায়, পরাধীন ভারতে এটা ছিল তাঁর লক্ষ্য। জীবনানন্দ দাশ আধুনিক কবিদের অগ্রজ। তাঁর কবিতায় যে নতুন কাব্যধারা তৈরি হয়েছে, তা অনেকে অনুসরণ করেছেন। কবিতায় মৃত্যু, ইতিহাস, নির্জনতা, আত্মমগ্নতা, রূপসী বাংলার রূপ, প্রেম-প্রকৃতি, দেশপ্রাণতা যেভাবে ধরা পড়েছে তা শিক্ষার্থীদের জানানো এই এককের উদ্দেশ্য।

৪.২ প্রস্তাবনা

বিদ্রোহের হুঙ্কারে কাব্য জীবনের পরিসমাপ্তি নয়, তাঁর কবিতায় তৈরি হয়েছিল এক গতিবেগ। দেশ ও কালের সঙ্গে ছিল নজরুলের কবিতার সম্পর্ক। ফলে তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে ক্ষণিকের উত্তেজনা, সমকালের প্রভাব। এর ফলে তাঁর কাব্য কবিতা কালক্রমে খানিকটা নিষ্প্রভ হয়েছে। তবে কবিতায় তিনি বিদেশি সরকারের রক্ত চক্ষুকে অবহেলা করায় জন-মানসে উৎসাহ উদ্দীপনা সঞ্চারে সমর্থ হয়েছিলেন। নজরুল পরবর্তী জীবনানন্দে নতুনতর আধুনিকতার সূত্রপাত।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার প্রারম্ভ-লগ্ন সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত সম্ভব হয়নি। যে-কোনো সাহিত্যধারার বিবর্তনে চিন্তা-চেতনার দিক পরিবর্তনের নির্দিষ্ট সময় স্থিরভাবে নির্দেশ করা যায় না। তবু সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তন, চলমান জীবনধারার গতি পরিবর্তন, বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদে আস্থা কিংবা বিদ্রোহ, যুদ্ধ ইত্যাদি প্রবল বিপর্যয়ে কবি-শিল্পী সাহিত্যিকদের মানস পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে। এদেশের সমালোচকদের অনেকেই আধুনিকতার ভিত্তি সময় নির্দেশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর মানস পরিবর্তনের দিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। এ সময়ের সামাজিক অবক্ষয় এবং জীবনযন্ত্রণা-মথিত তীব্র হাহাকার জাতীয় সম্পদের এককেন্দ্রীয়ন এবং অন্যদিকে

সমাজতন্ত্রের সামুদ্রিক বাতাস, এই দুয়ের অভিঘাত, গ্রহণ-বর্জনের দ্বন্দ্ব এদেশের মানুষের আবহমান সঞ্চিত প্রত্যয়ে তীব্র আঘাত হানলো। কবি-সাহিত্যিকদের সংবেদনশীল মনে এর প্রভাব পড়ল। এই জীবন দর্পণে প্রতিফলিত হল সমকালীন মনন। এই ক্রান্তি লগ্নে বড়ো হয়ে উঠল সংশয় এবং জিজ্ঞাসা। সেটা কবিতার বিষয়ে এবং আঙ্গিকে স্বাভাবিক ভাবেই প্রভাব ফেলল। একদিকে ভাবগত ঐক্য এবং প্রকাশগত অনৈক্য, অনাসিকে প্রকাশগত ঐক্য এবং ভাবগত অনৈক্য বিশেষ রীতি হিসাবে স্বীকৃত হল।

সমালোচকেরা এবং বিশেষজ্ঞারা আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা নির্দেশে অনেক ক্ষেত্রেই সহমত হতে পারেননি। তবু কয়েকটি বিশিষ্ট সংজ্ঞাকে সাধারণভাবে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে।

১। বুদ্ধদেব বসুর ''**** মতে একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের ক্লান্তির, সন্ধানের আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি।'' তিনি আরও বলেছেন— ''এই কবিতা নতুন সুর এনেছে আমাদের কাব্যে, **** রবীন্দ্রনাথের পরে প্রথম নতুন সুর।''

২। জীবনানন্দ দাশের মতে— ''বাংলা কাব্যে বা কোন দেশেরই বিশিষ্ট কাব্যে আধুনিকতা শুধু আজকের কবিতায় আছে অন্যত্র নয়একথা ঠিক নয়। **** এখনকার বাংলা কাব্যে যে কালের জিজ্ঞাসাযুক্ত কবিতা নেই তা নয়, কিন্তু মোটামুটি এসব কবিতা একালে লেখা হয়েছে বলেই এগুলোকে আধুনিক কবিতা বলা হয়।''

৩। আবু সয়িদ আইয়ুবের চিন্তায়— ''কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত, অন্তত মুক্তি-প্রয়াসী কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করি।''

এই সূত্রেই নির্জনতার কবি জীবনানন্দের জীবনে যে অন্ধকার নেমে আসে কিংবা যে অবসাদ দেখা দেয় সেই বেদনাবোধ তিনি ব্যক্ত করেছেন কবিতায়।

৪.৩ কাজী নজরুল ইসলাম

বাংলা কাব্য ভুবনে নজরুলের আবির্ভাব নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ধূমকেতুর অগ্নিক্ষরা বিস্ময় নিয়ে কবিতার জগতে তাঁর প্রবল পদসঞ্চার। রবীন্দ্র প্রতিভা তখন মধ্যগগণে মধ্যাহ্নের প্রবল দীপ্তিতে ভাস্বর। রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর রোমান্টিক ভাবনায় বাংলা কাব্যজগৎ মোহাবিষ্ট, সেই লগ্নে মহাকবির প্রতিস্পর্ধী ভাবনায় দীপ্ত উচ্চকণ্ঠ নজরুল বাংলা কবিতায় নিয়ে এলেন একেবারে নতুন সুর।

আসানসোলের নিকটবর্তী চুরুলিয়া গ্রামে ২৪ মে ১৮৯৯ খ্রিঃ নজরুলের জন্ম। পিতা কাজী ফকির আহমদ। মাতা স্বদ্দ জাহেদা খাতুন। নজরুল পিতার দ্বিতীয় পত্নীর পুত্র। নজরুলের ডাক নাম দুখু মিঞা। আবাল্য দারিদ্র্য তাঁর সঙ্গী। মাত্র আট বছর বয়সে নজরুল পিতৃহারা হন। নজরুলের পিতা ছিলেন নিজের ধর্মে নিষ্ঠাবান, অন্যধর্মে শ্রদ্ধাশীল। উত্তরাধিকার সূত্রে নজরুল অসাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি ও ঔদার্য পেয়েছিলেন। বাংলা ও ফারসি কাব্যের অনুরাগও তাঁর উত্তরাধিকার অর্জন। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে জীবনযন্ত্রণার কন্টকাকীর্ণ দুঃসহ পরিমণ্ডলে ছেলেবেলা থেকেই নজরুলকে ব্যয় করতে হয়েছে অনেক শ্রম-ঘাম-রক্ত। দুরন্ত চঞ্চল প্রাণবন্ত নজরুলের ছিল প্রখর বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে জীবনের পারিপার্শ্বিকে ছড়িয়ে থাকা বিষয় থেকে জীবনের পাঠ গ্রহণে তিনি অনেক বেশি আন্তরিক ছিলেন।

নজরুলের কবি প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল দুর্নিবার দারিদ্র্য তথা গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজনের পথ ধরে। দারিদ্র্যই

ছিল তাঁর জীবন সংগ্রামের প্রেরণা। তাঁর প্রতিভা বিকাশের সিংহদুয়ার। অপরিণত বয়সেই তাঁকে ধরতে হয়েছিল সংসারের হাল। জীবনের প্রয়োজনে বিভিন্ন জীবিকার পথে তাঁর চারণা। এই পথেই নজরুলের অন্তঃস্থিত সুপ্ত কবি-প্রতিভার উন্মেষ এবং বিকাশ। তাঁর সংবেদনশীল মনে ছায়া ফেলেছিল গ্রামীণ সংস্কৃতির বহুমুখি বর্ণময়তার আধার লোটোগান। বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই তাঁর প্রবেশ লোটোগানের অচেনা জগতে। একজন নবীন কবিকে প্রয়োজনের হাত ধরে অপরিণত বয়সেই দাঁড়াতে হয়েছিল পারফর্ম করার মঞ্চে।

সে সময় গ্রামবাংলার লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল লোটোগন। নাচ-গান, রঙ্গ-রসিকতা, সাওয়াল-জবাব এসবের মিলনে লোটোগান এক বিচিত্র বর্ণময় উপস্থাপন মাধ্যম। অদম্য প্রয়াস নিষ্ঠায় নজরুল অচিরেই এই গানের দলের মধ্যমণিরূপে প্রতিষ্ঠা পেলেন। কিন্তু অস্থিরমতি কবি কোন অজ্ঞাত কারণে, দুর্নিবার কোন আকর্ষণে প্রতিষ্ঠিত উজ্জ্বল নজরুল লোটোগানের ভালোবাসার ভুবন থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর কর্মময় শ্রমিক জীবনের প্রথম পর্বের রুক্ষ কঠিন পথ শেষ হল ১৯১৫ সালে যোলো বছর বয়সে, শিয়ারশোল স্কুলে ভর্তি হবার অব্যবহিত আগে। নিতান্ত শৈশবটুকু বাদ দিলে পরবর্তী দীর্ঘ আট দশ বছর নিদারুণ দারিদ্র্য অভাব অনটন আর অসহায়তার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে নজরুলের কৈশোর যাপনের দুঃসহ ইতিহাস। শিয়ারশোল স্কুলে তিনি ভর্তি হন অষ্টম শ্রেণিতে। এর আগে নজরুল আরও একবার লোটোগানের দল ছেড়ে বর্ধমানের মাথরুন হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলেন ১৯১১ খ্রিঃ। সেখানে তিনি কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিককে শিক্ষকরূপে পেয়েছিলেন। রাণীগঞ্জ শিয়ারশোল স্কুলের পড়ার সময় রাণীগঞ্জ হাইস্কুলে ছাত্র শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। পরবর্তী সময় শৈলজানন্দ খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। শুরু হয়েছিল দু-জনের নিভৃত সাহিত্য-সাধনা। তখন নজরুল লিখতেন গল্প আর শৈলজানন্দ কবিতা। জীবনের প্রতিষ্ঠাভূমিতে দু-জনের সাহিত্য চর্চার কক্ষ পরিবর্তন ঘটে। স্কুলের প্রি-টেস্ট পরীক্ষা দিয়েছিলেন নজরুল। শেষ পরীক্ষা আর দেওয়া হয়নি। বোহেমিয়ান কবি স্কুল থেকে পালিয়ে নাম লেখালেন ৪৯ নং বাঙালি রেজিমেন্টের সৈনিক রূপে। কবির পদসঞ্চার ঘটল আর এক নতুন ভুবনে।

১৯২০-র জানুয়ারিতে করাচি থেকে কোলকাতায় ফেরেন নজরুল। ওই বছর মার্চ মাসে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়ার পর তাঁর জীবন প্রবাহিত হয় অন্য ধারায়। ১৯২২-এর জানুয়ারিতে 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নজরুল পৌঁছোলেন জনপ্রিয়তার উত্তুঙ্গ শিখরে। অগ্নিক্ষরা শব্দবন্ধের মন্ত্রধ্বনিতে উচ্চকিত হয়ে উঠল বাংলার কাব্যভুবন। যেন বেজে উঠল যুদ্ধ দামামা। বিদ্রোহী কবি নজরুলের নবজন্ম হলো কলকাতার পটভূমিতে। আপোসহীন সংগ্রামই এই পর্বে তাঁর কবিতার মর্মবাণী। তাঁর রাজনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ক কবিতার কেন্দ্রশক্তি আবেগ ও উত্তাপ। তাঁর কবিতা অন্য জাতের, অন্য ভাবের। বিদ্রোহী কবির পরিচয়েই শতবর্ষব্যাপী আপামর বাঙালি পাঠকের কাছে তাঁর অম্লান পরিচিতি এবং প্রতিষ্ঠা। 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২৮ সালের ২২ পৌষ 'বিজলী' পত্রিকায়। প্রায় একই সময়ে কবিতাটি 'মোসেলম ভারত' পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল। কোন সময়ে কবিতাটি লেখা হয়েছিল এবং কোন পত্রিকার এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতা, মতান্তর এবং বিভ্রান্তি আছে। এ প্রসঙ্গে নজরুলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ স্বনামধন্য দুই ব্যক্তিত্বের কিছু মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা মুজাফর আহমদের লেখা। থেকে 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনা ও প্রকাশ সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হল—

'বিদ্রোহী' কবিতা লেখা হয়েছিল ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে বড়দিনের ছুটির সময় ৩/৪ সি, তালতলা লেনের ভাড়া বাড়িতে। আহমেদ সাহেব জানিয়েছেন— ''তালতলার একটি বাসায় নজরুল আমার সঙ্গে একঘরে থাকত। একদিন সারারাত আলো জ্বালিয়ে কবিতা লেখা চলল। সকালে বিছানায় শুয়ে আছি— নজরুল

কবিতাটি পড়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল, 'কমন লাগল।' কোনো কালেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ স্বভাব নয়, আমি বললুম 'কাগজে ছাপ।' কবিতাটির নাম না 'বিদ্রোহী'। একটু পরেই আফজান -উল-হক এল। কিন্তু 'মোসলেম ভারত-এ প্রকাশ অনিয়মিত দেখে নজরুল পরে 'বিজলী'র ম্যানেজারকে কবিতাটি দিলেন। কবিতাটি এত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল যে সে মাসে দুইবার ছাপতে হয়েছিল।'

এ সম্পর্কে নজরুলের প্রিয়বন্ধু নলিনীকান্ত সরকার জানিয়েছেন :

'বিদ্রোহী'র রচনাকাল ১৩২৮ সালে পৌষ মাসের প্রথমার্ধে। কিন্তু তথ্যাদেবী দেখবেন 'বিদ্রোহী'র প্রথম প্রকাশ ১৩২৮ সালের কার্তিক সংখ্যা 'মোসলেম ভারত'-এ তিনি ভেবে বসবেন, তাহলে বিদ্রোহী ১৩২৮ সালের কার্তিক মাসের আগের রচনা। ব্যাপারটা এই যে, সে সময় 'মোসলেম ভারত' নিয়মিত প্রতি মাসে বেরতো না। এই কার্তিক সংখ্যাটি বেরিয়েছিল পৌষ মাসের শেষের দিকে। আর মাঘ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে অংশ বিশেষ বর্জিত হয়ে 'বিদ্রোহী' উদ্ধৃত হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশে বিশেষ করে কলকাতার পাঠক-পাঠিকারা ''বিদ্রোহী''র প্রথম সাক্ষাৎ পেল 'বিজলী'তে। ১৩২৮ সালে। ২২ পৌষের 'বিজলী'তে 'বিদ্রোহী'র প্রথম প্রকাশ।

বিদ্রোহী কবিতার প্রকাশ সম্পর্কে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেনে 'বিজলী' এবং 'মোসলেম ভারত' দুটো পত্রিকাতে 'বিদ্রোহী'' একযোগে প্রকাশিত হয়। 'বিজলী'র সঙ্গে যুক্ত অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য জানিয়েছেন — ''কবিতাটি 'বিজলী'তে দিন পনেরো আগে বের হয়, মোসলেম ভারত এ পরে।'' এ কবিতা পাঠের প্রতিক্রিয়ায় বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন 'বিদ্রোহী' পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিক পত্রে, মনে হল — এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগের অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মন প্রাণ যা কামনা এযেন দেশব্যাপী উদ্দীপনার এই যেন বাণী।' এই কবিতা প্রসঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন— ''কাব্য বিচারে 'বিদ্রোহী'র মূল্য সকলের কাছে সমান না হতে পারে, কিন্তু তদানীন্তন যুগ-মানস যে প্রথম এই কবিতার মধ্যেই প্রতিবিম্বিত এই কথা কেউ বোধহয় অস্বীকার করবেন না।' কবিতাটি 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়। 'অগ্নিবীণা'র প্রকাশ ১৯২২ সালে। কাব্যটির প্রকাশক ছিলেন কবি নজরুল নিজে। প্রকাশিত হয়েছিল ৭ নং প্রতাপ চ্যাটার্জী লেন থেকে। দাম- ১ টাকা। কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছিল অগ্নিযুগের আদি পুরোহিত বারীন্দ্র কুমার ঘোষকে।

'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের আগেই কবিরূপে বাঙালি পাঠকের কাছে নজরুল পরিচিত ছিলেন। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'শত-ইল-আরব', 'খেপারের তরণী', 'কোরবাণী', 'মোহররম' ইত্যাদি কবিতা।

এর পর ২৬ শ্রাবণ, ১৩২৯ (১১ আগস্ট ১৯২২) নজরুলের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'ধূমকেতু' পত্রিকা। 'ধূমকেতু'কে আশীর্বাদ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

''আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গ শিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন।''

ধূমকেতুর প্রতিটি সংখ্যায় ৮ ছত্রের এই আশীর্বাণীটি ছাপা হত। পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নজরুল জানিয়েছিলেন ''ধূমকেতু হবে আগুনের সম্মার্জনী''। পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা ছিল অপরিসীম। বিদ্রোহাত্মক প্রবন্ধ কবিতা ইত্যাদি প্রকাশের কারণে পত্রিকাটি ব্রিটিশ সরকারের বিরাগভাজন হয়েছিল। ২২ সেপ্টেম্বর ১৯২২, 'ধূমকেতু'র পূজা

সংখ্যায় প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা লেখার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে নজরুল অভিযুক্ত হন। ১৯২৩ সালের ২৩ জানুয়ারি তাকে এক বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। প্রেসিডেন্সি জেলে থাকার সময় রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুসারে তাঁর 'বসন্ত' নাটকটি বসন্ত উৎসবের দিন কারাগারে নজরুলকে পৌঁছে দেওয়া হয়। নাটকটি নজরুলকে উৎসর্গ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জেলে থাকাকালীন নজরুল লেখেন 'শিকল পরার গান', 'ভাঙার গান' প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতা। এ সময়ে তাঁর অধিকাংশ লেখা প্রকাশিত হত 'প্রবাসী' পত্রিকায়। ১৯২৩ খ্রিঃ ১৫ ডিসেম্বর তিনি কারামুক্ত হন।

কারামুক্ত হবার কিছুদিন পর ২৪ এপ্রিল ১৯২৪ নজরুল কুমিল্লার ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তর ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রমীলাকে বিয়ে করেন। ''প্রমীলার পিতার নাম বসন্তকুমার সেনগুপ্ত। এই পরিবার নজরুলের পূর্ব পরিচিত। এর পূর্বে বঙ্গীয় মুসলমান। সাহিত্য সমিতির অফিসে আলী আকবর খান নামে একজন সাহিত্যিকের সঙ্গে নজরুলের আলাপ হয়। তাঁর সঙ্গে নজরুল তাঁর দেশের বাড়ি দৌলতপুরে গিয়েছিলেন। সেখানে আকবর খানের ভাগিনেয়ী সৈয়দা খাতুনের সঙ্গে কবির বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়। বিয়ের পূর্ব মুহূর্তে বিয়ের আসর থেকে নজরুল চলে আসেন। বিয়ে ভেঙে যায়। এই ঘটনা নজরুলের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর কাব্য সৃষ্টিতেও যে এই ঘটনা প্রভাব ফেলেছিল একথা বিভিন্ন প্রসঙ্গে নজরুল উল্লেখ করেছেন। সৈয়দা খাতুনকে নজরুল নতুন নাম দিয়েছিলেন নার্গিস আসার খানম। পরবর্তী জীবনেও নার্গিসকে কবি ভুলতে পারেন নি।

নজরুলের দোলনচাঁপা (১৯২৩) বিষের বাঁশী (১৯২৪) ভাঙার গান (১৯২৪), ছায়ানট (১৯২৫) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পর নজরুল গড়ে তোলেন স্বরাজ পার্টি। এই পার্টির মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হল 'লাঙল' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। এর প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় নজরুলের বিখ্যাত কাব্য সমষ্টি 'সাম্যবাদী'। পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায় নজরুলের কবিতা ছিল বিশেষ আকর্ষণ। নজরুলের বিবাহোত্তর সংসার জীবনের প্রথম পর্ব কাটে হুগলিতে এবং পরে কবি সপরিবারে কৃষ্ণনগরে চলে আসেন। হুগলিতে থাকাকালীন তাঁর প্রথম সন্তান আজাদ কামালের জন্ম। এক বছরের মধ্যে সন্তানটির মৃত্যু ঘটে। ১৯২৬ সালের প্রথম দিকে কবি কৃষ্ণনগরে বসবাস শুরু করেন। সেখানে তাঁর পুত্রসন্তান অরিন্দম খালেদ (বুলবুল) এর জন্ম। এখানে কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য সুভাষচন্দ্র বসুর অনুরোধে নজরুল রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত দেশাত্মবোধক গান 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'। অনুষ্ঠানে নজরুল গানটি নিজে গেয়েছিলেন।

কৃষ্ণনগরে বসবাসকালেই বিদ্রোহী কবির সৃষ্টির নতুন অধ্যায় শুরু হল। সেখানে লেখা হল ব্যথার গান, প্রেমের গান। বাংলা গজল গানেরও সূত্রপাত হল। এরপর কবি ফিরে আসেন কোলকাতায়। মসজিদ বাড়ি স্ট্রীটের বাসায়। থাকাকালীন চার বছরের শিশুপুত্র বুলবুল মারা যায়। একদিকে প্রিয়পুত্রের মৃত্যু অন্যদিকে নিদারুণ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে অসহায় কবি আধ্যাত্মজগতে শান্তির সন্ধান করেন। শিক্ষক, শিক্ষাব্রতী, গৃহীযোগী বরদাচরণ মহাশয়ের সান্নিধ্যে অধ্যাত্ম ভাবনার জগতে শান্তি খুঁজে পান নজরুল। তাঁর সাধন সংগীতগুলি এ সময়ের রচনা। সাধকের নতুন পরিচয়ে উদ্ভাসিত হলেন বিদ্রোহী কবি।

বাংলা সাহিত্যে কবিরূপেই নজরুলের স্বীকৃতি এবং প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তাঁর মরমী হৃদয়ের পরিচয় রয়েছে সুবিস্তৃত গানের ভুবনে। অজস্র গান লিখেছেন কবি। এক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টি নিপুণতা তুলনাহীন। তাঁর গানের সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশি। একদিকে তাঁর কবিতায় বজ্রদীপ্ত ঘোষণা, অন্যদিকে গানের ভুবনে চির বিরহী চিত্রের বেদনা করুণ দীর্ঘশ্বাসে তাঁর সৃষ্টিপ্রতিভার অনন্য বৈচিত্র্যের অভিজ্ঞান। এমন বিস্ময়কর সৃষ্টি বৈচিত্র্য সম্ভবত শুধু নজরুলের প্রতিভাতেই সম্ভব।

১৯৪০ সালে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন কবি-স্ত্রী প্রমীলা। ১৯৪২-এ কবি নিজে দুরারোগ্য ব্যাধিতে তাঁর বাকশক্তি রুদ্ধ হয়। শান্ত হয় চির অশান্ত কবির লেখনী। নব গঠিত নজরুল নিরাময় সমিতির ব্যবস্থাপনায় ১৯৩৫ সালে কবিকে চিকিৎসার জন্য ইউরোপে পাঠানো হয়। সেখানেও তাঁর রোগ নিরাময় হয় না। ১৯৬২ সালের ৩০ জুন প্রমীলাদেবী পরলোক গমন করেন। ১৯৭২ সালের ২১ মে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে নজরুল রাজধানী ঢাকায় যান। তাঁকে শ্রদ্ধা সূচক বাংলাদেশের নাগরিকত্বের সম্মান প্রদান করা হয়। নজরুলকে বাংলাদেশেই রাখা হয়। ১৯৭৬ সালের ২০ আগস্ট ঢাকায় পোস্টগ্রাজুয়েট হাসপাতালে নজরুল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নজরুলের প্রথম কবিতা 'মুক্তি' প্রকাশিত হয় ''বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় ১৩২৬ বঙ্গাব্দে। তখন তিনি বাঙালি পল্টনের সৈনিক। কবির অন্যতম কাব্যগ্রন্থগুলি হল অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, সাম্যবাদী, সর্বহারা, ফণিমনসা, বাঁধনহারা, প্রলয় শিখা। এই কাব্যগুলি কবির বিদ্রোহবাণীতে উচ্চকিত। প্রতিবাদী কবির বজ্রকণ্ঠ শোনা গেছে এসব কাব্যের কবিতায়। অন্যদিকে প্রেমিক কবির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে দোলনচাঁপা, ছায়ানট, পূর্বের হাওয়া, সিন্ধু হিল্লোল, চক্রবাক প্রভৃতি কাব্যে।

'অগ্নিবীণা' নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থের 'বিদ্রোহী' কবিতার মাধ্যমে কবি নজরুল বাংলা কাব্য সংসারে তার দীপ্ত প্রতিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছেন। কাব্যের নামকরণে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সহজলক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের গীতালী কাব্যের ৫৫ সংখ্যক কবিতার শব্দবন্ধ থেকে সম্ভবত অগ্নিবীণা শব্দটি চয়ন করা হয়েছে। ওই কবিতায় আছে— ''অগ্নিবীণা বাজাও তুমি/কেমন করে।/আকাশ কাঁপে তারা আলোয় / গানের ঘোরে।" বিদ্রোহী কবিতার মর্মবাণী সম্পর্কে মতদ্বৈততা আছে। কবিতায় 'আমি' শব্দটি স্বরূপ সম্পর্কেও ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। বিভিন্ন বিরুদ্ধ মতের মধ্য থেকে একটা সত্য উঠে এসেছে, সেটা হল—'বিদ্রোহী' সম্পূর্ণ আত্মোপলব্ধির কবিতা। এই কবিতায় নজরুল নিজেকে ' চিনতে চেয়েছেন। কাজী আবদুল ওদুদ 'নজরুল ইসলাম' প্রবন্ধে 'বিদ্রোহী' কবিতার ভাব সম্পর্কে লিখেছেন— বিদ্রোহী কবিতায় কবি কি বলতে চেয়েছেন এ সম্বন্ধে নানা মত শুনতে পাওয়া যায়। কবির প্রায় ২৩ বৎসরের বিপুল সাহিত্য সাধনার উপর চোখ বুলিয়ে আমার মনে হয়েছে, 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকৃতই কোনো বিদ্রোহ-বাণীর বাহক নয়, এর মর্মকথা হচ্ছে এক অপূর্ব উন্মাদনাএক অভূতপূর্ব আত্মবোধসেই আত্মবোধের প্রচণ্ডতায় কবি উচ্চকিত প্রায় দিশাহারা। এর মনে যে ভাব সেটি এক সুপ্রাচীন তত্ত্ব, ভারতীয় 'সোহম', ' বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ', 'যত্র জীব তত্র শিব' প্রভৃতি বাণীতে তা ব্যক্ত হয়েছে। সুফীর 'আনলহক' বাণীতেও সে তত্ত্ব রয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগরূপ মহাবিদ্রোহও হয়তো এর মূলে রসদ জুগিয়েছিল।'

'বিদ্রোহী' কবিতার 'আমি'র স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সমালোচক ডঃ ক্ষেত্র গুপ্তর অভিমত বিশেষভাবে ভেবে দেখা যেতে পারে। তিনি এই কবিতার শব্দ ও বাক্যবন্ধ বিশ্লেষণ করে কবিতার 'ধ্রুব' শব্দ হিসেবে 'আমি'-কে চিহ্নিত করেছেন এবং নজরুল মননের আলোকে তার স্বরূপ উপস্থিত করেছেন। তিনি বলেছেন — ''কবিতার মোট ১৩৮ চরণের মধ্যে ১০১ টির শুরু 'আমি' দিয়ে। এর মধ্যে ১০০ বারই চরণের বার্তা অংশ থেকে 'আমি' শব্দটি একটু সরিয়ে রাখা, যাতে পড়তে বা চোখের দেখার সময়েও পৃথক একটু জোর আসে। এছাড়াও 'আমি' আছে ৪৫ বার, 'মম' 'আপনার' (নিজের অর্থে) 'আমার' প্রভৃতি আমি শব্দের রকমফের ১৫ বার। কবিতায় প্রবেশে এবং কবিতার সম্ভোগে এটি একটি চাবিকাঠি। এরূপ ব্যবহারের ফলেই একটা দর্পিত আত্মবোধ প্রকাশ পেয়েছে যা উচ্চকণ্ঠ উত্তেজনায় মহাকাব্যের বীরদের রণক্ষেত্রে উচ্চারিত আত্মস্তুতির সমতুল্য। কবিতার মূল ভাব কল্পনা এই ভাবে 'আমি' শব্দের পুনরাবৃত্তিতে অনেকখানিই সার্থকভাবে ধরা পড়েছে। কবির এই 'আমি' অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের অন্তর্যামী—জীবনদেবতার মতো কিছু নয়। মোহিতলালের আমি প্রবন্ধের দ্বারা এই কল্পনা প্রভাবিত—

এমন দাবি গ্রাহ্য নয়। কারণ সে প্রবন্ধে আধুনিকন ডিভিজুয়ালইজমের তত্ত্বের সঙ্গে বৈদান্তিক 'সোহ্‌ম' বাদের মিশ্ররূপ প্রকাশ পেয়েছে। নজরুলের যে অসংযত উত্তেজনা তথা প্রলয়শক্তির আমন্ত্রণ তার জাত পৃথক। এমন কি 'আমার কৈফিয়ৎ'-এর লৌকিক ও ব্যক্তিগত নজরুলের 'আমি' নয় এই আমি। বরং ''দারিদ্র্যের শিল্পী-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এর আংশিক সাদৃশ্য আছে। আসলে কবির মধ্যে বরাবর অন্তশ্চেতনাশ্রয়ী ছিল এই আমি। নানা লেখাতে তার বিমিশ্র পরোক্ষ বর্ণাঢ্য প্রতিফলন অবশ্যই মিলবে। কিন্তু উলঙ্গ ঔদ্ধত্য এখানেই 'পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।'

'বিদ্রোহী' কবিতার অন্তর সত্য উন্মোচনে আর একটা দিকের প্রতি আলোকপাত করা যায়। নজরুল 'দৈনিক নবযুগ'' পত্রিকায় 'আমার সুন্দর' নামে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'বিদ্রোহী' কবিতা লেখার অনেক পরের লেখা এই প্রবন্ধেও কবির আত্মোপলব্ধির, আত্মপ্রেরণার সুর শোনা যায়। সে সুর যদিও কিছুটা ভিন্ন, 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রেরণার সঙ্গে এর সম্পর্কও দূরাগত তবুও প্রাসঙ্গিক বলে ভাবতে অসুবিধে নেই। নজরুল নিজের সৃষ্টি-প্রেরণার মূলে এক পরমবন্ধুর অস্তিত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। একে তিনি আমার সুন্দর'' অভিধায় বিশেষিত করছেন। কবি নিজের জীবনের 'আনন্দ বেদনা', 'সাফল্য-দুর্ভাগ্যের' পেছনেও এর 'অকম্পিত স্থিতি' অনুভব করেছেন। এই সুন্দরের প্রেরণাতেই কবিচিত্ত কোরাণ— বেদান্তের পথ ধরে উর্ধ্বায়িত হয়েছে। সেকথা বলতে গিয়ে কবি বলেছেন— 'গোপনে পড়তে লাগলাম বেদান্ত, কোরাণ। আমার পৃথিবীর আকাশ যেন কোন বজ্রনাদ ও তড়িৎ লেখার তলোয়ারে বিদীর্ণ হয়ে গেল। আমি যেন আরও উর্ধ্বে যেতে লাগলাম। দূর হতে দেখতে পেলাম অপরূপ স্বর্ণসুন্দর জ্যোতিঃ। এই আমার স্বর্ণজ্যোতিঃ সুন্দরকে প্রথম দেখলাম।'' এর পাশাপাশি কবি আরও বলেছেন, অন্যদিকে এক করাল ভয়ংকর শক্তি তাকে আকর্ষণ করেছে নীচের দিকে। কবিকে ফিরে আসতে হয়েছে 'মাটির পৃথিবীর বুকে'। পৃথিবীকে ভালোবেসে— নিসর্গ সৌন্দর্য্যকে হৃদয়ে জড়িয়ে কবি বললেন ''এই আমি প্রথম পুষ্পিত সুন্দরকে দেখলাম। এইরূপে চাদের আলো, সকাল সন্ধ্যার অরুণকিরণ, ঘনশ্যাম সুন্দর বনানী, তরঙ্গ হিল্লোলিত ঝর্ণা, তটিনী, কুলহারা নীলঘন সাগর, দশদিকবিহারী সমীরণ আমায় জড়িয়ে ধরল, আমার সাথে মধুর ভাষায় বন্ধুর মত সখার মত কথা কইল।' পৃথিবীকে ভালোবেসে, মানুষের শোষণ পীড়নের বিরুদ্ধে অস্ত্র দাবি করলেন কবি। বললেন— ''তবে দাও বন্ধু, দাও আমায় দুধারী তলোয়ার, দাও আমায় তোমার বিপ্লবের বিষাণ-শিঙা, দাও আমায় অসুর সংহারী ত্রিশূল ডমরুধ্বনি। দাও আমায় ঝঞ্জা জটিল জটা, দাও আমায় বাংলার সুন্দর বনের বাঘাস্বর, দাও ললাটে প্রদীপ্ত বহ্নিশিখা, দাও আমায় জটাজুটে শিশুশশীর স্নিগ্ধ হাসি, দাও আমায় তৃতীয় নয়ন, সেই তৃতীয় নয়নে অসুর দানব সংহারীশক্তি।'' এই আবেগ উচ্ছ্বসিত ভাষায় সুন্দরের স্বরূপ ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে কবি নিজেকে খুঁজেছেন, আমিকে খুঁজেছেন। কবির সৌন্দর্য তত্ত্বের সঙ্গে মিলেছে তাঁর শিল্পী ব্যক্তিত্ব। ''বিদ্রোহী'' কবিতা নজরুলের আত্মোপলব্ধির পাশাপাশি আত্মপ্রতিষ্ঠা আত্মজয়ের ধ্বনিতে মুখর। 'বিদ্রোহী' কবিতার মূল শক্তি আত্ম জয়, আত্ম প্রতিষ্ঠার দুর্বার উচ্চারণ। শুধু 'বিদ্রোহী' কবিতা কেন, তাঁর আত্ম ঘোষণা মূলক সব কবিতারই এটা কেন্দ্রীয় সুর। বলা যায় ধ্রুববাণী। এই কবিতা নজরুলের উদাত্ত ব্যক্তিত্বের জয় পতাকা। এ যেন আত্ম প্রেমিকের মায়া দর্পণ; নার্সিসাসের বিমুগ্ধ আত্ম দর্শন।

সৃষ্টির উত্তর পর্বে নজরুলের হৃদয়ের অগ্নিবীণা বেজেছে ব্যথা ভরা বিষণ্ণ রাগিনীতে। তিনি চোখের জলে লিখে গেছেন বেদনার গান। অজস্র বেদনার ভার বুকে নিয়ে নিরুদ্ধ বেদনায় নিরন্তর সৃষ্টির ফুল ফুটিয়েছেন কবি নজরুল।

নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা'র প্রকাশ ১৯২২ খ্রিঃ। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'দোলনচাঁপা' প্রকাশিত হয় ১৯২৩ খ্রিঃ। কবিপত্নী প্রমীলার ডাকনাম ছিল দুলী বা দোলন। দোলনকে গভীরভাবে ভালোবেসে ছিলেন নজরুল। সেই ভালোবাসা অমর হয়েছে 'দোলনচাপা' কাব্যের শীর্ষনামে। এই কাব্যে বেশ কয়েকটি প্রেম ভাবনা বিষয়ক কবিতা

আছে। কাব্যের মূল সুর প্রেম। এরপর ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ‘বিষের বাঁশী’ নজরুলের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। নজরুলের ভাবনায় ‘‘অগ্নিবীণা”র দ্বিতীয় খণ্ডের যে পরিকল্পনা ছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে যে কবিতাগুলি তিনি লিখেছিলেন সেগুলিই সংকলিত হয়েছে। ‘বিষের বাঁশী’তে। এই কাব্য সম্পর্কে নজরুল জানিয়েছেন ...... বিষের বাঁশী”র বিষ যুগিয়েছেন আমার নিপীড়িতা দেশ-মাতা, আর আমার ওপর বিধাতার সকল রকমের আঘাত।”

নজরুলের চতুর্থ কাব্য ‘ভাঙার গান’ প্রকাশিত হয় ১৯২৪ খ্রিঃ। এই কাব্যের কবিতাগুলিতে নজরুলের প্রতিবাদী মনের ভাবনারই প্রকাশ ঘটেছে। বইয়ের প্রথম কবিতা ‘ভাঙার গান’-এর নামানুসারে কাব্যের শীর্ষনাম নির্দিষ্ট হয়েছে। ‘ছায়ানট’ কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৯২৫ খ্রিঃ। এখানে আবার শোনা গেল ভালোবাসার বাঁশীর সুর। ‘দোলনচাঁপা’ কাব্যের কয়েকটি কবিতাও এই কাব্যে সঙ্কলিত হয়েছে। ‘পূর্বের হাওয়া’ কাব্যটিও প্রকাশিত হয়েছে এই বছরেই (১৯২৫ খ্রিঃ)। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের লোকান্তরে ব্যথিত কবির বেদনাবিদ্ধ শ্রদ্ধাগুলি নিবেদিত হয়েছে ‘চিত্তনামা’ কাব্যে। স্বদেশপ্রাণ দেশবন্ধুর প্রতি নজরুলের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার স্মারক হিসাবে গ্রন্থটির স্বতন্ত্র মূল্য আছে। কাব্যটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৫-এর জুন মাসে। এরপর ১৯২৬-এ প্রকাশিত হয় ‘সর্বহারা’। এতে সঙ্কলিত হয়েছে ‘সাম্যবাদী’ ভাবনার কবিতাগুলি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও দশটি কবিতা। নজরুলের সাম্যবাদী ভাবনা কোনো তাত্ত্বিক আদর্শ ভাবনাশ্রয়ী নয়। সুগভীর এবং অকৃত্রিম মানবতাবাদী ভাবনাই তাঁর সাম্যবাদী চেতনার উৎস। ‘ফণিমনসা’ কাব্যের প্রকাশ ১৯২৭-এ। বিখ্যাত ‘সব্যসাচী’ কবিতা এই কাব্যে সঙ্কলিত। সমকালের জাতি বৈষম্যমূলক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কবিমনে যে কত গভীর প্রভাব ফেলেছিল এবং কবিকে কতটা বিচলিত করেছিল তার পরিচয় রয়েছে এই কাব্যের ‘হিন্দু-মুসলমান যুদ্ধ’ কবিতায়। ১৯২৭-এ প্রকাশিত হয় ‘সিন্ধুহিল্লোল’ কাব্য। এটি মূলত প্রেমভাবনার কাব্য। ‘চক্রবাক” (১৯২৮) কাব্যে প্রেম ও প্রকৃতি ভাবনার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। নজরুলের চট্টগ্রাম ভ্রমণের স্মৃতির ছায়া এর অনেকগুলি কবিতায় পড়েছে। প্রেম ও বিরহের রাগিনী এখানে তুলে ধরেছে নজরুলের অন্যসত্তার পরিচয়। কবির পরবর্তী কাব্যগুলির মধ্যে উল্লেখনীয় হল ‘সন্ধ্যা’, ‘প্রলয় শিখা’, ‘ঝড়’ ইত্যাদি।

বিদ্রোহের রৌদ্ররস আর প্রেম ভাবনার মধুররস নজরুলের কবি মানসে এই দুই ভাবনার কক্ষ পরিবর্তন চলেছে চক্রাকারে। এই মানস ভাবনা বিবর্তনের অভিজ্ঞান তাঁর কাব্যগুলি।

৪.৪ জীবনানন্দ দাশ

রবীন্দ্রনাথ আস্তিক্যবোধের কবি। তাঁর কবিতায় পূর্বাপর সুগভীর প্রত্যয়ের সুর শোনা গেছে। এ প্রত্যয় কবির জীবনবোধেরই উচ্চারণ। জগতে শোক-বেদনা-আঘাতের মধ্যেও আনন্দের আশীর্বাদ আছে। এ ভাবনার উৎস উপনিষদের আনন্দ ভাবনার মধ্যে নিহিত। সাময়িক দুঃখ-বেদনা-যন্ত্রণার আঘাত কবিকে তাঁর গভীর প্রত্যয় থেকে সরাতে পারেনি।

অন্যদিকে ইউরোপে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, ফ্রয়েডের অবচেতন মনের ব্যাখ্যার পথ ধরে প্রচলিত ভাবনায় দেখা গেল বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এর পাশাপাশি ফরাসি কবি বোদলেয়ারের হাতে সূচিত হল প্রতীকী কাব্য ভাবনার। তাঁর সুযোগ্য অনুগামীদের হাতে এই ধারা পুষ্টি লাভ করলো। প্রতীকী ধারা রোমান্টিক ধারার সম্প্রসারিত রূপ। প্রতীকীবাদী বোদলেয়ারের ভাবনায়, সৃষ্টির সমস্ত বস্তুই অখণ্ড, অবিচ্ছেদ্য পারম্পর্যে বাধা তাই বাস্তবতা ও আধ্যাত্মিকতা, আলো ও অন্ধকার, শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ সবই এক ঐক্যসূত্রে গাঁথা। এই অনুভূতির সঙ্গে মিশেছে বেদনা ও হতাশা। এবং অনিবার্যভাবেই মৃত্যু চেতনা প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রতীকী কবিরা প্রাচীন জীবনের অভিজ্ঞতাকে,

সংস্কারকে বর্জন করে নতুন পৃথিবীতে প্রবেশ করতে চেয়েছেন। অস্পষ্ট শব্দের সঙ্গে অর্থবাহী সুস্পষ্ট শব্দ মিলিয়ে তাঁরা কাব্যের সৌন্দর্য প্রকাশে আন্তরিক হলেন। কবির হৃদয় থেকে যে সংগীতময় ধ্বনি উচ্চারিত হবে, তার লক্ষ্য অন্য পৃথিবী, অন্য আকাশ, অন্য প্রেমিকা।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার প্রধানতম কবি জীবনানন্দ দাশের কবি-মননে ফরাসি প্রতীকী কবিদের প্রভাব সুগভীর। তাঁর কবিতায় দেখা গেছে বাস্তবাতীত বাস্তবের পরিচয়, মৃত্যু চেতনা, সংগীত ও চিত্রের সমন্বয়ে চিত্রময়তা। বিদেশি কাব্যধারায় প্রভাবিত হলেও শেষ পর্যন্ত এসব ভাবনা কবি জীবনানন্দের কবিতায় তাঁর একান্ত নিজস্ব ভাবনা বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। সহজাত প্রতিভায় এগুলি তিনি আত্মস্থ করেছিলেন। তাঁর কবিসত্তা থেকে এগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। নিজের কাব্যধর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জীবনানন্দ বলেছেন — ''আমরা এক নতুন প্রদেশে প্রবেশ করেছি। পৃথিবীর সমস্ত জল ছেড়ে দিয়ে যদি এক নতুন জলের কল্পনা করা যায় কিম্বা পৃথিবীর সমস্ত দীপ ছেড়ে এক নতুন প্রদীপের কল্পনা করা যায় তাহলে পৃথিবীর এই দিন রাত্রি, মানুষ ও তার আকাঙ্ক্ষা এবং সৃষ্টির সমস্ত ধুলো, সমস্ত কঙ্কাল ও সমস্ত নক্ষত্রকে ছেড়ে দিয়ে এক নতুন ব্যবহারের কল্পনা করা যেতে পারে। যা কাব্য।'' (কবিতার কথা)। জীবনানন্দের এই কাব্য ভাবনায় কাব্যের যে বৈশিষ্ট্য উঠে এসেছে তা হল, এই কাব্য জীবন-বিচ্ছিন্ন নয় বরং জীবনের এক নতুনতর প্রকাশ। এই কাব্য শুধু বস্তু ও সুরের সমাহার নয় এখানে একাত্ম থাকবে কবির কল্পনা ও মনীষা।

জীবনানন্দ রবীন্দ্রোত্তর কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি রবীন্দ্রোত্তর কাব্যধারার পথ-প্রদর্শকও। কবির জন্ম ১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি, বরিশাল জেলা শহরে। পিতা সত্যানন্দ দাশগুপ্ত, মা কুসুমকুমারী দেবী। সত্যানন্দ দাশগুপ্ত ছিলেন বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের শিক্ষক। মা মহিলা কবি হিসাবে সমকালে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি সুগায়িকাও ছিলেন। জীবনানন্দের সাহিত্য পাঠের সূত্রপাত পিতার সান্নিধ্যে। প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি অনার্সের ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর কবিতা রচনার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ পাশ করেন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে। এরপর 'বঙ্গবাণী', 'প্রগতি', 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা মুদ্রিত হতে থাকে। ১৯২৫ সাল থেকে কবি 'কল্লোল' ও 'কালি কলম'-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন।

জীবনানন্দের প্রথম কাব্য 'ঝরা পালক' প্রকাশিত হয় ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে। এরপর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬), 'বনলতা সেন' (১৯৪২), 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪), 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮), বর্ধিত আকারে 'বনলতা সেন' (১৯৫২) এবং জীবনানন্দ দাশের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৫৫)। কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 'রূপসী বাংলা' এবং 'বেলা অবেলা কালবেলা'। এছাড়া প্রায় শতাধিক কবিতা যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি, গবেষকরা তা সন্ধান করে উদ্ধার করেছেন এবং গ্রন্থবদ্ধ করেছেন।

বাংলা কাব্যের ইতিহাসে জীবনানন্দের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশায়ী প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা প্রথম শুরু করেছিলেন মোহিতলাল এবং যতীন্দ্রনাথ। পরবর্তী সময়ে বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্ররা সেই প্রচেষ্টা আরও কিছুটা এগিয়ে দিয়েছিলেন। বিশ শতকের তিনের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা কাব্যের যুগান্তর কোনো ভাবেই সম্ভব হয়নি। জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক'-এর প্রকাশ ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে। সেখানে রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্তির কোনো চিহ্নই নেই। হয়ত বা কিছুটা বাসনা অঙ্কুরিত হয়েছিল। তাঁর দ্বিতীয় কাব্য 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশিত হয় ১৯৩৬-এ। এখানে জীবনানন্দ স্বাতন্ত্র্যে দীপ্ত। তিনি খুঁজে পেয়েছেন কাব্যের নতুন ভুবন। যে কাব্যভুবনে স্বতন্ত্রভাবে নিজের তৈরি করা পথে এগিয়েছেন কবি। তাঁর কবিপ্রতিভার স্বরূপ নির্ণয়

প্রসঙ্গে ড. ক্ষেত্র গুপ্ত ''বাংলা সাহিত্যের সমগ্র 'ইতিহাস'-এ লিখেছেন— ''জীবনানন্দের কবিতায় জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি, প্রকৃতির প্রতি একই সঙ্গে প্রেম ও ঘৃণা ও অবহেলা সমানভাবে খেলা করে। বাইরে পেলব কবি তীক্ষ্ণ উত্তেজনায় ভিতরে ভিতরে বিস্ফোরিত। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের কোমলতা তারল্য স্নিগ্ধতায় অবগাহন করেও তাঁর কবিতা অশান্ত ক্লান্তিতে বলে—

কোন এক বিপন্ন বিস্ময়

আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে

আমাদের ক্লান্ত করে, ক্লান্ত ক্লান্ত করে।

লাশকাটা ঘরে সেই ক্লান্তি নাই— (আট বছর আগের একদিন)

একদিকে আত্মহননের তীব্র আগ্রহ অন্যদিকে বাঁচার জন্য আর-একটি প্রভাতের ইশারায় জেগে ওঠার জন্য 'অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগ' পাবার বাসনা। প্রবল নৈরাশ্য, প্রেমিকা নায়িকা বনলতা সেন বা শঙ্খমালা বা সুচেতনার মধ্যে আপনার মৃত্যু-নিয়তি অনুভব জীবনানন্দকে দিয়েছে অসাধারণত্ব।''

জীবনানন্দ কখনও অজস্র রঙের কবি, তিনি আবার কখনও বর্ণহীন অন্ধকারে ইন্দ্রিয় উপভোগের উষ্ণতায় মগ্ন, কখনও মৃত্যুর অতলে ডুব দিয়ে নব জন্মের স্বপ্ন দেখেন, আবার কখনও মিশর ব্যাবিলনের পুরোনো পৃথিবীর বিলীন ঐতিহ্য অনুসন্ধানের অভিযাত্রী হন, আবার জীবনের সফেন সমুদ্রযাত্রী হয়ে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর নির্জন শান্তির আশ্রয় খোঁজেন। তিনি আবার নিসর্গের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বাংলার প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ আস্বাদন করেন। জনারণ্যেও নিঃসঙ্গতার বেদনায় ক্লান্ত হন। অসংখ্য উত্তরহীন সমস্যা, সমাধান-হীন বর্তমান কবিকে অবিরাম পীড়িত করে। সুর-রিয়ালিস্ট বা পরাবাস্তববাদী ভাবনা, ইতিহাস সচেতনতা এবং অতীত পৃথিবীর প্রতি সুনিবিড় মমত্ববোধ জীবনানন্দের কবিতাকে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে।

জীবনানন্দের কাব্য সম্পর্কে ড. দীপ্তি ত্রিপাঠী 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়' গ্রন্থে বলেছেন— ''পৌষের চন্দ্রালোকিত মধ্যরাত্রির প্রকৃতির মতো তাঁর কাব্য কুহেলি কুহকে আচ্ছন্ন। স্বভাবোক্তি অলঙ্কার ও বাক্‌প্রয়োগে দেশজ রীতির মিলনে সৃষ্ট তার আপাত সুবোধ্যতার অন্তরালে এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য বিরাজিত। বলতে কি, আধুনিক কবিদের মধ্যে একমাত্র তাঁর কাব্যেই এ-যুগের সংশয়ী মানবাত্মার ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত পরিচয়টি ফুটে উঠেছে।''

শব্দের তুলি দিয়ে জীবনানন্দ যে কাব্যের জগত এঁকেছেন, তা শুধু তাঁর সাধারণ চোখে দেখা জগত নয়। এই প্রত্যক্ষত দেখার জগতের গভীরে আর এক পৃথিবী রয়েছে যা আরও সূক্ষ্ম, বর্ণাঢ্য, স্পর্শকাতর। সেই পৃথিবীকে কবি দেখেছেন এবং সেই অনুভবের জগতের রূপচিত্র এঁকেছেন। অনায়াসে তিনি এই রূপচিত্রে সঞ্চার করেছেন বাস্তব-অতীতলোকের ব্যঞ্জনা। যার আবেদন পাঠকের ইন্দ্রিয় নির্ভর অনুভূতির কাছে। যা পাঠককে নিয়ে যায় বাস্তবাতীত স্বপ্নলোকে। আধুনিক কবির বাস্তবতাবোধের সঙ্গে এখানে মেলবন্ধন ঘটেছে পরাবাস্তবতা এবং রোমান্টিক ভাবনার।

রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কাব্যকে বলেছেন 'চিত্ররূপময়'। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত জীবনানন্দের কাব্যের চিত্ররীতির বস্তুনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষগোচর প্রয়োগ লক্ষ্য করে এই অভিধা দিয়েছেন। যেমন—

ক) আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই-নুয়ে আছে নদীর এপারে

বিয়োবার দেরি নাই রূপ ঝরে পড়ে তার।

খ) উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে

গ) বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে

কিন্তু জীবনানন্দের কবিতায় বর্ণনা শুধু চিত্ররূপময় থাকেনি— সেই চিত্ররূপ হয়ে উঠেছে ব্যঞ্জনাময়। যেমন

ক) ডানায় রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল

খ) নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল কুয়াশার

গ) বাংলার নীল সন্ধ্যা — কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে

এবং 'শিশিরের শব্দের মতোন সন্ধ্যা', 'বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকার', 'খর রৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষীয়সী রমণীর মতো ধান ভানে এই দুপুরের বাতাস'', 'অলস মাছির শব্দে ভরে থাকে সকালের বিষণ্ণ সময়'— এ সব চিত্ররীতি আবার 'ইন্দ্রিয়' নির্ভর।

জীবনানন্দের অনেক কবিতায় মৃত্যু চেতনার ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। এই মৃত্যুচেতনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে তাঁর গভীর জীবনাসক্তি। তাঁর কবিতার শব্দ বৈচিত্র্য, উপমা, চিত্রকল্প সব আয়োজন যেমন মৃত্যু-প্রস্তুতির, তেমনি জীবনানুরাগেরও। কবি পুনরায় নতুন মন, নতুন আনন্দ, নতুন জীবনে অভিষিক্ত হয়ে নদী-মাঠ, ঘাস, ফুল-পাখির আমন্ত্রণে ফিরে আসতে চান রূপে রূপান্তরে। চির পরিচিত প্রকৃতির বুকে। কবি তাই বলেন—

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে- এই বাংলায় হয়তো মানুষ নয়।

হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে।

নিজের সৃষ্টি জগতের পরিচয় দিতে গিয়ে কবি জীবনানন্দ 'কবিতার কথা'য় লিখেছেন— ''সৃষ্টির ভিতর মাঝে মাঝে এমন শব্দ শোনা যায়, এমন বর্ণ দেখা যায়, এমন অঘ্রাণ পাওয়া যায়, এমন মানুষের বা এমন অমানবীয় সংঘাত লাভ করা যায়কিংবা প্রভূত বেদনার সঙ্গে পরিচয় হয়, যে মনে হয় এই সমস্ত জিনিষই অনেকদিন থেকে প্রতিফলিত হয়ে কোথায় যেন ছিল; এবং ভঙ্গুর হয়ে নয়, সংহত হয়ে আরও অনেকদিন পর্যন্ত। মানুষের সভ্যতার শেষ জাফরান রৌদ্রলোক পর্যন্ত কোথাও যেন বয়ে যাবে। এই সত্ত্বের মধ্য দিয়ে অনুভূতি জন্ম নেয়, সুর জেগে ওঠে। এরা কবির কল্পনায় ও মননে এসে মিলিত হয় ও কাব্য জন্ম নেয়।''

৪.৫ সারাংশ

একই বছরে জন্ম নজরুল ও জীবনানন্দের। বীরত্বপূর্ণ বিদ্রোহভাবের কবিতা লিখে নজরুলের খ্যাতি ও পরিচিতি। নজরুলের জীবন ও কাব্য দুই-ই বিস্ময়কর। ঘরের মায়া কখনও তাঁকে বেঁধে রাখতে পারে নি। বিদ্রোহব্যঞ্জক কবিতা লিখে তিনি 'বিদ্রোহী কবি' আখ্যা পেয়েছিলেন। আধুনিক কবি জীবনানন্দ দাশ। আধুনিক কবি হিসাবে তাঁর কাব্যে পাওয়া যায় পরাবাস্তবতার ছবি। নির্জনতা, মৃত্যু-চেতনা, ইতিহাস চেতনা, বিষণ্ণতাবোধ— তাঁর কবিতার অন্যতম অবলম্বন। চিত্ররূপের বর্ণনায় তিনি অন্যদের থেকে আলাদা। প্রেম ও প্রকৃতিকে কবিতায় প্রকাশ করেছেন তিনি।

৪.৬ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) নজরুলের কবি প্রতিভার পরিচয় দিন।

২) বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের কাব্যবৈশিষ্ট্যের দিকগুলির আলোকপাত করুন।

৩) 'বিদ্রোহী' কবিতা নজরুলের উদাত্ত ব্যক্তিত্বের জয় পতাকা— আলোচনা করুন।

৪) বিদ্রোহের রৌদ্ররস আর প্রেমভাবনার মধুররস— নজরুলের কবিমানসে এই ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে— বিষয়টি বিশদ করুন।

৫) জীবনানন্দ প্রকৃতি ও নির্জনতার কবি— আলোচনা করুন।

৬) জীবনানন্দ দাশ রবীন্দ্রোত্তর কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) বিদ্রোহী কবিতাটি কবে লেখা?

২) 'দোলনচাঁপা' কাব্যগ্রন্থের নামকরণ কীভাবে হয়?

৩) 'চিত্তনামা' কাব্যটি কাকে স্মরণ করে লেখা।

৪) কোন্ কবিতা লেখার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে নজরুলের কারাদণ্ড হয়?

৫) জীবনানন্দ দাশের প্রথম মুদ্রিত কবিতা কোন্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৬) নজরুল ও জীবনানন্দের জন্ম সাল লিখুন।

৭) জীবনানন্দের কাব্যকে 'চিত্ররূপময়' বলেছেন কে?

৮) জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পর প্রকাশিত কাব্য দুটির নাম লিখুন।

৪.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৫ম খণ্ড)—সুকুমার সেন।

২) বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত — অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩) বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস — ক্ষেত্র গুপ্ত।

৪) নজরুলের কবি ব্যক্তিত্ব : শব্দ ও বাক্যবন্ধের প্রেক্ষিত— ক্ষেত্র গুপ্ত (নজরুল ইনস্টিটিউট - ঢাকা)

৫) নজরুল ইসলাম— মজাফ্ফর আহমেদ।

৬) কবিতার কথা— জীবনানন্দ দাশ।

৭) আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়— দীপ্তি ত্রিপাঠী।

একক-৫ ❑ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে

গঠন

৫.১. উদ্দেশ্য
৫.২ প্রস্তাবনা
৫.৩ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
৫.৪ বিষ্ণু দে
৫.৫ সারাংশ
৫.৬ অনুশীলনী
৫.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবেন কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও কবি বিষ্ণু দে-র কাব্যভুবনের নতুনধারা ও গতি প্রকৃতি। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় রবীন্দ্রপ্রভাব থাকলেও বিষ্ণু দে তা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছিলেন। বিষ্ণু দে ছিলেন পাশ্চাত্য কবি এলিয়টের দ্বারা অনুপ্রাণিত। সুধীন্দ্রনাথ ব্যঞ্জনাধর্মী কাব্যাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। বিষ্ণু দে-র রচনায় সাম্যবাদী ভাবনা ছিল। আলোচ্য দু'জন কবির এই সমস্ত ভাবনা তুলে ধরাই এই এককের উদ্দেশ্য।

৫.২ প্রস্তাবনা

সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র বলয়ের অন্তর্ভুক্ত কবি। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাঁর কবিতায় উত্তরণ ঘটে। কাব্যের মুক্তির জন্য তিনি পাশ্চাত্য কবিদের দ্বারস্থ হয়েছেন। বিষ্ণু দে যেমন প্রথম থেকেই এলিয়টের চিন্তা ও মননের দ্বারা অনুপ্রাণিত। আবার রবীন্দ্র প্রভাবান্বিত না হয়েও রবীন্দ্রনাথের কবিতার উদ্ধৃতি, ভাষা, ছন্দ প্রভৃতির ব্যবহার করেছেন অনায়াসে। জনজীবনের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার প্রেরণা আছে তাঁর কবিতায়।

৫.৩ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

১৯০১ খ্রিঃ ৩০ অক্টোবর কলকাতার হাতিবাগান অঞ্চলে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম। পিতা রবীন্দ্র-সুহৃদ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। মা কলকাতার বিখ্যাত বসুমল্লিক পরিবারের কন্যা ইন্দুমতী। সুধীন্দ্রনাথ পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। তাঁর স্কুল শিক্ষা শুরু কাশীতে। অ্যানি বেসন্ট স্থাপিত থিয়ফিক্যাল স্কুলে। ১৯১৭ খ্রিঃ কলকাতায় এসে তিনি ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভর্তি হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৯১৮-তে। এরপর সুধীন্দ্রনাথ ভর্তি হন স্কটিশচার্চ কলেজে। তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'নাট্য প্রতিভা' পত্রিকায়। কবিতাটি ভাষান্তরিত এবং সুধীন্দ্রনাথ এটি লেখেন বেনামে। ১৯২২-২৩ সালে তিনি ইংরাজি নিয়ে এম. এ তে ভর্তি হন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু পুঁথিগত বিদ্যায় ডিগ্রি অর্জনে তাঁর কোনো উৎসাহ বা উদ্যম ছিল না। তিনি একনিষ্ঠ ছিলেন ফরাসি ও জার্মান ভাষা

শিক্ষায়, বিদেশি সাহিত্য পাঠে এবং কবিতা রচনায়।

সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহভাজন। ১৯২২ খ্রিঃ ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথের জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ। ১৯৪৬ খ্রিঃ হিরণকুমার সান্যালের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনায় শুরু হয় 'পরিচয়' পত্রিকা। আমেরিকার চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। এরপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তিনি এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন ধ্রুপদী রীতিতে কবিতা রচনায় নিষ্ঠাশীল। কবিতা তাঁর কাছে ভাবের বিলাস ছিল না। তাঁর কবিতার জগৎ ছিল বিশ্বজ্ঞানমুখী। আধুনিক পৃথিবীর সমস্যা, নিবিড় জীবনসত্য অনুসন্ধান, দর্শন ও বিজ্ঞান ভাবনাকে কাব্য ভাবনায় যুক্ত করা, মনোবিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা ইত্যাদি বিচিত্র ভাবনার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল তাঁর কবি মনন। তাঁর কবিতা বুদ্ধিদীপ্ততায় উজ্জ্বল, এর প্রকাশভঙ্গি ঋজু কঠিন। নিষ্ঠা, অনুশীলন, পাণ্ডিত্য দিয়ে সুধীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছিলেন তাঁর কাব্য-ভুবন। ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে 'দেশ' 'সাহিত্য সংখ্যা'য় কবিতা সম্পর্কে নিজের মনোভাব তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন — 'যারা কবিতাকে ছুটির সাথী বলে ভাবে, কবিতার প্রতি ছত্র পড়ে হৃদকম্পন অনুভব করতে চায় তাদের কবিতা না পড়াই উচিত। কবিতার গঠন যেমন প্রত্যেক লাইন বিশ্লেষণ করে ধরা যায় না, তার ভাবাবেশও তেমনি। খণ্ডাকারে দেখা যায় না, বিরাজমান থাকে সমগ্রের মধ্যে। ভাব শুধু মেঘ বাঁশী প্রিয়া বিরহ মিলন ইত্যাদি জরাজীর্ণ শব্দের করতলগত নয়, শুধু প্রেম বেদনা ও প্রকৃতিকে নিয়ে কাব্যের কারবার চলে না, তার লোলুপ হাত দর্শন বিজ্ঞানের দিকেও আস্তে আস্তে প্রসারিত হচ্ছে ......

সুধীন্দ্রনাথের প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে। এগুলি হল— 'তন্বী', (১৯৩০), 'অর্কেস্ট্রা' (১৯৩৫), 'ক্রন্দসী' (১৯৩৭), 'উত্তরফাল্গুনী' (১৯৪০)। এর পরবর্তী কাব্যগুলি— 'সংবর্ত' (১৯৫৩) 'প্রতিধ্বনি' (১৯৫৪), 'দশমী' (১৯৫৬)। তাঁর গদ্য প্রবন্ধ — 'স্বাগত' (১৯৩৮), 'কুলায় ও কালপুরুষ' (১৯৫৭)।

রবীন্দ্রনাথ কবি সুধীন্দ্রনাথকে যথার্থ 'আধুনিক' কবিরূপে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। তিনি তাঁর 'আকাশপ্রদীপ' কাব্যটি (১৩৪৬ বঙ্গাব্দে) সুধীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করে লিখেছেন — "... আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে আশা করে এই বই তোমার হাতে এগিয়ে দিলুম। তুমি আধুনিক সাহিত্যের সাধন ক্ষেত্র থেকে একে গ্রহণ করো।" তাঁকে আধুনিক কবিরূপে স্বীকৃতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন"বাংলা সহিত্যে তুমি যথার্থই আধুনিক; কিন্তু তোমার কাব্য আধুনিকের ভেক ধারণ করতে উপেক্ষা করেছে, অথচ পরিচিত কাব্যের নেপথ্যবিধানে যে উত্তরীয় তোমার পছন্দ হয়েছে সেটা সহজেই গায়ে দিয়ে সাহিত্য সভায় প্রবেশ করতে তোমার কুণ্ঠা হয়নি।"

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে মানবজীবনের হতাশা, বেদনা, নৈরাশ্য, আর্তনাদ বারবার শোনা গেছে। কাব্যের প্রয়োজনে, প্রজ্ঞার নির্দেশে অনেকক্ষেত্রে তিনি পুরাণের আশ্রয় নিয়েছেন। তবে পৌরাণিক চরিত্র বা শব্দগুলি প্রায়শই পুরাণের সীমা অতিক্রম করে ভিন্ন অর্থে, ভিন্নতর ব্যঞ্জনায় বহুমুখি তাৎপর্য পেয়েছে। কবিতার শব্দ ব্যবহারে কবি ছিলেন অতিমাত্রায় সচেতন, নিত্য নতুন শব্দ সন্ধান প্রবণতা তাঁর কবি-মনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কবিতাকে তিনি শব্দ-ব্যবহারের পরীক্ষারূপে বিবেচনা করতেন। শব্দকে উদ্দেশ্য করে সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন "মূল্যহীন সোনা হয় তব স্পর্শে, হে শব্দ-অপ্সরী।" সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে ড. ক্ষেত্র গুপ্ত "বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস"এ লিখেছেন — 'একদিকে ব্যক্তিগত প্রেমানুভূতি, অন্যদিকে বিশ্ববোধ, ইতিহাস ও সমাজচেতনা কবিকে বিষণ্ণ বেদনায় আহত করেছে প্রতিনিয়ত। এই যন্ত্রণাক্ষুব্ধ চিত্তই ভাষায় জটিল এবং শব্দে দুরূহ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর

কবিতায়। আত্মা নেই, বুদ্ধি বন্ধ্যা, প্রেম অবাস্তব, এইরূপ বিবিধ দার্শনিকতা, বৌদ্ধ ক্ষণবাদ - সুধীন্দ্রনাথের চেতনায় ক্রিয়াশীল। কিন্তু তত্ত্বের চেয়ে বড় তাঁর ব্যক্তিত্বের যন্ত্রণা, যাকে একান্ত মানবিক বলে চিনতে অসুবিধা হয়না। তাঁর কবিতায় শব্দ ও অতীত উল্লেখে এক বুদ্ধিদীপ্ত জগতের উপভোগ। শব্দ-নির্মাণে কবির অভিনব মৌলিকতা।" এই উল্লেখের প্রতিচ্ছবি তাঁর কবিতায়—

"হে বিধাতা,

অতিক্রান্ত শতাব্দীর পৈত্রিক বিধাতা,
দাও মোরে ফিরে দাও অগ্রজের অটল বিশ্বাস
**** রৌদ্র জ্যোতি হতে
আবার ফিরাও মোরে তমসার প্রশ্ন দায়ভাগে।"

৫.৪ বিষ্ণু দে

কবি বিষ্ণু দে ১৯০৯ খ্রিঃ কলকাতার পটলডাঙায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা অবিনাশচন্দ্র দে। তাঁদের পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল হাওড়ায়। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ-এ পাস করেন। এরপর প্রথমে কলকাতার রিপন কলেজে এবং পরে প্রেসিডেন্সি ও ইসলামিয়া (মৌলানা আজাদ কলেজ) কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৬৬ খ্রিঃ অ্যাকাডেমি পুরস্কার, ১৯৭৩-এ জ্ঞানপীঠ পুরস্কার এবং সোভিয়েট ল্যান্ড নেহরু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন।

বলা কাব্যে বিষ্ণু দের প্রবেশ জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সমকালে। এই দুই কবির চেয়ে বিষ্ণু দে কিছুটা বয়ঃকনিষ্ঠ। তাঁর কবিতা লেখার ব্যাপারে বুদ্ধদেব বসুর সাহচর্য প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। বুদ্ধদেব বসুর 'প্রগতি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বিষ্ণু দের অধিকাংশ কবিতা। তাঁর কবি মননে সদা জাগ্রত ছিল কবি এলিয়টের প্রভাব। আশাভঙ্গের কারণে সংশয়, ক্লান্তি অবসাদের বিষণতা গভীর ছায়া ফেলেছিল কবির মনে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ধ্বংসরূপ,ক্ষয়িষ্ণুতা, মানুষের অসহায়তা তাঁকে পীড়িত করেছে। তাঁর কবিতায় শোনা গেছে এরই উচ্চারণ।

বিষ্ণু দের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ— 'উর্বশী ও আর্টেমিস' (১৯৩২), 'চোরাবালি' (১৯৩৮), 'পূর্বলেখ' (১৯৪১), 'সাত ভাই চম্পা' (১৯৪৫), 'সন্দীপের চর' (১৯৪৭), 'অনিষ্ট' (১৯৫০), 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' (১৯৫০), 'আলেখ্য' (১৯৫৮), 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' (১৯৬০), 'স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ' (১৯৬০), 'সেই অন্ধকার চাই' (১৯৬৫), ' উত্তরে থাকো মৌন' (১৯৭৭), 'কবিতা সমগ্র' (১৯৮৯) ইত্যাদি।/

বিষ্ণু দে আত্ম-অনুসন্ধানী কবি। নিজের কবিতার মধ্যে কবি অবিরাম আপন সত্তা খুঁজেছেন, খুঁজেছেন আত্মপরিচয়। তিনি কখনোই অচল, প্রাণহীন, বিষাদময় আত্মবন্দিদশা মেনে নিতে পারেননি। সেকারণেই 'উর্বশী ও আর্টেমিস' ও 'চোরাবালি' কাব্যের 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাতে সেই মুক্তি কামনার প্রবল সুর শোনা গেছে। এই নিষ্ফল বন্ধ্যাত্ব থেকে মুক্তির প্রবল আর্তি উচ্চকিত হয়েছে 'পূর্বলেখ' কাব্যের 'জন্মাষ্টমী' কবিতায়। সেখানে কবি বলেছেন—

হে বন্ধু, এ নাচিকেত মেঘ
আসন্ন মুমূর্ষাক্ষুব্ধ আমার পাতাল
ধুয়ে দিক। বজ্রযোগে বিদ্যুৎ-অঙ্গারে

উড়ায়ে পুরায়ে দিক বিষঙ্গের উজ্জীবনে

সঞ্জীবনী প্রতিষেধে সাবিত্রীকে সম্পূরণে

বেঁধে দিক হে সুশ্রুত, উদ্‌গতির হিরন্ময় জালে।

কবি কামনা করেছেন এই জরাগ্রস্ত পৃথিবীর সমস্ত পাপ ও ক্লেদ মুক্ত হোক। কবির হাতে নবীন আশার ছাড়পত্র লেখা হোক নতুন ভাষায়।

এলিয়টের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও জীবনানুভূতির সর্বক্ষেত্রে এই ভাবাদর্শে কবি বিষ্ণু দের মনন চালিত হয়নি। এলিয়টের ভাবাদর্শের পাশাপাশি মার্কসবাদী ভাবনাও কবিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। মানব চৈতন্যের খণ্ডতার জন্য যে রাজতন্ত্র দায়ী এ সম্পর্কে তিনি ছিলেন দ্বিধাহীন। কিন্তু ব্যক্তি মানুষের ইতিহাস চেতনা বিষ্ণু দের মননে অধিকতর ক্রিয়াশীল। তাঁর ইতিহাস চেতনা অতীতমুখী নয়, ভবিষ্যৎমুখী। সে ইতিহাসের রঙ্গভূমি সমকালীন সমাজ। তাঁর কাব্যমননের পশ্চাতে রয়েছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদলব্ধ দৃঢ় প্রত্যয়। সাম্যবাদী বিপ্লবের পথেই হবে সমাজের মুক্তি—এ ভাবনাও তাঁর কবিতায় লক্ষ করা গেছে। তবে যান্ত্রিক মার্কসবাদ তিনি মেনে নিতে পারেননি। মানসী প্রিয়ার প্রতি অনুরাগ ও বিশ্বানুরাগকে একই অনুভূতির আশ্রয়ে লালন করেছেন কবি বিষ্ণু দে।

অন্যান্য আধুনিক কবিদের মতো বিষ্ণু দে-ও বুঝেছিলেন রবীন্দ্র ভাবমণ্ডলে মগ্ন থেকে আধুনিক কবিতা লেখা সম্ভব নয়। তিনি সচেতন বলিষ্ঠতায় রবীন্দ্রদর্শন প্রত্যাখ্যান করার কথা বলেছেন—

হেথা নাই গান্ধিজীর নাটকীয় জয় অভিযান

হেথা নাই সুশোভন রূপদক্ষ রবীন্দ্র ঠাকুর।

বিভিন্ন কবিতায় রবীন্দ্র উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন বক্র-তির্যক ভঙ্গিতে। যেমন- 'বড়োবাজারের উপল উপকূলে।' কিংবা পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছো এ কি সন্ন্যাসী / বিশ্বময় চলেছে তার ভোজ।'

জীবনের দীর্ঘ পথ চলার অভিজ্ঞতার পর বিষ্ণু দে রবীন্দ্রনাথের কাব্যভুবনে, তাঁর দার্শনিক প্রজ্ঞায় খুঁজে পেয়েছেন নতুন আলোর দিশা। 'রূপদক্ষ শোভন' 'রবীন্দ্র ঠাকুরেরই পরিণত জ্ঞান গুটি রূপনারায়ণের উপকূলে এসে দাঁড়িয়েছেন। কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে নিবিড় প্রার্থনা

তোমার আকাশে দাও, কবি দাও

দীর্ঘ আশি বছরের

আমাদের ক্ষীয়মান মানসে ছড়াও

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আশি বছরের আলো।

('তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ? 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ')

নিজের কবিতায় রবীন্দ্রকাব্যাংশ, চরণ উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে শোনা গেল অনুরাগের সুর। যেমন—

(১) ''কানে কানে শুনি

তিমির দুয়ার খোল হে জ্যোতির্ময়।''

(আবির্ভাব— পূর্বলেখ)

২) এসেছি তোমারি পাশে, নূতন ঊষার স্বর্ণদ্বার

দেখেছি তোমারি চোখে, অমর মহিমা।
তাই দেশে দেশে বর্ষে বর্ষে
সময়ে। তীর ধুয়ে ধুয়ে
চূর্ণ করে নিজ মর্ত্যসীমা মুহূর্তেরে সংহত ফাল্গুনে।
('ঐ মহাসমুদ্রের' — 'আলেখ্য')

তিনি আরও বলেছেন—

রবীন্দ্র ব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে
চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধিনা, বরং
আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি, গানে গানে নেমে
সমুদ্রের দিকে চলি, খুলে দিই রেখা আর রং
সদাই নূতন চিত্রে গল্পে কাব্যে হাজার ছন্দের
রুদ্ধ উৎস খুঁজে পাই খরস্রোত নব-আনন্দের।
('২৫শে বৈশাখ' 'নাম রেখেছি কোমল গন্ধার')

কবিতা রচনার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পথের পথিক হতে চেয়েছেন কবি বিষ্ণু দে। তাঁর স্বাতন্ত্র্য নির্দেশে ড. দীপ্তি ত্রিপাঠী বলেছেন— "জ্বলন্ত নীহারিকা থেকে যেমন জন্ম নেয় দীপ্যমান তারা তেমনি আধুনিক কাব্যের ক্লান্তি, জিজ্ঞাসা, সংশয়, বিতৃষ্ণা, নৈরাশ্য ও নির্বেদের বিশৃঙ্খল বাষ্পপুঞ্জ থেকে তিনি (বিষ্ণু দে) সৃষ্টি করেছেন বিশ্বাসের ধ্রুবলোক। ****তিনি আধুনিক কাব্য জগতের প্রথম অস্তিবাদী কবি। ****বিষ্ণু দে-এর অনিষ্ট একক সাধনার পথে মেলে না — মেলে সচেতন সামাজিক সমবায়ের পথে।"

জীবনানন্দের চিত্ররীতির বৈশিষ্ট্য বিষ্ণু দের কাব্যে দুর্লভ না হলেও বিশেষ নির্দেশিত নয়। তবে গীতি ধর্মে কবির প্রেরণা আন্তরিক। তিনি কাব্যেরূপ দিয়েছেন জনতার মিছিলের ধ্বনিকে ধরে রেখেছেন রাজনৈতিক শ্লোগানকে, গাজনের ঢাকের শব্দ—

বহু বঞ্চনা বহু অনাচারে
অমর প্রাণ
বীরদল চলে হাজারো মজুর
লাখো কিষাণ।

নির্বাসিত জনারণ্যের কবি নন বিষ্ণু দে। তিনি সমকাল এবং সমকালীন জীবনের বিচিত্র অনুভূতির উৎকর্ণ স্রোতা—তার একনিষ্ঠ ভাষ্যকার।

এভাবেই কবি বিষ্ণু দে উত্তীর্ণ হয়েছেন প্রত্যয়ের দ্বিতীয়স্বর্গে। তবে একথা ঠিক যে, সচেতন প্রজ্ঞাচালিত বিষ্ণুদের রবীন্দ্র অনুরাগ কোনো ভাবেই রবীন্দ্র অনুসরণ নয়, তাঁর কাব্যধ্যানের জগৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই রবীন্দ্র উপকূলবর্তী হয়েও নিজের স্বাতন্ত্র্যে রবীন্দ্রভাবনা থেকে অনেকটাই দূরবর্তী, আর সে অর্থেই তিনি আধুনিক।

৫.৫ সারাংশ

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় ব্যঞ্জনাধর্মী প্রতীকী ভাবাদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মিস্টিক অনুভূতির কবি। কবিতায় দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করেছেন তিনি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপ্রচলিত শব্দ, নতুন শব্দের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কবিতায় নেতিবাদী জীবনভাবনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত অস্তিত্ববাদী জীবন দর্শনে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তবে তাঁর কবিতায় জটিলতা দেখা যায়। পক্ষান্তরে বিষ্ণু দে-র প্রতিভা বিশ্বগ্রাসী। তবে অনায়াসে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ঘটিয়েছেন। এলিয়ট থেকে পরবর্তীকালে সরে এসেছেন। আস্থাশীল হয়েছেন মার্কসবাদে। তবে সেখানেও মানসিক ঐক্য গড়ে তুলতে পারেন নি। তাঁর কবিতায় সমাজ চেতনা, ঐতিহ্যচেতনা প্রবলভাবে দেখা যায়। ভাষা ব্যবহারে তাঁর সহজ সরল ভাবনার পরিচয় মেলে।

৫.৬ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবি প্রতিভার পরিচয় দিন।

২) কবিতা রচনার ক্ষেত্রে বিষ্ণু দে স্বতন্ত্র পথের পথিক— আলোচনা করুন।

৩) আধুনিক কবি হিসাবে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে-র কৃতিত্ব দেখান।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রথম কবিতা কোন্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

২) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত পত্রিকার নাম ও প্রকাশকাল লিখুন।

৩) সুধীন্দ্রনাথকে যথার্থ 'আধুনিক' কবিরূপে কে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন?

৪) ইংরেজ কোন্ কবির ভাবাদর্শ বিষ্ণু দে-র ওপর প্রভাব ফেলেছিল?

৫) রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা বিষ্ণু দে-র কাব্য গ্রন্থটির নাম লিখুন।

৫.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৫ম খণ্ড)—সুকুমার সেন।

২) বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস — ক্ষেত্র গুপ্ত।

৩) আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়— দীপ্তি ত্রিপাঠী।

৪) কবিতার কালান্তর— সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

একক-৬ ❑ সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গঠন

৬.১. উদ্দেশ্য
৬.২ প্রস্তাবনা
৬.৩ সমর সেন
৬.৪ সুভাষ মুখোপাধ্যায়
৬.৫ সুকান্ত ভট্টাচার্য
৬.৬ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৬.৭ সারাংশ
৬.৮ অনুশীলনী
৬.৯ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা আধুনিক যুগের কবি সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে জানতে পারবেন। কবিতা রচনার ক্ষেত্রে এঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজস্বতায় বিদ্যমান। সমর সেন মধ্যবিত্ত জীবনভাবনার কবি। নাগরিক মেজাজ তাঁর মজ্জায়। নানা কারণে তাঁর সময়ের অন্যান্য অনেক কবি থেকে তিনি আলাদা। আত্মবঞ্চনা করবেন না বলেই অল্প সময়ে কাব্যজগৎ থেকে সরে দাঁড়ান তিনি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় চল্লিশের দশকের একজন বিশিষ্ট কবি। তবে জীবনের প্রথম পর্বের মতো শেষ পর্বে তিনি আদর্শগত দিক থেকে একইরকম ভাবনায় নিমজ্জিত থাকতে পারেন নি। সবসময় এক দোলাচলবৃত্তি তাঁর মধ্যে কাজ করেছে। কীভাবে প্রচারধর্মিতা ছেড়ে যথার্থ কাব্য রচনা করা যায় তা জানার অবকাশ আছে এখানে। কিশোর কবি সুকান্তের জীবনভাবনা, তাঁর মানবপ্রেম এবং রাজনৈতিক চেতনার দিকটি এখানে জানা যাবে। বামপন্থী এই কবি কীভাবে জন-দরদী হয়ে উঠেছিলেন তারও পরিচয় পাওয়া যাবে এখানে। মানুষের উপর অত্যাচার দেখে মনের মধ্যে যে আলোড়ন সেটা বিদ্রোহ আকারে প্রকাশ পেয়েছে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়। দেশ-বিদেশের নানা ঘটনা কীভাবে কবিকে কাব্য-রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে তা জানা যাবে এই এককে।

৬.২ প্রস্তাবনা

মেজাজের দিক থেকে সমর সেনের কবিতা একটু অন্য ধরনের। রূঢ় বাস্তবকে সামনে রেখে কাব্যজগতের অলি-গলিতে বিচরণ করে অল্পদিনেই কাব্যজগৎ থেকে বিদায় নিলেন তিনি। সমাজ ও মানুষের অবক্ষয় তাঁকে বিচলিত করেছিল। একইভাবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যজীবনেও ঘটেছে আরেক বিচ্যুতি। বামপন্থা থেকে সরে

এসে মানুষের কবি হয়ে উঠেছেন তিনি। উদার মানবিকতার জগতে পৌঁছেছেন সৃষ্টিশীল রচনার মাধ্যমে, সুকান্তের কাব্যসত্তা ও রাজনৈতিক সত্তা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুকান্তের কাব্য জীবনের অন্যতম আশ্রয়। তিনি জনতার কবি হতে চেয়েছিলেন এবং পেরেছিলেনও। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাস্তববাদী হওয়ার জন্য মাটির কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছিলেন। অত্যাচারিত মানুষের জীবনের বেদনার ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতায়। সমকালীন মানব-জীবন চিত্র অঙ্কন করেছেন তিনি।

৬.৩ সমর সেন

নাগরিক চেতনার কবি সমর সেনের জন্ম ১৯১৬ খ্রিঃ ১০ অক্টোবর, উত্তর কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলের বিশ্বকোষ লেনে। তিনি আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের পৌত্র। পিতা অরুণচন্দ্র সেন। মা চন্দ্রমুখী দেবী। তিনি কাশিমবাজার পলিটেকনিক স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর ভর্তি হন স্কটিশচার্চ কলেজে। এম.এ পর্যন্ত প্রত্যেক পরীক্ষাতে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। ছাত্র হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাসম্পন্ন। তাঁর চাকুরি জীবন শুরু কাঁথির প্রভাতকুমার কলেজে। ১৯৪৯-এ কলকাতায় 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৫৭ খ্রিঃ অনুবাদকের চাকুরি নিয়ে মস্কোতে যান। ফিরে এসে প্রথমে একটি বিজ্ঞাপন সংস্থায়, পরে 'হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ড-এর যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৬৪ তে হুমায়ুন কবীরের কথায় 'নাউ' (Now) পত্রিকার সম্পাদক পদে যোগ দেন। কিন্তু বামপন্থী ভাবাদর্শে বিশ্বাসী এবং অনুপ্রাণিত সমর সেন বেশি দিন এই পত্রিকায় কাজ করতে পারেননি। এরপর নিজেই ফ্রন্টিয়ার (Frontier) পত্রিকা প্রকাশ করেন।

সমর সেন এক বিস্ময়কর প্রতিভার নাম। বুদ্ধিজীবী সমর সেন যুবা বয়সে কবি— পূর্ণত নাগরিক যৌবনের কবি। আবার পরিণত বয়সে তীক্ষ্ন মননশীল বুদ্ধিজীবী প্রবন্ধকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উদ্ধত আশংকার মধ্যে পরিণত হয়েছে। সমর সেনের কবি-মানস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিধ্বস্ত পৃথিবীতে তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্ধকার ঘনীভূত হচ্ছে, ধ্বংসের সংকেত ভাসছে নাগরিক আবহাওয়ায়। নাগরিক জীবনের এই পারিপার্শ্বিকতায় তীব্র সংবেদনশীল মন আর অভিমানী যৌবনের একরাশ বেদনা বুকে নিয়ে বাংলা কাব্যজগতে সমর সেনের পদসঞ্চার। তাঁর অভিমানী বেদনা-রুদ্ধ যৌবনেরই ফসল তাঁর কবিতা। যৌবন প্রান্তে এসে কবিতার জগত থেকে বিদায় নিলেন কবি। কিংবা কবিতার প্রেরণা তাঁকে বিদায় জানালো। শেষ কবিতা 'জন্মদিনে' কবির কণ্ঠে শোনা গেল—

রোমান্টিক ব্যাধি আর রূপান্তরিত হয় না কবিতায়।
যৌবনের প্রেম শেষ প্রবীণের কামে
বছর দশেক পর যাবো কাশীধামে।

কবি-চিত্তের এই প্রকাশের মধ্যে রয়েছে শ্লেষ মেশানো স্বীকারোক্তি। যৌবন লক্ষ্মণরেখায় অবসিত কবি-সত্তার পরিচয় নির্দিষ্ট হয়েছে 'যৌবনের কবি' অভিধায়। সর্বাঙ্গীন ভাবেই সমর সেন যৌবনের কবি। সমর সেন নিজেই বলেছেন, 'আমার কবিতা রচনার আয়ু অবশ্য বারো বছর— আঠারো বছর থেকে তিরিশ বছর পর্যন্ত।'

নাগরিক জীবনের খণ্ড খণ্ড ছবি ও উল্লেখ কোনো কোনো আধুনিক কবিতে থাকলেও সমগ্রভাবে আধুনিক নগরজীবন সমর সেনের কবিতাতেই প্রথম ধরা পড়লো। সমর সেন শহরের কবি, কলকাতার কবি, আমাদের আজকালকার জীবনের সমস্ত বিচার বিক্ষোভ ও ক্লান্তির কবি। স্বল্পকালের কবিজীবনেই সমর সেন নিজের বৈশিষ্ট্যে এবং স্বাতন্ত্র্যে অনন্য।

সমর সেন শহরের কবি। তাঁর কবিতায় শহরের যে ছবি ধরা পড়েছে তা কবির সমকালের শহরের থেকে অনেকটাই দূরের। তাঁর কল্পনার শহরের পারিপার্শ্বিকতা অনেকটাই পরিবর্তিত। এ শহর ধনতান্ত্রিক যান্ত্রিক সভ্যতারই দান। কবির 'ঘরে বাইরে' কবিতায় নগরের ছবি—

কোনো নগরে একদিন যেন ছিল।
চারিদিকে মেখলার মতো শালবনের অন্ধকার
পাহাড়ের মতো মেঘবর্ণ প্রাসাদ, স্বয়ংবরা প্রেম।

অন্যদিকে আধুনিক শহরে কবির অভিজ্ঞতা—

রাত্রির দূষিত রক্তে বিকলাঙ্গ দিনের প্রসবে।
আমাদের নিদ্রা ভাঙে।
(একমাত্র তোমাকেই সত্য বলে মানি)

এ শহরের 'আকাশে ধোঁয়ার ক্লেশ, চারিদিকে ধোঁয়ার গন্ধ' বাতাসে 'অসংখ্য ধুলোর কণা।' এখানে 'কলেরা আর কলের বাঁশি আর গণোরিয়া আর বসন্ত, বন্যা আর দুর্ভিক্ষ।' "অমৃতের পুত্র মানুষকে সম্বোধন করে, শৃণ্বন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ উল্লেখ করে 'ঝড়' আর 'নাগরিক' কবিতায় শহরের এই দুঃসহ ছবি তুলে ধরেছেন কবি সমর সেন। এ শহর টি. এস. এলিয়টের 'Dead city'-র কথা মনে করায়।

সম্ভবত, সময়ের সঙ্গে কবির মনের দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে তিনি নিজেকে মেলাতে পারেনি। তাই কবিতার জগত থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। এরপর তাঁর দীর্ঘ যাত্রা গদ্যের পথে। সমর সেনের কাব্যগ্রন্থ ৫টি— 'কয়েকটি কবিতা' (১৯৩৭), 'গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৪০), 'নানাকথা' (১৯৪২), 'খোলা চিঠি' (১৯৪৩) এবং 'তিন পুরুষ' (১৯৪৪)। এই কবিতাগ্রন্থগুলিতে সর্বমোট কবিতা সংখ্যা ১০৬টি।

কবি সমর সেন গদ্যকেই তাঁর কবিতার বাহন করেছিলেন। পদ্যছন্দ খুব কমই ব্যবহার করেছেন। নাগরিক জীবনের যন্ত্রণা, মধ্যবিত্তের স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, বুদ্ধিজীবীদের পদস্খলন, প্রগতিশীলতার ছদ্মবেশে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রবণতা, লোভ, হিংসা, স্বার্থপরতাকে কবিতায় তুলে ধরেছেন কবি। সময়ের দলিল হিসেবে তাঁর কবিতার স্বতন্ত্র মূল্য আছে। সমর সেনের কবিতা রচনার প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে তাঁকে লিখেছিলেন — "তোমার লেখনী কাব্যের যে নতুন সীমানায় যাত্রা করছে সে আমার অপরিচিত, শুধু আমার নয়, সাধারণের কাছে এর ম্যাপ এখনো স্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত হয়নি, সুতরাং এখানে তোমার আসন অল্প লোকের কাছেই স্বীকৃত হোতে বাধ্য।"

৬.৪ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ১৯১৯ খ্রিঃ। কলকাতা সত্যভামা ইনস্টিটিউশনের ছাত্র সুভাষ। স্কুল ম্যাগাজিন 'ফল্গু'তে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম লেখা 'কথিকা'। এই প্রথম প্রকাশিত লেখাটি কবিতা নয়, গদ্য। ১৯৪০-এ 'কবিতা ভবন' থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক'। কবি হিসেবে পরিচিতির সফল সূচনা। এরপর 'চিরকুট', 'অগ্নিকোন', 'ফুল ফুটুক' কাব্য প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫৭ সালের মধ্যে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য 'পদাতিক'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে 'কবিতা' পত্রিকায় একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন বুদ্ধদেব বসু। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য-মনন বিশ্লেষণ প্রেক্ষিতে লিখলেন- "....তিনি বোধহয় প্রথম বাঙালি কবি যিনি প্রেমের

কবিতা লিখে কাব্যজীবন আরম্ভ করলেন না। এমন কি প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাও তিনি লিখলেন না। কোনো অস্পষ্ট, মধুর সৌরভ তাঁর রচনায় নেই। এটা বোঝা যাচ্ছে যে, এখন আমরা ইতিহাসের এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি, যখন বাঙালি কবির হাতে কবিতা আর শুধুই বীণা হয়ে বাজছে না, অস্ত্র হয়েও ঝলসাচ্ছে।"

'পদাতিকে'র বহু পঠিত, বহু চর্চিত কবিতা 'মে-দিনের কবিতা।' এ কবিতায় শোনা গেছে বিপ্লব প্রস্তুতির আহ্বান। কবির আদর্শ ভাবনার দিকটি এখানে উচ্চকিত—

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠ ফাটা রোদে সেঁকে চামড়া।

সমকালে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও মনন বিশ্লেষণে দেখা যাবে কবিতা, আদর্শ ভাবনা আর জীবন এখানে বেজেছে একই সুরে—

শতাব্দী-লাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিশ্বাসে আনে লজ্জা;
মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না—
পরো, পরো যুদ্ধের সজ্জা।

১৯৩৯ সালে কবি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। পার্টির সদস্য হন ১৯৪২-এ। ১৯৪৮ সালে আরও অনেক নেতা কর্মীর সঙ্গে সুভাষ কারারুদ্ধ হন। মুক্তি পান ১৯৫০ সালে।

জেল থেকে মুক্তির পর ১৯৫১ সালে 'পরিচয়' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পান। পার্টির প্রতি নিবিড় আনুগত্য ও মার্কসীয় আদর্শবাদের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে সুভাষের জীবন-ভাবনা তথা জীবন দর্শন। তাঁর কাব্য-ভাবনার উৎসও এরই মধ্যে নিহিত। এ পর্বে তাঁর জীবন, পার্টি আদর্শ ও কবিতা প্রবাহিত হয়েছিল একই অবিচ্ছিন্ন ধারায়।

তাঁর কবিতার একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে দীন-দরিদ্র, সর্বহারা মানুষ এবং কৃষক-শ্রমিকের কথা। তাদের সার্বিক মুক্তি ভাবনা। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল কবির অসাম্প্রদায়িক মন। উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা যেতে পারে কয়েকটি কবিতার অংশ—

কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?
কুয়াশাকঠিন বাসর যে সম্মুখে
লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা — (সকলের গান)

'পদাতিক'-এ কবি বলেছেন—

জীবনকে পেয়েছি আমরা, বিদ্যুত জীবনকে।
উজ্জ্বল রৌদ্রের দিন কাটুক যৌথ কর্ষণায়
আর ক্ষুরধার প্রত্যঙ্গ তরঙ্গ তুলুক কারখানায়।

কিংবা 'কাব্যজিজ্ঞাসা'-য়—

একলা নই, মিলিত হাত
আজ আঘাত হানবে।
মুক্তিদাতা মজুর চাষা—
****
আমরা দেব বোবাকে ধ্বনি,
খোঁড়াকে দ্রুত ছন্দ
লক্ষ বুকে রয়েছে খনি,
কুঁড়িতে ঢাকা গন্ধ।
আমরা নই প্রলয় ঝড়ে অন্ধ।
****

এবং

শতকোটি প্রণামান্তে
হুজুরে নিবেদন এই—
মাপ করবেন খাজনা এ সন
ছিটেফোঁটাও ধান নেই। (চিরকুট—প্রথম স্তবক)
****
পেট জ্বলছে, ক্ষেত জ্বলছে
হুজুর, জেনে রাখুন
খাজনা এবার মাপ না হলে
জ্বলে উঠবে আগুন। (চিরকুট—শেষ স্তবক)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বহুশ্রুত কবিতা 'মিছিলের মুখ'-এ 'আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত', 'মুষ্ঠিবদ্ধ একটি শাণিত হাত, আগুনের শিখার মতো হাওয়ায় কম্পমান', 'বিস্তস্ত কয়েকটি কেশাগ্র', 'ফসফরাসের মতন জ্বলজ্বল, (মিছিলের মুখ)। কিংবা 'সুন্দর' কবিতার সুন্দর ভাবনায়, 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত'-এর অনুভবে, 'লাল টুকটুকে দিন'-এর প্রত্যাশার মধ্যেও রাজনৈতিক ভাবনার ছায়া সুস্পষ্ট। প্রখ্যাত সমালোচক অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের মতে, কবি সুভাষের মনোভঙ্গি র পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, 'ফুল ফুটুক' কাব্যগ্রন্থের পর্বে। তিনি বলেছেন 'ফুল ফুটুক' কাব্যে কবির পদসঞ্চার রাজনীতির গণ্ডির বাইরে মুক্ত পৃথিবীতে। সংগ্রামী সৈনিক দেখা দিলেন কবি-শিল্পীর অপূর্ব রূপ-লাবণ্যে।' কিন্তু সময় এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে এই মন্তব্যের সঙ্গে সহমত হওয়া যায় না। বরং 'ফুল ফুটুক'-এর পাঁচ বছর পর ১৯৬২-তে প্রকাশিত কাব্য 'যত দূরেই যাই' এবং তার পরবর্তী 'কাল মধুমাস' (১৯৬৬), 'এস ভাই' (১৯৭১) এবং ছেলে গেছে বনে। (১৯৭২) — কাব্যগুলির মধ্যে সুভাষের কবি-মননের ক্রমপরিবর্তনের চিহ্ন অনেক বেশি সুস্পষ্ট। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পর্ক ছেদ ১৯৮১ সালে।

সুভাষের কবিতার দু'টি পর্ব সুস্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা যায়। প্রথম পর্বে তিনি সৈনিক-কবি। এই পর্বের কবিতা উচ্চকিত বিপ্লবের বার্তাবহ, শ্লোগানধর্মী। সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদী। তাঁর উত্তর পর্বের কবিতায় মননের প্রাধান্য। তিনি হৃদয়-অনুসন্ধানে মগ্ন। এখানে তিনি শুধুই মানুষের কবি। এখানে তাঁর দায়বদ্ধতা শুধু সত্যের কাছে। সহৃদয় পাঠকের কাছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের মঙ্গল সাধনার এক পথ রাজনীতি এবং অন্যপথ কবিতা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, কেবল কবিতার অন্তর্ভাবনায় নয়, বিষয়বস্তু ও কর্মের দিকেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে তাঁর উত্তর-পর্বের কবিতায়। তিনি নিজেই তৈরি করেছেন স্বতন্ত্র কাব্যভাষা। ছন্দ নির্মাণেও অভিনবত্বের ব্যাপারটা এসেছে বারেবারে। তাৎক্ষণিক দেখা ঘটনাও কবিতার বিষয় হয়েছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় ও অর্থবহ ও জীবনবোধের বিষয় হয়ে উঠেছে।

হৃদয় অনুসন্ধানের অনুসন্ধিৎসা বিভিন্নভাবে এসেছে সুভাষের কবিতায়। কবি জানেন ভালোবাসার উৎস এবং আশ্রয় হৃদয়। কবির হৃদয় সেই দিকদর্শন যন্ত্র যার চিরন্তন অভিমুখ সত্যের দিকে। 'যত দূরেই যাই' কাব্যগ্রন্থের 'লোকটা জানলই না' কবিতায় রয়েছে কবির যথার্থ হৃদয়-অন্বেষণের সংবাদ। বাঁ দিকের বুক পকেটটা সামলাতে সামলাতে 'যে' লোকটার।

'ইহকাল পরকাল গেল' তার জন্য কবির বড় আক্ষেপ। কবি জানেন—

> ''অথচ
> আর একটু নিচে
> হাত দিলেই সে পেত
> আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ
> তার হৃদয় ।
> লোকটা জানলই না।''

সুভাষের দীর্ঘ জীবনপথ শ্লোগান আর মননের মেল বন্ধনের ইতিহাস। মননের কক্ষ পরিবর্তনের সঙ্গে কবিতার ভাবনাতেও পরিবর্তন এসেছে। তাঁর কবিতায় শ্লোগান কখনও রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত, আবার কখনও বিশ্বমানবতা, সৌভ্রাতৃত্বের বাণীতে অভিসিঞ্চিত।

'জল সইতে' কবিতায় কবি কণ্ঠে শোনা গেছে গভীর প্রত্যয়। তিনি বলেছেন—

> ''আমার বুকে বেঁধানো সমস্ত কাঁটায়
> আমি গুঁজে দিয়েছি
> একটি করে ফুল—তুমি হাসো
> ****
> আমার বুক-ভাসানো সমস্ত কান্নার
> আমি জুড়ে দিয়েছি একটি ক'রে সুর—
> তুমি হাসো গো
> আনন্দ করো।''

কবি অন্তর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সমালোচক বুদ্ধদেব বসু বলেছেন — ''তিনি (সুভাষ মুখোপাধ্যায়) ব্যক্তিবাদের

বিরোধী। তার মুক্তি কামনা একার জন্য নয়, সমগ্র মানুষ সমাজেরই জন্য। সাম্য ও সংহতি ছাড়া মুক্তির অন্য কোনো সংজ্ঞার্থ তাঁর মনে নেই।"

৬.৫ সুকান্ত ভট্টাচার্য

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯২৬ খ্রিঃ। পিতা নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য। মা-সুনীতি দেবী। সুকান্ত পিতা-মাতার দ্বিতীয় সন্তান। ভট্টাচার্য পরিবারের আদি নিবাস ছিল অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়ায়। পরে এই পরিবারের আদি কলকাতায় চলে আসেন। ছাত্রজীবনে মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও নিদারুণ দারিদ্র্যের চাপে পড়াশুনার মনোযোগী হবার সুযোগ পাননি। ১৯৪৫ খ্রিঃ বেলেঘাটার দেশবন্ধু স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু অসুস্থতা আর আর্থিক অনটনের কারণে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কলেজে পড়ার সময় কবিরূপে বন্ধুদের মধ্যে সুকান্ত বিশেষভাবে পরিচিত হন। তিনি কলেজের বোর্ডে কবিতা লিখে নিজের কবি-প্রতিভার প্রাথমিক পরিচয় রেখেছিলেন। চৌদ্দ বছর বয়স থেকে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথকে আদর্শ হিসাবে রেখে কাব্যচর্চা শুরু করেছিলেন সুকান্ত। সে সময় ভাবে-ভাবনায়-ছন্দে তিনি একান্ত ভাবেই রবীন্দ্রানুরাগী।

যৌবন প্রারম্ভ থেকেই সুকান্তর কবি-ভাবনার দিক পরিবর্তন ঘটে। তিনি আকৃষ্ট হন নজরুল, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদের কবিতার প্রতি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে এসে সুকান্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রাত্যহিক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়েন। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে পরিচিত সুকান্তর ওপর দায়িত্ব পড়ে 'স্বাধীনতা' পত্রিকার 'কিশোর সভা'র দায়িত্ব। ১৯৪৫-৪৬ সালের একটা বিরাট সময় জুড়ে ব্যাপক গণআন্দোলনে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ সৈনিক। জনমানসে প্রতিবাদী চেতনা, বৈপ্লবিক ভাবনা জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নিরলস কর্মী। আদর্শকে বাস্তবরূপ দানের জন্যই সুকান্তর নিরলস, একাগ্র সাধনা। পরিশ্রমের অতিরিক্ত চাপে তিনি কঠিন ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে যাদবপুর কুমুদশংকর রায় টি.বি. হাসপাতালে ভর্তি হন। ১৯৪৭ খ্রিঃ (১৩৫৪ সালের ২৯শে বৈশাখ) তিনি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সুকান্ত ভট্টাচার্য জীবৎকালে তাঁর কোনো কাব্যের প্রকাশ দেখে যেতে পারেননি। যদিও কবিরূপে তখন তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। অসুস্থ অবস্থায় তাঁর 'ছাড়পত্র' আর 'ঘুম নেই' এই দুটি কবিতার বই-এর ছাপার কাজ শুরু হয়েছিল। তাঁর সবকটি কাব্যগ্রন্থই প্রকাশিত হয় মৃত্যুর পর। 'ছাড়পত্র' (১৯৪৭), 'ঘুম নেই' (১৯৫০), 'পূর্বাভাস' (১৯৫০) 'মিঠেকড়া' (১৯৫১)। এছাড়া তার আরও দুটি গ্রন্থ 'গীতগুচ্ছ' ছড়াও গানের সংগ্রহ এবং 'অভিযান' বিভিন্ন রচনার সংকলন পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

দরিদ্র পরিবারে সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম। নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে তাঁর শৈশব, কৈশোর। অভাব ছিল আমৃত্যু কবির একান্ত সঙ্গী। সুকান্তর তপস্যা ছিল একটা সুস্থ, স্বচ্ছন্দ সমাজ গড়ে তোলা। যেখানে মানুষের সাধারণ আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি পূর্ণতা পাবে। অভাব, অনটন, দারিদ্র্য থেকে মানুষ মুক্তি পাবে। এজন্য তাঁর নিরলস সংগ্রাম সাধনা শুরু হয়েছিল কিন্তু তাঁর সে স্বপ্ন পূর্ণতা পায়নি। হতাশা, গ্লানি আর নিদারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যে এই কিশোর কবি চির বিদায় নিয়েছেন।

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম ছিলেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের আদর্শ। নজরুলের বিপ্লব ভাবনা, প্রবল প্রতিবাদী মানসিকতা,অত্যাচারিত নির্যাতিত মানুষের সপক্ষে উচ্চকণ্ঠ সহমর্মিতা সুকান্তকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল।

সুকান্তর কবিতাও সমাজ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে মুখর। কৈশোরের প্রারম্ভ লগ্ন থেকেই তাঁর অগ্নিক্ষরা প্রতিবাদী উচ্চারণে বাঙালি পাঠক পেয়েছিল তাঁদের প্রিয় কবিকে। দরিদ্র মানুষ পেয়েছিল তাদের সমব্যথী, সহমর্মী বন্ধুকে। আমৃত্যু তাঁর কবিতা-গানে শোনা গেছে সাম্যের সুর। বাংলা সাহিত্যে তিনি যথার্থই কিংবদন্তী। 'কালরাত্রির' বৃন্ত থেকে 'প্রস্ফুটিত সকাল' ছিনিয়ে আনাই ছিল তাঁর কাব্যসাধনার চূড়ান্ত লক্ষ্য। কবির ভালোবাসা ছিল সর্বত্রগামী। রবীন্দ্রনাথ যে যথার্থ, মানুষের কবির জন্য প্রতীক্ষা করেছিলেন, সুকান্তই সম্ভবত সেই কবি। প্রবল সম্ভাবনার অকাল বিদায়ে বাংলা হারিয়েছে একজন সত্যিকার মানবতাবাদী কবিকে।

সাম্যবাদী ভাবনাই ছিল সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের কাব্য ভাবনার প্রেরণা। দারিদ্র্যই তাঁর কবি-মননে উৎস। এই সাম্যবাদী ভাবনার সঙ্গে মিশেছিল মানবপ্রেমের আদর্শ। সমকালীন অন্যান্য কবিদের রবীন্দ্র-বিরোধিতা থেকে সরে এসে রবীন্দ্রনাথকে তিনি বসিয়েছিলেন অকৃত্রিম শ্রদ্ধার আসনে। তাঁর কাব্যকে মহৎ কাব্যের অভিধা দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন—

মনের গভীর অন্ধকারে তোমার সৃষ্টিরা থাকে জেগে।
তবুও ক্ষুধিত দিন ক্রমশ সাম্রাজ্য গড়ে তোলে,
গোপনে লাঞ্ছিত হই হানাদারী মৃত্যুর কবলে,
যদিও রক্তাক্ত দিন, তবু দৃপ্ত তোমার সৃষ্টিকে
এখনো প্রতিষ্ঠা করি আমার এ মনের দিকে দিকে।

নজরুলের মতো সুকান্তও স্বার্থপর, মুনাফালোভী, সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধে সতর্কবাদী উচ্চারণ করেছেন। সাধারণ মানুষের প্রবল প্রতিবাদের আগুনে একদিন এরা ধ্বংস হবেই এমন ভবিষ্যৎবাণী দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন কবি সুকান্ত। প্রতিবাদী মানুষের সংগ্রামী মিছিলকে কোনো শক্তিই রোধ করতে পারবে না। কবির কণ্ঠে শোনা গেছে চূড়ান্ত শপথ—

আদিম হিংস্র মানবিকতার আমি যদি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই।

ক্ষুধার অন্নই যে দরিদ্র মানুষের কাছে চূড়ান্ত প্রার্থিত এবং শেষে সত্য সে কথা উচ্চারিত হয়েছে কবি সুকান্তর কণ্ঠে। রুটির বিনিময়ে কবি সৌন্দর্যের আধার চাঁদ এবং কবিতার সুললিত ফলকেও বিসর্জন দেবার কথা বলেছেন। কবি তাই বলেছেন—

কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়ঃ
পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন সুকান্ত। সে পৃথিবী হবে শোষণ মুক্ত। সব মানুষ সেখানে সত্যিকার মানুষের পরিচয় পাবে। দুঃখের রাত্রি শেষে নতুন প্রভাতের প্রতীক্ষার স্বপ্নে ভরে ছিল তাঁর চোখ। তিনি বলেছেন—

চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,

এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

কবি সুকান্ত যে রাজনীতির আদর্শে বিশ্বাস করতেন সেই আদর্শের বাণীই উচ্চারিত হয়েছে তাঁর কবিতায়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, আদর্শভাবনা এবং কবিতা একই বিশ্বাসের উৎস-জাত। একটিকে অন্যটি থেকে পৃথক করা যায় না। অনুজ কবি সুকান্তর কবিতার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছিলেন— ''সুকান্তর কবিতা শুধুই বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত নয়, তাতে আছে মহৎ পরিণতির সুস্পষ্ট পদধ্বনি।''

জাতীয়চেতনা সুকান্তর কবিতার বিশিষ্ট দিক। স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ কবি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন—

তাইতো এখানে আজ ঘনিষ্ঠ স্বপ্নের কাছাকাছি,
মনে হয় শুধু তোমারই মধ্যে আমরা যে বেঁচে আছি—
তোমাকে পেয়েছি অনেক মৃত্যু-উত্তরণের শেষে,
তোমাকে গড়ব প্রাচীর, ধ্বংস-বিকীর্ণ এই দেশে।
দিক্‌দিগন্তে প্রসারিত হাতে তুমি যে পাঠালে ডাক,
তাইতো আজকে গ্রামে ও নগরে স্পন্দিত লাখে লাখ।

('মহাত্মাজীর প্রতি'— 'ঘুম নেই'')

৬.৬ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা কাব্যের অন্যতম প্রতিবাদী কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'বীরেন্দ্র সমগ্র'-র (প্রথম খণ্ডের) সূচনা অংশে কবি শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন— ''সমস্ত অর্থেই বাংলার সবচেয়ে প্রতিবাদী এই কবি, তাঁর কবিতা যেন আমাদের সামনে একটা সম্পূর্ণ ইতিহাস তুলে ধরে, আমাদের হৃদয়ের ইতিহাস আর আমাদের সময়ের ইতিহাস।'' বিশ শতকের চল্লিশের দশকের কবিদের মধ্যে সম্ভবত তিনিই সবচেয়ে বেশি সময় সচেতন, সমাজ সচেতন। সাম্যবাদী কবির কাব্যে বিশ্বের সমস্ত নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, নির্যাতিত মানুষের জন্য সমব্যথিত্বের, সমভ্রাতৃত্বের বাণী উচ্চারিত হয়েছে। অন্নই মানুষের জীবনের শেষ সত্য, অন্নই ঈশ্বর, এই অন্ন যারা কেড়ে নেয় ক্ষমাহীন কণ্ঠে কবি বীরেন্দ্র তাদের ধ্বংস কামনা করেছেন।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বেজগাঁও গ্রামে ১৯২০ খ্রিঃ ২ সেপ্টেম্বর, রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে। পিতা হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মা সুরবালা দেবী। তাঁর জন্মের পরই তাঁরা সপরিবারে কলকাতা চলে আসেন। ১৯৩০ সালের নিকটবর্তী সময়ে ঢাকুরিয়া অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। শিক্ষা শুরু হয় জগবন্ধু ইনস্টিটিউশনে, পরে রিপন স্কুল এবং রিপন কলেজে। কলেজে তিনি অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসু এবং বিষ্ণু দে-র সান্নিধ্য লাভ করেন। ১৯৩৯-৪০ সালে রিপন কলেজের বাৎসরিক ম্যাগাজিনে কবিরূপে বীরেন্দ্র প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৪২-এ তাঁর প্রথম কাব্য 'গৃহচ্যুত'' প্রকাশিত হয়।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ— 'গৃহচ্যুত' (১৯৪২), 'রাণুর জন্য' (১৯৫২) 'উলুখড়ের কবিতা' (১৯৫৪), 'মৃত্যুত্তীর্ণ '(১৯৫৫), 'লখিন্দর' (১৯৫৮), 'মুখে যদি রক্ত ওঠে' (১৯৬৪), 'ভিসা অফিসের সামনে'

(১৯৬৪), 'মহাদেবের দুয়ার' (১৯৬৪), 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৭০), 'মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহলাদে চিৎকার করে' (১৯৭২), 'জ্বলুক সহস্র চিতা অহোরাত্র এ পাড়ায় ও পাড়ায়' (১৯৭৪), 'মানুষ খেকো বাঘেরা বড় লাফায়' (১৯৭৫), 'বেঁচে থাকার কবিতা' (১৯৭৭), 'আর এক আরম্ভের জন্য' (১৯৮১), 'অফুরন্ত জীবনের মিছিল (১৯৮৫) ইত্যাদি।

৬.৭ সারাংশ

এখানকার আলোচ্য চারজন কবিই সাম্যবাদে বিশ্বাসী একই ঘরানার। তবে সমর সেনের শিক্ষিত মন আধুনিক প্রগতিশীলতায় ভরসা রাখতে পারেনি। মধ্যবিত্ত জীবনভাবনা, ব্যক্তিজীবনের আচার-আচরণের ছাপ পড়েছে তাঁর কবিতায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রেমের কবিতা লিখে তাঁর কাব্যজীবন শুরু করেন নি। বামপন্থায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকেও শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে সরে আসেন। তবে মানুষের জীবন যন্ত্রণার কথা প্রতি পরতে ফুটে উঠেছে তাঁর রচনায়। অল্পদিন কাব্যজগতে বিচরণ করেছেন সুকান্ত ভট্টাচার্য, কিন্তু এর মধ্যেই সৃষ্টিশক্তির অভাবনীয় পরিচয় রেখে গেছেন তিনি। খুব বেশি রচনা তিনি করেন নি ঠিকই, কিন্তু এই স্বল্প রচনার মাধ্যমে কবি-জীবনে তিনি বিশেষ কীর্তি স্থাপন করে পাঠকদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছেন। সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়রা কবিতায় জনগণের কথা বললেও তাঁরা জনতার কবি হয়ে উঠতে পারেন নি। তবে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিতায় যেমন সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন, তেমনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশেছেনও। যেটুকু পারেন নি, তার জন্য দায়ী করেছেন সমাজ ব্যবস্থাকে।

৬.৮ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) সমর সেন আধুনিক কবিদের মধ্যে ব্যতিক্রমী ভাবনার কবি— আলোচনা করুন।

২) সময়ের দলিল হিসাবে সমর সেনের কবিতার স্বতন্ত্র মূল্য কতখানি তা নিরূপণ করুন।

৩) সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবি বৈশিষ্ট্য দেখান।

৪) সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার একটি বড়ো অংশ জুড়ে আছে দীন-দরিদ্র, সর্বহারা মানুষ এবং শ্রমিক-কৃষকদের কথা— উক্তিটির সত্যতা নিরূপণ করুন।

৫) কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্য-বৈশিষ্ট্য দেখান।

৬) সাম্যবাদী ভাবনাই ছিল সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্য-ভাবনার প্রেরণা— আলোচনা করুন।

৭) বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) সমর সেনের কবিতা রচনার সময়কাল উল্লেখ করুন।

২) সমর সেনের কাব্য ও কবিতার সংখ্যা লিখুন।

৩) সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম রচনার নাম ও সেটি কী জাতীয় রচনা?

৪) সুভাষ মুখোপাধ্যায় কারারুদ্ধ হয়েছিলেন কেন?

৫) সুকান্ত ভট্টাচার্য 'স্বাধীনতা' পত্রিকার কোন্ দায়িত্ব পালন করতেন?

৬) সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্যগ্রন্থগুলি কখন প্রকাশিত হয়?

৭) কবিরূপে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আত্মপ্রকাশ কীভাবে হয় লিখুন।

৬.৯ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৫ম খণ্ড)—সুকুমার সেন।

২) বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস — ক্ষেত্র গুপ্ত।

৩) আধুনিক বাংলা কবিতা— বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত।

৪) কালের পুতুল— বুদ্ধদেব বসু।

৫) আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়— দীপ্তি ত্রিপাঠী।

৬) আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা— বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়।

৭) কবিতার কালান্তর— সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

একক-৭ ❑ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং কবিতা সিংহ

গঠন

৭.১ উদ্দেশ্য
৭.২ প্রস্তাবনা
৭.৩ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
৭.৪ শক্তি চট্টোপাধ্যায়
৭.৫ কবিতা সিংহ
৭.৬ সারাংশ
৭.৭ অনুশীলনী
৭.৮ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের আধুনিক কালের কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং কবিতা সিংহ সম্পর্কে এবং তাঁদের কবিতা সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে অবহিত করা। এই তিনজনের মধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা স্বীকারোক্তিমূলক। সুনীলের মতে মানবজীবনের দুঃখের মধ্যেই কবিতা গড়ে ওঠে। কবিরা কীভাবে সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলেন সে কথা কবিতায় জানিয়েছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। বোহেমিয়ান কবি ছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। হাংরি কাব্য-আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। জীবনের মধ্যে জীবনের বৈচিত্র্য অনুসন্ধান করাই ছিল তাঁর অভীষ্ট। প্রেমের বৈচিত্র্যের কথা আছে তার কবিতায়। আধুনিক বাংলা কবিতার ধারায় একজন নারীবাদী কবি হিসাবে কবিতা সিংহের পরিচিতি। তরে তাঁর সম্পর্কে এই অভিধা সর্বাংশে সত্য নয়। তিনি নারীর যন্ত্রণার কথা বললেও পুরুষকে কখনও কাঠগড়ায় দাঁড় করান নি। ক্রোধ ও প্রতিবাদ তাঁর কবিতা লেখার উৎস। নারীবাদী হলেও তিনি কল্যাণময়ী ছিলেন।

৭.২ প্রস্তাবনা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা যেন তাঁর নিজের কথা। প্রত্যেকটা মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার কথা। 'শুধু কবিতা'র জন্য আমি অমরত্ব তাচ্ছিল্য করেছি' যেমন বলেন, তেমনি অন্যান্য কবিদের পরিচিতির জন্য এক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলেন কবিতার সংগঠন 'কৃত্তিবাস' নামক পত্রিকা। এখানেই তিনি কবি-মানুষ। বাংলা ভাষায় লিখেছেন এবং অন্যান্য অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা। কঠিন বাস্তবকে মাথায় রেখে তাঁর কবিতা লেখা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায় তাঁর মধ্যে। কখনও বা ঘুরে দাঁড়াতে চেয়েছেন। প্রেমের বৈচিত্র্য আছে তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতায় নিজস্বতা বেশি। কবিতা সিংহ আধুনিক কাব্যভাষায় নিপীড়িত, নিগৃহীতা নারীদের

কথা দ্ব্যর্থভাবে বলতে চেষ্টা করেছেন। জীবনকে তিনি অত্যন্ত কাছের থেকে দেখেছেন। মেয়েদের পক্ষ নিয়ে অত্যন্ত জোরালো লেখা লিখতেন নিয়মিত।

৭.৩ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ২১ ভাদ্র ১৩৪১ (৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪), অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার মাইজপাড়া গ্রামে। পিতা কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়। মা মীরা দেবী। কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন কলকাতার টাউন স্কুলের শিক্ষক। ১৯৩৮ সাল থেকে কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় উত্তর কলকাতার বাসিন্দা। টাউন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে প্রথমে দমদম মতিঝিল কলেজ এবং পরে সিটি কলেজে ভর্তি হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এম.এ পাশ করেন। ১৯৫০ খ্রিঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতা 'একটি চিঠি'' প্রকাশিত হয় 'দেশ' পত্রিকায়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'একা এবং কয়েকজন' প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ খ্রিঃ। ১৯৭০ সালে আনন্দবাজার পত্রিকার বার্তা বিভাগে চাকুরিতে যোগ দেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'বঙ্কিম পুরস্কার' পান ১৯৮৩ খ্রিঃ, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার ১৯৮৫ খ্রিঃ। তিনি আনন্দ পুরস্কারও পেয়েছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় দু'শো। তিনি 'নীললোহিত', 'নীল উপাধ্যায়'ও 'সনাতন পাঠক' ছদ্মনামেও অনেক লেখা লিখেছেন।

১৩৭৯ বঙ্গাব্দের 'দেশ সাহিত্য সংখ্যায়' 'কবিতার সুখ দুঃখ' শীর্ষক লেখায় নিজের কবিতা লেখার বিষয়ে তিনি বলেছেন 'একটি চিঠি' তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা। এক স্বপনচারিনী বালিকার কথা মনে করে এ কবিতা তিনি লিখেছেন। নায়িকার নাম বলাকা। 'বলাকা তোমার শুভ্র চোখেতে পায়নি ঘুম?'— এটি কবিতার প্রারম্ভ ছত্র। এই কবিতার মাধ্যমেই সুনীলের কাব্য জগতে পদসঞ্চার। এই 'বলাকা' ই সম্ভবত পরবর্তিতে কবির মানস-প্রিয়া নীরা। নীরাকে উদ্দেশ্য করে তিনি অসংখ্য কবিতা লিখেছেন। নীরার মধ্যে তিনি খুঁজেছেন চিরন্তন নারীকে। 'নীরা তোমার কাছে' কবিতায় কবি বলেছেন—

> ''নীরা, তোমার দেখি আমি সারা বছর মাত্র দু-দিন
> দোল ও সরস্বতী পুজোয়—দুটোই খুব রঙের দিন।
> রঙের মধ্যে ফুলের মধ্যে সারা বছর মাত্র দু-দিন ও দুটো
> দিন তুমি আলাদা, ও দু-টো দিন তুমি যেন অন্য নীরা।''

নীরা কবির কাছাকাছির, আবার দূরেরও ; স্বপ্নের জগতে, স্মৃতির জগতে তার অবিরাম আসা যাওয়া। 'এক সন্ধেবেলা আমি' কবিতার নীরাকে উদ্দেশ্য করে কবি বলেছেন—

> নীরা তুমি অমন সুন্দর মুখে তিনশ জানালা
> খুলে হেসেছিলে, দিগন্তের মতন কপালে বাঁকা টিপ,
> চোখে কাজল ছিল কি? না, ছিল না
> বাসস্টপে তিন মিনিট, অথচ কাল স্বপ্নে বহুক্ষণ।

নীরা জড়িয়ে আছে কবির সমস্ত অস্তিত্বের সঙ্গে। তার সঙ্গে কবির পথ চলা তো জন্মান্তরের। 'নীরাকে দেখা' কবিতায় কবি বলেছেন—

> আমার দূরত্ব সহ্য হয় না, নীরা, ঝড়ের রাত্রির মতো

কাছে এসো
যেমন নদীর গর্ভে গুমরে ওঠে নিদাঘের তোপ
প্রতিটি শিমূল বৃক্ষ সর্বাঙ্গে আগুন মেখে যেমন অস্থির
আমি প্রতীক্ষায় আছি।

এবং

আমাদের ছিল প্রতিদিন জন্ম বদলের দিন।
আকাশে ভাঙা কাচের টুকরোর মতন আলো
বিপরীত দিগন্ত থেকে প্রবাসিনীর মতন দ্বিধান্বিত পায়ে
এগিয়ে এলে তুমি
সমস্ত শরীরময় শ্বেত হংসীর পালক, গলায় গুঞ্জা ফুলের মালা।
আমি ভয় পেয়েছিলুম
****
নীরা, আমাদের আরও অনেক দূর যেতে হবে, হারিয়ে যেওনা
অনেক জন্ম বদল বাকি আছে, হারিয়ে যেওনা।
নীরা, অমৃত খুকী, হারিয়ে যাস নি।

(নীরা, হারিয়ে যেওনা)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সময়ের কবি। চলমান সময় তাঁর কাব্যে ছায়া ফেলেছে। তার সঙ্গে মিশেছে রোমান্টিক কবি মননের রহস্যময়তা। সময়কে ছুঁয়ে তাঁর কবিতা কখনো হারিয়ে যায় ফেলে আসা অতীতের ধূসর বর্ণময়তায়, আবার কখনো ভবিষ্যৎ জন্ম থেকে জন্মান্তরের সুদূরাভিসারে। ভালোবাসা সঙ্গে নিয়েই কবির পথচলা, ভালোবাসাকে ঘিরেই তাঁর বেঁচে থাকা, ভালোবাসার মেঘে ভেসেই অনন্ত পথের অভিযাত্রী তিনি। তাই কবি বলেন—

তবুও আমার জন্ম-কবচ, ভালোবাসাকে ভালোবেসেছি
আমার কোনো ভয় হয় না,
আমার ভালোবাসা কোনো জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না।

(জন্ম হয় না মৃত্যু হয় না)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল 'একা এবং কয়েকজন' (১৯৫৭), 'আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি' (১৯৬৫), 'বন্দি জেগে আছো' (১৯৬৮), 'আমার স্বপ্ন' (১৯৭২), 'সোনার মুকুট থেকে' (১৯৮২), 'স্মৃতির শহর' (১৯৮৩), 'বাতাসে কীসের ডাক শোনে' (১৯৮৭), 'চল যাই' (১৯৮৭), 'হঠাৎ নীরার জন্য' (১৯৮৮), 'নীরা হারিয়ে যেও না' (১৯৮৯), 'অন্য আমি' (১৯৯২), 'এ জন্মের দেখাশোনা' (১৯৯৪), 'মন ভালো নেই' (১৯৯৬), 'সেই মুহূর্তে নীরা' (১৯৯৭), 'ভালোবাসা খণ্ড কাব্য' (২০০১) ইত্যাদি।

৭.৪ শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা কবিতার সবচেয়ে ব্যতিক্রমী কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। হাংরি জেনারেশানের কবিরূপেই তাঁর বিপুল পরিচিতি। প্রাত্যহিক জীবনাচরণে তিনি ছিলেন ভীষণভাবে প্রথাবিরোধী। শান্ত নিরুদ্বিগ্ন সাংসারিক বদ্ধতার জীবনে শক্তি চট্টোপাধ্যায় ছিলেন প্রবল প্রতিবাদী। প্রথাবিরোধী, স্বেচ্ছাচারী যাপন ছিল তাঁর সহজাত। কবি যথার্থই ভবঘুরে। তাঁর বন্ধনমুক্ত দুর্নিবার জীবনভাবনা কবিতায় প্রভাব ফেলেছে। সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার 'দেশ' পত্রিকায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণায় বলেছিলেন— ''জীবনানন্দ-পরবর্তী বাংলা কবিতার সবচেয়ে যিনি আকর্ষণীয় তাঁর নাম শক্তি চট্টোপাধ্যায়।— শক্তিদার সঙ্গে সুনীল—সন্দীপনের নাম একসঙ্গে বলা হত। প্রায়ই উধাও হতেন তাঁরা। কখনও চক্রধরপুর, কখনও চাইবাসায়। -... খালাসিটোলা আর বারোদুয়ারি, কলকাতার এই দুই ঠেকে ছিল তাঁদের সান্ধ্য আড্ডা। তারপর হয়তো সারারাত কলকাতার দখল নেওয়া।'' জীবনের অন্য কোনো গভীর অর্থ খোঁজার অভীপ্সার কারণেই কবির এই স্বেচ্ছাচারী আত্মরতি বলে মনে হয়। তবে স্বেচ্ছাচারী জীবনভাবনা তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্য বা কবি বৈশিষ্ট্যের শেষ কথা নয়, তাঁর অন্য মন সংসারকামী— সেখানে তিনি সমস্ত হৃদয় শরীর জুড়ে মেখে নিতে চান মাটি ও সংসারের সোঁদা গন্ধ। তাই কবির কণ্ঠে শোনা গেছে—

> ''পচা ধানের গন্ধ, শ্যাওলার গন্ধ, ডুবো জলে তেচোকা মাছের আঁশ গন্ধ
> সব আমার অন্ধকার অনুভবের ঘরে সারি-সারি তোর ভাঁড়ারের নুন
> মশলার পাত্র হলো মা।'' (জরাসন্ধ)

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩৩ খ্রিঃ ২৬ নভেম্বর দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়। পিতা বামানাথ চট্টোপাধ্যায়, মাতা কমলা দেবী। কবি ছিলেন খুবই মেধাবী ছাত্র। তবে পড়াশোনার চেয়ে হাতের কাজে তাঁর বেশি আগ্রহ ছিল। কলকাতার কাশিমবাজার পলিটেকনিক স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি ভর্তি হন মির্জাপুর সিটি কলেজে। পরে বাংলা অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশুনা করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই কবিতার প্রতি শক্তির আকর্ষণ থাকলেও কথাসাহিত্য ছিল তাঁর প্রথম ভালোবাসা। পরে কবিতা তাঁর অবাধ বিচরণ-ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। সংস্কৃত ভাষায় কবির অসাধারণ দখল ছিল। কবিতার ভাষায় সে কারণেই তিনি অবলীলায় তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন। চারদশক ব্যাপী তাঁর কাব্যচর্চার পথ চলা। বাংলা কবিতার ভাণ্ডার বিচিত্র সৃষ্টিতে তিনি ভরে দিয়েছেন।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতা 'যম' প্রকাশিত হয়েছিল কবি বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায়। দ্বিতীয় কবিতা 'জরাসন্ধ' প্রকাশিত হয়েছিল কবি বিষ্ণু দে সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায়। এরপর নিজের প্রতিভার গুণে তিনি ব্যতিক্রমী পত্রিকা 'কৃত্তিবাস'-এর গুরুত্বপূর্ণ কবিরূপে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বন্ধনহীন জীবনযাপনে অভ্যস্ত। এতেই তাঁর উল্লাস। এই জাতীয় জীবন-দর্শনে প্রভাবিত হওয়ার পেছনে কতগুলি বিষয় অনুঘটকের কাজ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখনীয় হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সার্বিক জীবনযন্ত্রণা, স্বাধীনতা-উত্তর কালে মানুষের স্বপ্নসাধ ভেঙে যাওয়ার প্রবল হতাশা। যুগ-যন্ত্রণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল 'কৃত্তিবাস'-এর কবি-সাহিত্যিকদের নৈরাশ্যবাদী ধ্যান-ধারণা, সর্বোপরি মার্কিন কবি গিন্‌সবার্গের প্রত্যক্ষ প্রভাব— কবির জীবনাচরণে এবং কাব্য-ভাবনায় এর প্রভাব ছিল অনতিক্রমনীয়।

কবি প্রথম পর্যায়ের কিছু কবিতা 'রূপচাঁদ পক্ষী' এই ছদ্মনামে লিখেছিলেন। ১৯৫৬ সালে শক্তি লেখেন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'কুয়োতলা'। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে। এই বছরই প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হে

প্রেম হে নৈঃশব্দ্য'। এ কাব্যের উৎসর্গ অংশে লেখা ছিল— ''প্রিয়তম সুন্দরীতমারে যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার।'' তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধর্মেও আছো জিরাফেও আছো'-র প্রকাশ সময় ১৯৬৫ খ্রিঃ সময় তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল— 'সোনার মাছি খুন করেছি' (১৯৬৭), 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান' (১৯৬৯), 'পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি' (১৯৭১), 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৯৭২), 'প্রভু নষ্ট হয়ে যাই' (১৯৭২), 'সুখে আছি' (১৯৭৪), 'মানুষ বড়ো কাঁদছে' (১৯৭৮), 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো?' (১৯৮২), 'আমাকে জাগাও' (১৯৮৯) ইত্যাদি। 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো' কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি আকাদেমি পুরস্কার পান।

কোনো পিছুটানেই কবি নির্দিষ্ট বৃত্তে জীবনকে বাঁধতে চান না। সব বন্ধন ছিঁড়ে এগিয়ে চলাই তাঁর জীবনের লক্ষ্য। গতিকেই সত্য বলে স্বীকার করে 'যেতে যেতে' কবিতায় কবি বলেছেন—

সব দিকেই যাওয়া চলে
অন্তত যেদিকে গাঁ-গেরাম-গেরস্থালি
পানা পুকুর, শ্যাওলা-দাম, হরিণমারির চর
সব দিকেই যাওয়া চলে
শুধু যেতে যেতে পিছন ফিরে তাকানো যাবে না
তাকালেই চাবুক—
****
যেতে-যেতে এক-একবার পিছন ফিরে তাকাই, আর তখনই চাবুক
তখনই ছেড়ে যাওয়া সব
আগুন লাগলে পোষাক যেভাবে ছাড়ে
তেমন ভাবে ছেড়ে যাওয়া সব
হয়তো তুমি কোনদিন আর ফিরে আসবে না—শুধু যাওয়া—

অবিরাম এই যাত্রার সমাপ্তি ভাবনা সম্ভবত কবিকে মৃত্যু ভাবনায় আচ্ছন্ন করে। কবি জানেন মৃত্যু অনিবার্য, তাই জীবনকে আঁকড়ে ধরে কবি জীবন পরিণামকে অস্বীকার করতে চান না। কবিকণ্ঠে তাই শোনা যায়—

বাসনা যেমন চঞ্চল তার ঠিকানা জানি না
রমণী কখন প্রিয় করে হা রে হৃদয় জানে কি ?
তবু বেশিদিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না।

(চতুরঙ্গ)

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কবিতা 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো?' কবিতায় একদিকে রয়েছে ঘরছাড়া বোহেমিয়ান মনোভাবের দুরন্তটান, অন্যদিকে ঘরের আকর্ষণের নিবিড় অনুরাগ। কবি এই দ্বন্দ্ব, এই টানাপোড়েনের জীবনকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছেন। জীবনের সব জটিলতা, সব ভ্রান্তি, সব অবুঝ ইচ্ছা শেষ করে দেওয়ার চিতাকাঠ যতই শান্তির আহ্বান জানাক না কেন কবি নিজেকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য নিজেকেই প্রশ্ন করেছেন—

যেতে পারি,

যে কোনো দিকেই আমি চলে যেতে পারি।
কিন্তু কেন যাবো?

('যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো?')

শেষ পর্যন্ত সংসার জীবনকেই কবি বরণ করে নিতে চেয়েছেন— এটাকেই জীবনের শেষ সত্যরূপে দেখতে চেয়েছেন। কবি দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছেন— 'সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমো খাবো।' এই কবিতায় কবির কণ্ঠে নিজের কৃতকর্মের জন্য আক্ষেপের সুর শোনা গেছে— ''কখনও তোমার ক'রে তোমাকে ভাবিনি।'' আর 'দাঁড়াও'' কবিতায় কবি মানুষের কথা ভেবেছেন, মানুষেরই মতো করে। তাদের পাশে দাঁড়াবার কথা বলেছেন—

মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষের পাশে দাঁড়াও
****
তোমাকে সেই সকাল থেকে তোমার মতো মনে পড়ছে
সন্ধে হলে মনে পড়ছে, রাতের বেলা মনে পড়ছে
মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।

কবি জানেন, মৃত্যু অনিবার্য। এই সত্য মনে রেখেও কবি অসময়ে চলে যেতে চান না, এখুনি যেতেও চান না-তাই 'এইটুকু তো জীবন' কবিতায় কবি শান্ত কণ্ঠে বলেছেন— 'জীবন ছাড়া, মৃত্যুকে পাবার জন্য তাড়াহুড়োর কোনো / অর্থ হয় না।' জীবনযাপনের যতই ক্লান্তি থাক, তবু বেঁচে থাকাই 'শ্লাঘনীয়'। কোনোভাবে বেঁচে থেকেই পৃথিবীকে প্রণাম জানাতে চেয়েছেন কবি। এই ভাবনার মধ্যে তাঁর জীবনবাদী ভাবনার পরিচয় বড়ো হয়েছে।

৭.৫ কবিতা সিংহ

কবিতা সিংহ আধুনিক বাংলা কাব্যের অন্যতম কবি। তাঁর জন্ম ১৬ অক্টোবর, ১৯৩১, কলকাতার ভবানীপুরে। পিতা শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ। মা অন্নপূর্ণা সিংহ। কৈশোরেই শুরু হয় তাঁর কাব্যচর্চা। ছবি আঁকাতেও তাঁর অনুরাগ ছিল। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে অভিভাবকদের মতের বিরুদ্ধে সহপাঠী গল্পকার-নাট্যকার-কবি বিমল রায়চৌধুরিকে বিয়ে করেন কবিতা। স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে অল্প বয়সেই শুরু হয় তাঁর জীবনসংগ্রাম। অমৃতবাজার পত্রিকায় কলমচি হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু। তিনি আকাশবাণীর 'শ্রবণী' অনুষ্ঠানের প্রোডিউসার হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন।

পাঁচের দশকে বন্ধুদের প্রেরণায় কবিতা কাব্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন কবিতা। তিনি ছিলেন 'কৃত্তিবাস'-এর নিয়মিত কবি। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তার বিচরণ। কবিতা, গল্প, উপন্যাস নিয়ে তাঁর লেখা গ্রন্থের সংখ্যা চল্লিশের বেশি। কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা চার। নিজের লেখার অন্তর্ভাবনা সম্পর্কে কবিতা সিংহ বলেছেন— ''লেখালেখিতে আমি সচেতন ভাবেই বলুন বা অবচেতন ভাবেই বলুন বক্তব্যে বিশ্বাস করি। লেখার আনন্দে লেখা।''

পাঁচের দশকের একজন যথার্থ আত্মমগ্ন কবি কবিতা সিংহ। কবিরূপেই বাংলা সাহিত্যে তাঁর পরিচিতি এবং প্রতিষ্ঠা। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু, ভাষা, প্রকাশরীতি স্বতন্ত্র। কবিতা সিংহের কাব্যগ্রন্থগুলি হল— 'সহজ সুন্দরী' (১৯৬৫), 'কবিতা পরমেশ্বরী' (১৯৭৬), 'হরিণা বৈরী' (১৯৮৫), 'বিমল হাওয়ার হাত ধরে'। ১৯৮৭-তে প্রকাশিত হয় 'কবিতা সিংহের শ্রেষ্ঠ কবিতা'।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে কবিতা সিংহের কবিতায় শোনা গেছে প্রতিবাদের সুর—কখনো শ্লেষ এবং

ঘৃণাও। 'সহজ সুন্দরী' কাব্যের 'না' কবিতায় জ্বলন্ত কণ্ঠে কবি বলেন—

না, আমি হবো না মোম
আমাকে জ্বালিয়ে ঘরে তুমি লিখবে না।
হবো না শিমুল শস্য সোনালী নরম
বালিশের কবোষ্ণ গরম।
কবিতা লেখার পরে বুকে শুয়ে ঘুমোতে দেবনা।
আমার কবন্ধ দেহ ভোগ করে তুমি তৃপ্ত মুখ;
* * * * * * * *
লোনা জল ঝাপসা করে চুপিসারে চোখের ঝিনুক।

'কবিতা পরমেশ্বরী' কাব্যের 'দেহ' কবিতাতেও এই বিদ্রোহের উচ্চারণ—

কি নেবে দেহের থেকে? মাংস মেদ বসা?
প্রাগৈতিহাসিক অগ্নি? পোড়া মাংসের ঘ্রাণ, রক্ত-পানীয়
নখ দাঁত চুল কিংবা অন্নপাত্র দিব্য করোটি ?
অথবা কি নিষ্কাশন করে নেবে প্রতিভা ও মেশিনের মিশ্র কুশলতা ?
অথবা জাদুর টুপি যেভাবে ওড়ায় লক্ষ কুন্দ পায়রা
সেভাবে দেহের থেকে চাড় দিয়ে ক্রমাগত খুলে নেবে শিশু।

তাঁর কবিতায় শোনা গেছে পুরুষকে চ্যালেঞ্জের সুর—

যুদ্ধরীতি পাল্টানোর কোনো প্রয়োজন নেই
তাই করমর্দনের জন্য
হাত বাড়াবেন না।
আমার করতলে কোনো অলিভ চিক্কণ কোমলতা নেই।

('অপমানের জন্য ফিরে আসি', 'বিমল হাওয়ার হাত ধরে')

কবিতা সিংহের লেখনী সোচ্চার ছিল কন্যাভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধে। এই নির্মম পাশবিক ঘটনা হয়ে ওঠে তাঁর কবিতার বিষয়। কবিতায় এই অনাচার সম্বন্ধে ঝলসে ওঠে তাঁর তাচ্ছিল্য আর ব্যঙ্গ—

আমরা ভ্রূণ না ভ্রূণা
জন্ম দিও না মা।
মা আমার জেনেশুনে কখনো উদরে
ধরো না এ বৃথা মাংস
অযাচিত কখনো ধরো না।

('ভ্রূণা', কাব্যনাটক)

একজন সংবেদনশীল কবির সামাজিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অস্ত্র তাঁর কবিতা। কবিতা সিংহ তাঁর কবিতায় তাই করেছেন।

৭.৬ সারাংশ

কবিতায় মানুষের জীবনবোধ গড়ে ওঠে। তার মধ্যে প্রকাশ পায় শিল্পরূপ। কবিতায় নিজের কথা বললেও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে জীবনকে কেউ উপভোগ করতে পারে না। তাই কবির 'মন ভালো নেই' বলা। আধুনিক জীবন-ভাবনার জটিল পরিণতি সুনীলের কবিতায়। তবুও তার মধ্যে 'নীরা'-কে আপন করে পাওয়ার কোনো ঘাটতি নেই। শক্তি চট্টোপাধ্যায় পাঠকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি। কিন্তু তাঁর ছিল বেহিসাবী জীবন। তা সত্ত্বেও তাঁর সৃষ্টিশক্তি কখনো বিঘ্নিত হয়নি। বিদ্রোহ, বিশ্বাসহীনতা তাঁর কবিতার মর্মে ও মজ্জায়। তবুও মানুষ ও জীবনের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ব্যক্ত হয়েছে কবিতায়। পঞ্চাশের দশকের একজন বিশিষ্ট সাহিত্য ব্যক্তিত্ব কবিতা সিংহ। গল্প, উপন্যাস লিখলেও তাঁর প্রধান পরিচয় কবি হিসাবে। একজন উচ্চমানের কবি হিসাবে যতটা স্বীকৃতি পাওয়া তাঁর উচিত ছিল, তা তিনি পাননি। তবে কবিতায় তাঁর গুণপনা অবিস্মরণীয়।

৭.৭ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিমনের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করুন।

২) শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ব্যতিক্রমী ভাবনার দিকগুলি দেখান।

৩) প্রতিবাদী কবি হিসাবে কবিতা সিংহের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতার নাম লিখুন।

২) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কী কী ছদ্মনামে লিখতেন।

৩) কাকে উদ্দেশ্য করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অসংখ্য কবিতা লিখেছিলেন?

৪) শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রথম জীবনে কী ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন?

৫) শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতার নাম কী? সেটি কোন্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল?

৬) কবিতা সিংহের প্রথম লেখা কোন্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

৭) 'হরিণা বৈরী', 'সহজ সুন্দরী' নাম দুটি কবিতা সিংহ কোথা থেকে নিয়েছিলেন?

৭.৮ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস — ক্ষেত্র গুপ্ত।

২) আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়— দীপ্তি ত্রিপাঠী।

৩) আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা— বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়।

৪) কবিতার কালান্তর— সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মডিউল-২
নাটক ও নাট্যকার

একক-৮ ❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গঠন

৮.১. উদ্দেশ্য
৮.২ প্রস্তাবনা
৮.৩ নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৮.৪ সারাংশ
৮.৫ অনুশীলনী
৮.৬ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবেন—

- আধুনিক বাংলা নাটকের গতিপ্রকৃতি,
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নাটকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ,
- রবীন্দ্রনাথের রচিত নাটকগুলির শ্রেণিবিভাজন এবং বিভাজনগুলির পরিচয়,
- রবীন্দ্রনাথের রচিত নাটকের আধুনিকতা কোন্ ধরনের?
- জানতে পারবেন গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র নাটক রচনার ধারা।

৮.২ প্রস্তাবনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে রবীন্দ্র প্রতিভার বিকাশ শুরু হতে থাকে। বিংশ শতাব্দীতে এসে ঘটে তার পরিপূর্ণ বিকাশ। নাটকের পাশাপাশি কাব্য, কথা সাহিত্য, প্রবন্ধ, গীতরচনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। এই সময়ের নাটকগুলিতে নাট্যকারের ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছে। গীতিধর্মিতা, তত্ত্বপ্রাধান্য, প্রচলিত ধারার নাটক, রূপক ও সাংকেতিক নাটক সবক্ষেত্রেই নাট্যকাহিনির ধারায় এক বিশেষ ধরনের চিন্তন লক্ষ করা গেছে। নাট্যকারের অন্তর্গূঢ় বাণী নাটকগুলিতে প্রাধান্য পায়। রবীন্দ্রনাথের সমকালে সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক যে সমস্ত নাটকের ধারা প্রচলিত ছিল, তা থেকে সরে এসে তিনি ভিন্নধর্মী নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন। এই জাতীয় নাটক পাঠক সবক্ষেত্রে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি। তবুও তাঁর নাট্যসাহিত্যের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আজও নাট্যসাহিত্যে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছেন।

৮.৩ নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাটক একটি ভিন্ন চরিত্রের সাহিত্য মাধ্যম। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো নাটক নিজে স্বয়ং সম্পূর্ণ শিল্পরূপ

নয়। ব্যতিক্রমী দু-একটি নাটকের কথা বাদ দিয়ে বলা যায়,নাটকের পূর্ণাঙ্গতা মঞ্চে —মঞ্চায়নে। এই জন্য নাট্যসাহিত্য উদ্ভব ও বিকাশের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে রঙ্গমঞ্চ তথা থিয়েটারের পথচলার সঙ্গে। বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রেও সমানভাবে সত্য।এই কারণে দেখি,উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা নাটকে যে পথচলা শুরু হয় তার বাহ্যিকতায় পাশ্চাত্য নাট্যকলা নানাভাবে এসে পড়ে। মধুসূদন খুব সচেতন ভাবে পাশ্চাত্য নাটকের টেকনিক বাংলা নাটকে প্রয়োগের চেষ্টা করেন।পরবর্তীকালে দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্রের নাট্যচর্চায় প্রাচ্য নাট্যকলা বা চিন্তাচেতনার সঙ্গে দ্বান্দ্বিক সহাবস্থানে বিরাজ করেছে পাশ্চাত্য নাট্যকলা অন্তত নাটকের বহিরঙ্গে।এই সময়ের নাটকগুলি একই সঙ্গে যুগের চাহিদাকে একরকম মান্যতা দিয়েছে বলা যায়। অর্থাৎ এপর্যন্ত যে বাংলা নাটকের ধারা তা কোনো না কোনো ভাবে যুগের ফসল। রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাটককে ঠিক এভাবে দেখতে চাইলেন না। তিনি চাইলেন রূপে স্বরূপে যথার্থ 'বাংলা'নাটক— বাঙালির নাটক। নিছক বিনোদন নয়, বক্তব্য সর্বস্ব নয় অথচ পরিশীলিত, পরিমার্জিত, মননশীল এক উচ্চাঙ্গের শিল্পরূপ।

কবিতার মতোই নাটকের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক বালক বয়সে। এই বয়সেই তিনি রচনা করেন তাঁর প্রথম নাট্যরচনা 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়'(১৮৭৩)। গৃহশিক্ষকের কাছে নিয়েছেন ম্যাকবেথ পাঠ। করেছেন ম্যাকবেথের বাংলা অনুবাদ। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' বা চিতোর আক্রমণ'নাটকের জন্য লিখেছেন 'জ্বল জ্বল চিতা! দ্বিগুণ! দ্বিগুণ!' গান। এপ্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভালো, জোড়াসাকোঁ ঠাকুরবাড়িতে স্বতন্ত্রোজ্জ্বল নাট্য আবহ ছিল। সখের থিয়েটারের যুগে এই ঠাকুরবাড়িতে গড়ে উঠেছিল জোড়াসাকোঁ থিয়েটার (১৮৬৬)। গুণেন্দ্র-গণেন্দ্রের হাত ধরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন ঠাকুরবাড়ি তথা কলকাতার অন্যতম নাট্যপুরুষ। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদেরও ছিল বাড়ির রঙ্গমঞ্চে স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ —অভিনয় ও নানা ভূমিকায়। সখের থিয়েটারের স্থূল বিনোদন নয়, ঠাকুরবাড়ির নাট্যচর্চা প্রকৃতপক্ষে এক সুস্থ, দায়বদ্ধ নাট্য সংস্কৃতি গড়ে তোলে বলা যায়। এই পটভূমিতে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের 'হয়ে-ওঠা'। 'বিদ্বজ্জন সমাগম' উপলক্ষ্যে অভিনীত ১৮৭৭তে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'এমন কর্ম আর করব না' বা 'অলীকবাবু' প্রহসনে অলীকবাবু চরিত্রে অভিনয় করেন রবীন্দ্রনাথ। ১৮৮১ এর আর এক 'বিদ্বজ্জন সমাগমে' মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রনাথের লেখা নাটক 'বাল্মীকিপ্রতিভা'এই বছরেই প্রকাশিত হয় 'রুদ্রচণ্ড'নাটিকা। মৃত্যুর কিছু আগে পর্যন্ত নাট্যচর্চা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৯ এ প্রকাশিত হয় 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য। প্রায় সত্তর বছর তিনি নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। এই সময় কালে তিনি প্রায় ৩৬/৩৭ টির মতো নাটক রচনা করেছেন। এই নাটকগুলি কেউ কালপর্বে ভাগ করে আলোচনা করতে চান, কেউ আবার শ্রেণি ধরে বর্গীকরণ করতে চান। যেভাবেই করা হোক না কেন, এই শ্রেণিকরণের সীমাবদ্ধতা থেকেই যায়। তবু আলোচনার সুবিধার জন্য কয়েকটি ভাগে ভাগ করে রবীন্দ্রনাটকের সাধারণ পরিচয়টি বিস্তৃত করার চেষ্টা করছি।

ক) **গীতিনাট্য** ঃ এই ধারায় রবীন্দ্রনাথের তিনটি রচনাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। রচনা তিনটি হল 'বাল্মীকি প্রতিভা'(১৮৮১), 'কালমৃগয়া'(১৮৮২) এবং 'মায়ার খেলা'(১৮৮৮)। এর মধ্যে গীতিনাট্য হিসেবে উল্লেখযোগ্য রচনা 'বাল্মীকি প্রতিভা'। 'কালমৃগয়া'র বিষয় রাজা দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ। পরে এর বেশ কিছু মিশে যায় 'বাল্মীকি প্রতিভা'তে। 'মায়ার খেলা'তে নাটক কম, গানই বেশি। আর আছে প্রেম সম্পর্কে তত্ত্বানুভূতি। ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও'বাল্মীকি প্রতিভা' রসোত্তীর্ণ রচনা। পরিণত রবীন্দ্রনাথও রচনাটিকে উপেক্ষা করেননি। এই নাটকের সংগীত অনন্য সম্পদ। বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল'এর কিছু প্রভাব এর মধ্যে লক্ষ করা যায়। নাটকে দেখা যায়, বাল্মীকি লক্ষ্মীর অনুগ্রহ না নিয়ে সরস্বতীর কৃপা মাথায় ধারণ করলেন। বাল্মীকি চরিত্রের উত্তরণই এর মূল উপজীব্য।

খ) **কাব্যনাট্য** ঃ এই পর্যায়ে আমরা রাখতে পারি, 'রুদ্রচণ্ড'(১৮৮১), 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'(১৮৮৪), 'রাজা ও

রানি' (১৮৮৯), 'বিসর্জন' (১৮৯০) 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২) এবং 'মালিনী' (১৮৯৬) কে। 'রুদ্রচণ্ড' রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত অক্ষরে প্রকাশিত নাটক। আর একটু পিছন ফিরলে বলা যায়, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে বালক রবীন্দ্রনাথ 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' নামে যে নাট্যকাব্যটি রচনা করেছিলেন, তারই পরিবর্তিত রূপ হল 'রুদ্রচণ্ড'। এখানে ক্রুদ্ধ জ্বালাময় প্রতিহিংসা শেষপর্যন্ত মধুর মমতাময় প্রেমরূপে উৎসারিত হয়েছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাট্যপ্রয়াস, যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। টমসন সাহেবের মতে, এটিই রবীন্দ্রনাথের 'first important drama'.তবে এতে নাটকের চেয়ে বড়ো হয়েছে তত্ত্ব। বলাবাহুল্য এই তত্ত্বটি রবীন্দ্রসাহিত্য তথা জীবনসাধনার প্রধান সুর — সীমা অসীমের মিলন। 'জীবনস্মৃতি'(১৯১২) তে এর ব্যাখ্যা করে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথঃ ''প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনি সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল।''

'রাজা ও রানী' থেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্য একটি অন্য স্তরে প্রবেশ করে। পরবর্তীকালে এটি রূপান্তরিত হয় 'তপতী' নামে। আদর্শায়িত প্রেমের সঙ্গে বাস্তবের দ্বন্দ্ব জনিত বেদনার তীব্র মধুর প্রকাশ আছে 'রাজা ও রানী'তে। ঐতিহাসিক ঘটনার কাঠামোয় এখানে রয়েছে একটি কল্পিত কাহিনি। প্রেমের সীমা-অসীম তত্ত্ব এখানেও রয়েছে। যে প্রেম কামনার সুড়ঙ্গ পথে চলে, ত্যাগ ও নিষ্ঠার রাজপথে বিচরণ করে না, সেই প্রেম শুভ বা মঙ্গলদায়ক নয়, অশান্তি ও অতৃপ্তি তার একমাত্র পরিণাম; ভারতীত্ব-সন্ধানী রবীন্দ্রনাথের এই অন্তরকথা এই নাটকেও শোনা যায়। তবে প্রকাশভঙ্গিতে এই নাটকে গতানুগতিক ধারার ছাপই স্পষ্ট। আছে স্থূল ও রোমান্টিক ঘটনার অবতারণা; যা একান্তভাবে অরাবীন্দ্রিক।

'বিসর্জন'বহু আলোচিত একটি রবীন্দ্রনাটক। বাহ্যত এই নাটক দেবীমন্দিরে জীব বলিদানের বিরোধিতা নিয়ে রচিত। তাত্ত্বিক ভাষ্যে অবশ্য নাটকটি গড়ে উঠেছে প্রেম-প্রতাপের দ্বন্দ্ব নিয়ে। শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে প্রেম। শেক্সপিয়রীয় কাঠামোয় বিন্যস্ত এই নাটকে প্রেমের পক্ষে পাই রাজা গোবিন্দমাণিক্য এবং অপর্ণাকে;অন্যপক্ষে প্রথা ও আচারসর্বস্বতায় আপাদমস্তক বিশ্বাসী রাজপুরোহিত রঘুপতি। দুইয়ের মাঝে দোলাচল জয়সিংহ। তার আত্মবিসর্জন বেদনাবহ; কিন্তু তারই বিনিময়ে এসেছে রঘুপতি চরিত্রের কাঙ্ক্ষিত উত্তরণ। সুতরাং ট্রাজিক হলেও 'বিসর্জন' ট্রাজেডি নয়। রবীন্দ্রনাট্যবোদ্ধা টমসন সাহেবের মতো আমরাও মনে করি, 'বিসর্জন' 'is the greatest drama in Bengali Literature'.

মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে রচিত 'চিত্রাঙ্গদা'তে প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুভবের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণত রবীন্দ্রনাথ প্রেমের দেহীমূর্তি থেকে বিদেহীমূর্তিতে উত্তীর্ণ হন। এখানে রবীন্দ্রনাথের কাছে দেহ সত্য, দেহাতীতও সত্য। অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার প্রেম প্রথমে দেহকে অতিক্রম করেছে; পরে তা দেহাতীতের সন্ধান পেয়েছে। চিত্রাঙ্গদাকে শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ জননীত্বের সম্ভাবনাময় মহীয়সীরূপেই অঙ্কন করেছেন। কিন্তু সমগ্র নাটকে যে বেশি প্রাধান্য লাভ করেছে, সে হল চিত্রাঙ্গদার কামিনী রূপ। 'মালিনী' একটি ক্ষুদ্র নাটিকা। এর মধ্যেও রয়েছে দুটি আদর্শের বিরোধ। গ্রিক ট্রাজেডির মতো এর গঠন সংহত এবং সংযত। কিন্তু রসপরিণামে ট্রাজেডি নয় কোনোভাবেই। কারণ কোলাহল ও হুঙ্কারের শেষে বড়ো হয়ে ওঠে মালিনীর এই বাণী —'মহারাজ ক্ষমো ক্ষেমোঙ্করে'। শতপ্রকার হিংসা-বিদ্বেষ শেষে বড়ো হয়ে ওঠে চিরজয়ী সত্য।

গ) **নাট্যকাব্য** ঃ এগুলিকে যথার্থভাবে নাটক বা নাট্যরচনা বলা যায় না। এগুলি হল নাট্যগুণ সম্পন্ন কাব্য। আসলে 'চিত্রাঙ্গদা' থেকে রবীন্দ্রনাথের নাটকে নাট্যধর্মিতাকে ছাপিয়ে যাচ্ছিল কাব্যধর্মিতা। নাট্যকাব্য সেই শিল্পীমানসের ফসল। কেউ কেউ এগুলিকে বলেছেন 'শ্রুতিনাটকের' মতো। কোনো কোনো সমালোচকের মতে,

এই ধরনের রচনায় নাটক হল উপায় আর কাব্য হল উদ্দেশ্য।এই ধারার রবীন্দ্ররচনার উদাহরণ হল 'বিদায় অভিশাপ', 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' ইত্যাদি।

ঘ) **কৌতুক নাট্য** ঃ এই ধারার উল্লেখযোগ্য রচনা 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২), বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭), 'চিরকুমার সভা' (১৯২৬) এবং 'শেষরক্ষা' (১৯২৮)। 'গোড়ায় গলদ' রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য নাটক তথা প্রহসন। এদিক থেকে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। এর কৌতুকের মূলে রয়েছে একধরনের ভ্রান্তিবিলাস বা comedy of errors. প্রথাগত ধারায় বৈকুণ্ঠের খাতা' উচ্চমানের প্রহসন। বৈকুণ্ঠের খাতা তার নিজের কাছে এত প্রিয় অথচ তাই অন্যের কাছে হাস্যাস্পদ হয়েছে। 'চিরকুমার সভা' হল রবীন্দ্র-উপন্যাস 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'এর পরিমার্জিত নাট্যরূপ। প্রহসনধর্মী এই রচনায় রবীন্দ্রনাথ সংসার-বৈরাগ্য সন্ন্যাসের আদর্শের অন্তর্সারশূন্যতাকে তুলে ধরেছেন কৌতুকের ভঙ্গিতে। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এপ্রসঙ্গে জানিয়েছেনঃ "তিনি সম্ভবত স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়কে পরিহাস করিয়াই প্রহসনখানা রচনা করিয়াছেন।" বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গির বিচারে 'চিরকুমার সভা' শুধু রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যে নয়,বাংলা নাট্য সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নাট্যকর্ম। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ 'গোড়ায় গলদ'কে পরিমার্জিত করে যে নতুন রূপ দান করেন,তাই হল 'শেষরক্ষা'। প্রহসন হিসেবে উচ্চাঙ্গের রচনা।

ঙ) **রূপক-সাংকেতিক বা তত্ত্বনাট্য** ঃ এই অভিনব ধারার শুরু 'শারদোৎসব' (১৯০৮) দিয়ে আর শেষে রয়েছে 'তাসের দেশ' (১৯৩৩)। মাঝে রয়েছে 'রাজা' (১৯১১), 'ডাকঘর' (১৯১২), 'অচলায়তন' (১৯১২), 'ফাল্গুনী' (১৯১৬), 'মুক্তধারা' (১৯২২), 'রক্তকরবী' (১৯২৬) এবং 'রথের রশি' (১৯৩২) এর মতো রচনা।

শরৎঋতুর আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়ে প্রেমের দ্বারা প্রকৃতির অকৃপণ দানের কথা ব্যক্ত হয়েছে 'শারদোৎসব' নাটকে। বোলপুরের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শারদোৎসব উপলক্ষ্যে ছাত্রদের অভিনয়ের জন্য কবি এটি রচনা করেন। এর মূল চরিত্র রাজসন্ন্যাসী; কিন্তু সবচেয়ে জীবন্ত চরিত্র লক্ষেশ্বর। এই নাটক পরবর্তীকালে 'ঋণশোধ' নামে রূপান্তরিত হয়। বৌদ্ধ আখ্যান 'কুশজাতক'এর কাহিনির নতুন ভাষ্য রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রাজা' নাটকে। সমালোচকের মতে 'রাজা' অরূপতত্ত্ব বিষয়ক নাটক। পরবর্তীকালে 'রাজা' হয়ে ওঠে 'অরূপরতন'। 'রাজা'নাটকে দুটি সার কথা বড়ো হয়ে ওঠে। অরূপের মধ্যে রূপের সার নিহিত আর দুর্গম পথ পেরিয়েই পেতে হয় সত্য শিবকে। এই নাটকের মূল চরিত্র অবশ্যই রাজা। এছাড়া রয়েছেন সুরঙ্গমা, ঠাকুরদা, সুদর্শনা ও কাঞ্চীরাজ। 'অচলায়তনে' রয়েছে অর্থহীন সংস্কার ও যুক্তিহীন আচারসর্বস্বতার রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ। যাকে উপলক্ষ্য করে আচারসর্বস্বতার অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে পড়ে, সে হল পঞ্চক। পঞ্চক এই নাটকের অন্যতম সজীব চরিত্র। অনেকের মতে 'ডাকঘর' এই ধারার শ্রেষ্ঠতম নাটক। রুদ্ধ গৃহবাসী বালক অমলকে সামনে রেখে এই নাটকে নিখিল মানবাত্মার বন্ধনমুক্তির পালাটি রচিত হয়েছে। অমলের একদিকে রয়েছে ঠাকুরদা ও সুধা আর অন্যদিকে রয়েছে মাধব, মোড়ল, কবিরাজ। তাত্ত্বিকতা সত্ত্বেও রচনাটি যথেষ্ট নাট্যরসাত্মক। 'ফাল্গুনী' রবীন্দ্রনাথের স্বল্প পরিচিত নাটক। এই নাটকে বসন্তের উচ্ছ্বসিত আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে চির-নবীনকে বন্দনা করা হয়েছে। 'মুক্তধারা' রবীন্দ্র নাট্যধারায় পরিচিত নাম। এর বক্তব্য-বিষয় আজও প্রবলভাবে প্রাসঙ্গিক। যন্ত্রসর্বস্বতা ও হিংসাত্মক জাতীয়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে। রবীন্দ্রনাথের বার্তা বহনকারী চরিত্র হল যুবরাজ অভিজিত। গান্ধিজির আদলে যেন তৈরি ধনঞ্জয় বৈরাগী। জনতা এবং শিক্ষক চরিত্রটি বেশ সজীব। গানও খুব গুরুত্বপূর্ণ এই নাটকে। তত্ত্ব থাকলেও তত্ত্বসর্বস্ব নয় 'মুক্তধারা'।

'রক্তকরবী' বহুলচর্চিত রবীন্দ্রনাটক। সভ্যতার সংকটকে খুব সংহত পরিসরে ধরা হয়েছে এই নাটকে। যন্ত্র ও

ধনতন্ত্রের আগ্রাসন বনাম সহজ সরল কৃষিসংস্কৃতি তথা স্বতঃস্ফূর্ত জীবনপ্রবাহের দ্বন্দ্ব এবং শেষপর্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত জীবনপ্রবাহের জয় অনিবার্য হয়েছে। নন্দিনী এই নাটকের মূল ফোকাস। নাটকে শেকল-ভাঙার বার্তাটি সকলের মধ্যে নানান ভাবে ঢুকিয়েছে সেই। গানও এই নাটকের অনন্য সম্পদ।'কালের যাত্রা' সংকলনভুক্ত 'রথের রশি'হল আধুনিক গণসচেতন ভারতীয় মানসের ম্যানিফেস্টো। এতে আমরা পাই, সমাজে উপেক্ষিত, মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত শূদ্রের উত্থান। এই ধারার শেষ উল্লেখযোগ্য নাটক 'তাসের দেশ'। এখানেও রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদী; তিনি মুক্তির দিশারী। রূপকথার মোড়কে এই নাটকে নির্জীব নিয়মবদ্ধ মানুষের মধ্যে নবীন প্রাণের সঞ্চার করা হয়েছে। নাটকে একাজটি করেছে লক্ষ্মীছাড়া,বিপদসঙ্কুল পথের অভিযাত্রী রাজপুত্র। নাটকটির উপস্থাপন ভঙ্গির সরসতা বেশ উপভোগ্য।

চ) **সামাজিক নাটক** ঃ রবীন্দ্রনাট্য ধারায় খুব ছোট একটি পর্ব। এই পর্বে রাখতে পারি, 'শোধবোধ'(১৯২৬) এবং 'বাঁশরী'কে। 'শোধবোধ' হল 'কর্মফল' গল্পের নাট্যরূপ। এতে রয়েছে নগরনির্ভর উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের বাস্তব চিত্রণ। 'বাঁশরী' সংলাপ ও শাণিত বাক্যে মাঝে মাঝেই 'শেষের কবিতা'কে মনে পড়িয়ে দেয়। নাটক হিসেবে উল্লেখযোগ্য বলা যায় না। প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের তাত্ত্বিকতা এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

ছ) **নৃত্যনাট্য** ঃ রবীন্দ্রনাট্য ধারার শেষ পর্যায়ে আমরা পাই, 'নটীর পূজা'(১৯২৬), 'চিত্রাঙ্গদা'(১৯৩৪), 'চণ্ডালিকা' (১৩৪৪) এবং 'শ্যামা'(১৩৪৬) এর মতো রচনাগুলি। বিষয়বস্তুতে নয়, এগুলির অভিনবত্ব প্রকাশরূপ ও প্রয়োগরীতিতে। 'নটীর পূজা'র অবলম্বন হল 'পূজারিণী' নামক কবিতা। 'নটীর পূজা'তে সর্বপ্রথম নৃত্যরূপকে আশ্রয় করা হয়। কাব্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' থেকে নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'রূপান্তরিত। 'চণ্ডালিকা'তে নাটক কম, প্রাধান্য পেয়েছে গীতিকাব্যধর্মী অন্তর্মুখী ভাব। নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে 'শ্যামা'র আবেদন ও জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি। এর একদিকে রয়েছে ঘটনার চমৎকারিত্ব ও গতিশীলতা আর অন্যদিকে রয়েছে হৃদয়াবেগের তীব্রতা, প্রণয়ের আকুতি ও মর্মান্তিক ব্যর্থতা।

রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলা নাটককে একটি স্বতন্ত্র আকৃতি-প্রকৃতি দান করলেন বলা যায়। পাশ্চাত্যের প্রসেনিয়াম মঞ্চের তিন দেওয়ালে আবদ্ধ নাটককে তিনি মুক্ত করলেন। পথ হয়ে উঠল তাঁর নাটকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। বস্তুসর্বস্বতা থেকে নাটককে তিনি উদ্ধার করলেন। তা বলে জীবন-বহির্ভূত কোনো তত্ত্বের কথা তিনি বললেন না। বিশেষ দেশ-কাল-পাত্রের সমস্যা নয়, নাটকে বিষয় হল সভ্যতার সংকট — মনুষ্যত্বের সংকট। সংকট নিরসনের দিশাও তিনি রেখেছেন নাট্যব্যঞ্জনার মধ্যে। জনতা তাঁর নাটকে যেমন জীবন্ত, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। সংগীত নিছক বিনোদনের জন্য নয়, তার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করা যায় নাটকের অন্তঃপুরে; এটা রবীন্দ্রনাথ দেখালেন। নাটকের আঙ্গিক নিয়ে নানান পরীক্ষা রবীন্দ্র-নাটককে পুরোনো হয়ে যেতে দেয়নি এখনো। বোঝা যায় একশো বছর পরেও রবীন্দ্র-নাটক আমরা এখনো 'রীতিমতো' পাঠ করে উঠতে পারিনি; এখনো নতুন পাঠের অপেক্ষায় রয়েছে রবীন্দ্রনাটক।

৮.৪ সারাংশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম পরিচয় তিনি কবি। কিন্তু বাংলা নাট্যসাহিত্যে তাঁর অবদান কোনো অংশে কম নয়। আধুনিক বাংলা নাটকের সূচনা মধুসূদন দত্তের হাতে। এই সময়ে পাশ্চাত্য ভাবধারাকে বাংলা নাটকে প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্বের মধ্যে না গিয়ে নাটককে এক উচ্চাঙ্গের শিল্পরূপ হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করলেন। বাংলা নাটকে এক স্বতন্ত্র ধারা ও ভাবনা নিয়ে হাজির হলেন তিনি। বস্তু

সর্বস্বতা থেকে নাটককে দিলেন মুক্তি। নাটকে তুলে ধরলেন মনুষ্যত্বের সংকট। চেষ্টা করলেন তার নিরসন করার কথা। ফলে তাঁর নাটকে জনতা গুরুত্বপূর্ণ ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

৮.৫ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) বাংলা নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান নির্ণয় করুন।

২) রবীন্দ্রনাথ কী ধরনের নাটক লিখেছেন তা আলোচনা করুন।

৩) রূপক-সাংকেতিক নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথের অবদান আলোচনা করুন।

৪) রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যগুলির পরিচয় দিন।

৫) 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' নাটকের বিষয়বস্তুর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে মানসিকতা প্রতিফলিত হয়েছে তার পরিচয় দিন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির শ্রেণিবিভাগ করুন।

২) প্রকাশকাল উল্লেখ করে 'বিসর্জন' নাটকের পরিচয় দিন।

৩) প্রকাশকালসহ 'শারদোৎসব' নাটকের শ্রেণি নির্ণয় করুন।

৪) 'রক্তকরবী' কোন্ ধরনের নাটক?— আলোচনা করুন।

৫) টীকা লিখুন — 'ডাকঘর'।

৬) 'বিসর্জন' নাটক গড়ে উঠেছে প্রেম-প্রতাপের দ্বন্দ্ব নিয়ে— আলোচনা করুন।

৭) রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির পরিচয় লিপিবদ্ধ করুন।

৮) রবীন্দ্রনাথের নাটক বক্তব্য সর্বস্ব, মননশীল এক উচ্চাঙ্গের শিল্পরূপ— কেন তা সংক্ষেপে লিখুন।

৮.৬ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (৩য় খণ্ড)—সুকুমার সেন।

২) রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ— প্রমথনাথ বিশী।

৩) রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা— উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

৪) বাংলা নাটকের ইতিহাস— অজিতকুমার ঘোষ।

৫। রবীন্দ্রনাটক ঃ আলোকিত উদ্ভাসন— কুমার রায়।

একক-৯ ❑ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

গঠন

৯.১. উদ্দেশ্য
৯.২ প্রস্তাবনা
৯.৩ নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
৯.৪ সারাংশ
৯.৫ অনুশীলনী
৯.৬ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে শিক্ষার্থী জানতে পারবেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাট্যজীবনের কথা। তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু কবিতা রচনার মাধ্যমে। রবীন্দ্র সম সময়ে জন্মগ্রহণ করে, তাঁর পরিমণ্ডলে থেকে তিনি নাটক রচনা করেছেন। কবি স্বভাবের জন্য তাঁর নাটকের সংলাপে আবেগের সুর মিশে আছে। তাঁর নাটকে আছে ভাব প্রবণতার উচ্ছ্বাস। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় তাঁর কৃতিত্ব সর্বাধিক। স্বদেশী আন্দোলনের ভাবাদর্শ তাঁর নাটকের মধ্যে ছিল বলেই সেগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকের উল্লিখিত বিষয়গুলি শিক্ষার্থীকে জানানোই এই এককের উদ্দেশ্য।

৯.২ প্রস্তাবনা

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা নাট্য সাহিত্যের যে সূচনা তার পিছনে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রেরণার কথা অস্বীকার করা যায় না। গেরাসিম লিয়েবেদেফ পরবর্তী শৌখিন থিয়েটারের প্রথমদিকে অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা মৌলিক নাটক আমরা পাইনি, পেয়েছিলাম সংস্কৃত ও ইংরেজি থেকে অনূদিত বাংলা নাটক। যাই হোক, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই যখন জি সি গুপ্ত ও তারাচরণ শিকদার একটি করে মৌলিক নাটক আমাদের উপহার দিলেন, তখন তাতে পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ অনুসরণ করার কথা বলা হলেও কার্যক্ষত্রে তা আমরা পেলাম না। পাঠমূল্য বা মঞ্চমূল্য কোনোদিকেই নাটকগুলি সফলতার ছিঁটেফোটা পেল না। ঘটনাচক্রে বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত। 'অলীক কুনাট্য রঙ্গে' বঙ্গ দর্শককুলকে মজে থাকতে দেখে কষ্ট পেলেন এবং বাধ্যত বাংলা নাটক রচনায় হাত দিলেন। পাশ্চাত্য নাট্যকলা সমঝদার মধুসূদন খুব প্রত্যাশিত ভাবে বাংলা নাটকে আনলেন পাশ্চাত্য নাট্যরীতি। কিন্তু তিনি যতটা বলেছিলেন বা চেয়েছিলেন কার্যক্ষেত্রে ততটা তিনি করতে পারলেন না বাংলা নাটকের পাশ্চাত্যায়নে। দীনবন্ধু মিত্র খ্যাতনামা নাট্যব্যক্তিত্ব নিঃসন্দেহে। কিন্তু তিনি বৃহত্তর দায়বদ্ধতাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে নাটকের শিল্পরীতি নিয়ে ততটা ভাববার সময় পেলেন না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে পাশ্চাত্য নাট্যরীতির অনুসরণ আছে; তবে তিনি বিষয়টিকে আত্তীকরণ করতে পারেননি। গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকের আঙ্গিকে বহুলাংশে পাশ্চাত্য নাট্যরীতি, কিন্তু ভাবনায় প্রবলভাবে প্রাচ্য

জীবনদর্শনের প্রভাব। সব মিলে জীবনভাবনায় ও শিল্পদর্শনে এক পূণার্ঙ্গ আধুনিক নাট্যবোধ আমরা পাইনি প্রাক্-দ্বিজেন্দ্র বাংলা নাট্যপর্বে। নানা ত্রুটি বিচ্যুতি বা সীমাবদ্ধতার চিহ্ন সেখানে বারে বারে চোখে পড়ে। বলা যায় পাশ্চাত্যানুসারী বাংলা নাটকের এই 'জন্মদোষ'কে যিনি আপন সামর্থ্যে মুক্ত করলেন, তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)।

৯.৩ নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মেছিলেন সেকালের বঙ্গ সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র একদিকে ছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজার দেওয়ান আর অন্যদিকে ছিলেন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ তথা সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্রের মতো মানুষ দ্বিজেন্দ্রলালের পিতৃবন্ধু ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা লেখক হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের দাদারা ছিলেন সাহিত্যানুরাগী এবং পত্রপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। এই পারিবারিক আবহে বেড়ে-ওঠা দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন মেধাবী ছাত্র ও সাহিত্য-সংগীত অনুরাগী। বাংলার পাশাপাশি সংস্কৃত ও ইংরেজিতেও ছিলেন সমান দক্ষ। প্রেসিডেন্সি থেকে ইংরেজিতে এম এ পাশ করার পর বিলেত যান কৃষিবিদ্যা পড়তে। এখানেই পেলেন পাশ্চাত্য সংগীত এবং নাটক তথা শেক্সপিয়রীয় নাটকের মার্গদর্শন। দেশে ফিরে চাকরি হল। বিবাহ করলেন। আবার হারাতে হল বাবা-মাকেও। এই সময় বিলেত যাওয়ার জন্য হিন্দু সমাজপতিরা তাঁকে সমাজচ্যুত করে। তিনি কোনো আপস করলেন না। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ দ্বিজেন্দ্রলালের মারাত্মক মানস প্রতিক্রিয়ার ফল 'একঘরে'(১৮৮৯) পুস্তিকা। প্রথম যৌবনে কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন। তা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এখন পরিস্থিতি বাধ্য করল তাঁকে আক্রমণাত্মক নাট্য রচনা করতে। তীব্র কটূক্তির জন্য এই রচনা অবশ্য আদৃত হয়নি। কর্মজীবনেও প্রতিবাদী ছিলেন। এরজন্য তাঁর প্রমোশন বন্ধ হয়ে যায়। ব্যক্তিগত জীবনের এই দুর্যোগের সময়ে স্ত্রীকেও হারাতে হয়। জীবনের এই কঠিন সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল গভীর রসাত্মক বা অনুভূতিস্পর্শী নাটক রচনায় মন দেন। দেশে তখন বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদের ভাবোন্মাদনা। এই ভাবধারায় স্নাত হয়ে ক্রমান্বয়ে নাটক লিখতে থাকেন দ্বিজেন্দ্রলাল।

সাহিত্য পরিবারে দ্বিজেন্দ্রলালের মূল পরিচয় তিনি নাট্যকার। আর নাটকের মধ্যে তিনি প্রথম যে ধারার নাটক রচনা করেন, তা হল প্রহসনমূলক। 'কল্কি অবতার'(১৮৯৫) তাঁর প্রথম প্রহসন। এতে বিলেত ফেরত, ব্রাহ্ম, নব্য হিন্দু, গোঁড়া এবং পণ্ডিত— এই পাঁচ সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রুপ আছে। নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্যমূলক রচনা। 'বিরহ'(১৮৯৭) প্রহসনে ঘটনা সংস্থানের মধ্য দিয়ে হাস্যরসের উৎসার ঘটেছে। এর গানগুলি বেশ ভালো। 'ত্র্যহস্পর্শ'(১৯০০) নিম্নস্তরের ভাঁড়ামিতে পূর্ণ। 'প্রায়শ্চিত্ত'কে উল্লেখযোগ্য রচনা বলা চলে না। 'পুনর্জন্ম'(১৯১১) ও তাই। 'আনন্দ বিদায়'(১৯১২) এই ধারার শুধু নয়, দ্বিজেন্দ্র-নাট্যধারার বিতর্কিত রচনা। দ্বিজেন্দ্র-রবীন্দ্র বিরোধে যে হলাহল উঠেছিল, তার স্মারক এই রচনা। অনেকের মতে দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার 'কলঙ্ক স্বরূপ'এই রচনা।

বাংলা পৌরাণিক নাটকের ধারায় দ্বিজেন্দ্রলাল কিছুটা অন্যভাবে হলেও যুক্ত করেছিলেন। 'পাষাণী'(১৯০০) দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম পৌরাণিক নাটক। রামায়ণের অহল্যা কাহিনির নতুন ভাষ্য রচনা করেছেন তিনি। পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে একেবারে সাধারণ মানুষের মতো আঁকা হয়েছে। নারী জাতির প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রদ্ধা এখানে চোখে পড়ার মতো। 'সীতা'(১৯০৮) তেও এই ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। মূল রামায়ণ ও ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত' অনুসরণে লেখা হলেও দ্বিজেন্দ্রলালের নিজস্বতা বেশ বোঝা যায়। সীতা চরিত্রের ঔজ্জ্বল্যের

পাশাপাশি রাম চরিত্রের ট্র্যাজিকধর্মিতা এই নাটকের উল্লেখযোগ্য বিষয়। সংলাপ দীর্ঘ হলেও নাট্যবেগ সম্পন্ন। 'ভীষ্ম' (১৯১৪) তে দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় আমরা পাই। ভাব ও ভাষার চমৎকারিত্বে আমরা মুগ্ধ হই। নাটকের নামচরিত্রটি উজ্জ্বল নিঃসন্দেহে। তবে প্রধান নারী চরিত্র দুটি— অম্বা ও সত্যবতী ততটা আলো পায়নি; কেমন যেন করুণ ও দুঃখমাখা।

সমকালীন বিষয় নিয়ে নাটক রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল ততটা সফল নন, তা আমরা তাঁর প্রহসনমূলক নাটকগুলি দেখলেই বুঝতে পারি। সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। দুটি সামাজিক নাটক দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক তালিকায় রয়েছে। যথা 'পরপারে' (১৯১২) এবং 'বঙ্গনারী' (১৯১৬)। যুক্তিবাদী আধুনিক দ্বিজেন্দ্রলালের পরিবর্তে 'পরপারে'তে পাই অধ্যাত্মবাদী দ্বিজেন্দ্রলালকে। আর 'বঙ্গনারী'তে গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' (১৯০৫)এর ছায়া খুঁজলে ভুল হবে না। রচনা হিসেবে উল্লেখ্য নয়।

সাহিত্য পরিবারে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রধান পরিচয় তিনি নাট্যকার, একথা আমরা আগেই বলেছি। এখন সেই পরিচয়টিকে যদি আরও একটু সুনির্দিষ্ট করতে চাই , তবে বলতে পারি তিনি হলেন ঐতিহাসিক নাট্যকার। ঐতিহাসিক নাট্য রচনাতেই তিনি তাঁর প্রতিভার সম্যক বিকাশ ঘটিয়েছেন বলা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক হল 'তারাবাঈ' (১৯০৩)। যেহেতু এটি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক, তাই এর মধ্যে ঐতিহাসিক নাটকের সাফল্যের রসায়ন ততটা আবিষ্কৃত হতে দেখি না; বরং দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনমূলক রচনার কিছু রেশ এতে দেখা যায়। কর্নেল জেম্‌স টডের রাজস্থান বৃত্তান্তকে অবলম্বন করে এই নাটক লেখা। পৃথ্বীরাজের কাহিনি এখানে গৌণ হয়ে পড়েছে। চরিত্রের মধ্যে উজ্জ্বল বলা যায় সূর্যমল এবং তার স্ত্রী তমসা। চরিত্র দুটিতে শেক্সপিয়রের প্রভাব বোঝা যায়। অমিত্রাক্ষর ছন্দ এই নাটকে ব্যবহার করলেও তার ধ্বনি গৌরব রক্ষা করতে পারেননি দ্বিজেন্দ্রলাল।

'প্রতাপ সিংহ' (১৯০৫) থেকে শুধু দ্বিজেন্দ্রলালের নয়, বাংলা নাটকের ইতিহাসে প্রকৃত ঐতিহাসিক নাটকের যুগ শুরু হয় বলা যায়। দেশকাল বা যুগের প্ররোচনা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য। 'প্রতাপ সিংহ' নাটকে স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রেষ্ঠতম সৈনিক প্রতাপের অতুলনীয় বীরত্ব, অনুপম দেশপ্রেম এবং মহৎ ত্যাগের চিত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। রাজা হয়েও প্রতাপ দীনের থেকে দীন। বংশগৌরব রক্ষার চেষ্টায় তিনি বহু শ্রেষ্ঠ রাজপুত বীরের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। নিজের ভাই শক্ত সিংহকে পেয়েও ছেড়েছেন। অন্যায়ের শাস্তি দিতে গিয়ে নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত হারিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের আগে প্রতাপকে নিয়ে 'অশ্রুমতী' (১৮৭৪) রচনা করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতাপ সেকালের দর্শককুলকে 'জ্বালিয়ে দিয়ে' গিয়েছিল বলা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতাপ দর্শকের কাছে আরও অভিনন্দিত হল। কারণ একদিকে যুগপরিবেশ আর অন্য দিকে দ্বিজেন্দ্রলালের অসাধারণ চরিত্রসৃষ্টি ক্ষমতা। তবে দ্বিজেন্দ্রলাল যুগোন্মাদনায় ভেসে যাননি। কারণ তিনি মনে করতেন দেশপ্রেমের চেয়ে মনুষ্যত্ববোধ ও বিশ্বপ্রেম অনেক বড়ো। তাঁর এই ভাবনা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি প্রকাশ করতে গিয়ে তারা অনেক সময় ভাবনার বাহক হয়ে গেছে। এর দরুন ঐতিহাসিক নাটকের সঙ্গে স্বাদেশিকতার যে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক তাতে ব্যাঘাত ঘটে যায়।

বন্ধুবর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে দ্বিজেন্দ্রলাল রচনা করেন 'দুর্গাদাস' (১৯০৬)। দুর্গাদাসকে দ্বিজেন্দ্রলাল দোষ-দুর্বলতার অতীত আদর্শ চরিত্র করে এঁকেছেন। এতে নাট্যকারের উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে, কিন্তু নাটক জীবন্ত চরিত্র পায়নি। একইভাবে ঘটনার আধিক্যে নাটকের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট হয়েছে। তবে নাটকের মধ্যে সবচেয়ে জীবন্ত চরিত্র গুলনেয়ার। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের দিকটি তুলে ধরেছে নাটকের দিলীর খাঁ ও কাশিম চরিত্র। 'দুর্গাদাস'কে উচ্চমানের নাটক বলা যায় না। দ্বিজেন্দ্রলালের এর পরের ঐতিহাসিক নাটক 'নুরজাহান'

(১৯০৮)। মোঘল ইতিহাসের বিতর্কিত নারী চরিত্রকে নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক ট্রাজেডি রচনা করেছেন। নায়িকা এখানে পরিপূর্ণভাবে ট্রাজেডি শিরোপার অধিকারী,তার দ্বিতীয় কোনো দাবিদার নেই। এই নাটকে বাইরের যুদ্ধ-বিগ্রহের তুলনায় নুরজাহান চরিত্রের ভিতরের দ্বন্দ্ব অতুলনীয় শিল্পরূপ লাভ করেছে। সামান্য আমলার কন্যা হয়ে রূপ ও উচ্চাশার জোরে হয়ে ওঠে ভারত সাম্রাজ্ঞী। কিন্তু প্রবৃত্তির খেলায় সে শেষপর্যন্ত হেরে যায়। তার ট্রাজেডি শেক্সপিয়রের একাধিক উচ্চাঙ্গের ট্রাজেডির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। বলবার একাধিক বিষয় এই নাটকে রয়েছে। গানও এই নাটকের পরম সম্পদ। 'মেবার পতন' (১৯০৮) উদ্দেশ্যমূলক নাটক। তবে তা কোনো সংকীর্ণ উদ্দেশ্য নয়। নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন, ''এই নাটকে আমি এক মহানীতি লইয়া বসিয়াছি ; সে নীতি বিশ্বপ্রেম।" বাস্তবিকই এই নাটকে ব্যক্তিপ্রেম ছাপিয়ে দেশপ্রেম এবং দেশপ্রেম ছাপিয়ে বিশ্বপ্রেমের জয় ঘোষিত হয়েছে। আর সেই জয় গেয়েছে নাট্যকারের মানসী। মানসীর মুখের সার কথাঃ 'গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ।' নাটক হিসেবে ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা অস্বীকার করা যায় না। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সংগীত প্রয়াস করেছেন। ঐতিহাসিক নাটকের যথাযথ আবহ নির্মাণ করেছেন, কিন্তু নাট্যমূল্যে তা উতরোয় না। সেই তুলনায় 'সাজাহান' (১৯০৯) উচ্চমানের নাট্যসৃষ্টি। নাট্য-সমালোচক অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন, ''নাটকের মধ্যে বহুতর চরিত্র এবং বিভিন্ন উপকাহিনি থাকা সত্ত্বেও নাট্যকার সুনিপুণ শিল্পকৌশলে সব ঘটনা ও চরিত্রগুলিকে অবিচ্ছিন্নভাবে পরস্পরের সহিত গাঁথিয়া দিয়াছেন।" ট্রাজেডির শিরোপা সাজাহান পেলেও নাটকের নায়কত্ব বিষয়ে নিরুঙ্কুশ দাবি জানাতে পারেন না তিনি। এক্ষেত্রে তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁরই পুত্র ঔরংজীব। সাজাহান, দারা, সুজা, মোরাদ, সোলেমান, মহম্মদ— সকলের করুণ পরিণতির জন্য দায়ী একমাত্র ঔরংজীব। সে ক্রূরকুটিল, কিন্তু হৃদয়হীন নয়। জাহানারা উজ্জ্বল নারী চরিত্র। অসহায় বন্দি পিতার সে একমাত্র সান্ত্বনা। এই নাটকের উপসংহার নিয়ে বিতর্ক আছে। সমালোচকের মতে, শর্করামণ্ডিত কুইনাইনের মতো বেদনার বটিকায় এ মিলন শর্করার প্রলেপ মাত্র। নাটকের শেষাংশে শেক্সপিয়রের 'কিংলিয়র' নাটকের প্রভাব কিছুটা অনুভূত হয়। এই নাটকেই আছে দ্বিজেন্দ্রলালের সেই বিখ্যাত গান —'ধনধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'।

মিনার্ভা থিয়েটারের অভিনেতা শ্রী প্রিয়নাথ ঘোষের অনুরোধে দ্বিজেন্দ্রলাল লেখেন 'চন্দ্রগুপ্ত'(১৯১১)। এর জন্য দ্বিজেন্দ্রলালকে পড়তে হয়েছে হিন্দুপুরাণ,কিংবদন্তী ও গ্রিক ইতিহাস। চাণক্যের কূট চক্রান্তে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনে আসীন হওয়া নাটকের মূল ঘটনা। তবে চন্দ্রগুপ্ত নয়,নাটকের প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে চাণক্য। চাণক্যের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সমস্ত কাহিনিকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তাঁর পাশে চন্দ্রগুপ্ত নিতান্ত ম্লান। নাটকের গঠনশৈলীতে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও সমকালে নাটকটি জনপ্রিয় হয় এবং মঞ্চ আনুকূল্য পায়। নাট্যকারের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 'সিংহল বিজয়'(১৯১৫) নামে আর একটি ঐতিহাসিক নাটক। এই নাটকের বিষয়বস্তু হল বাঙালি বীর বিজয় সিংহ এর লঙ্কা জয়। তবে বিজয় সিংহ এর বাঙালি পরিচয় নিয়ে বিতর্ক আছে। পণ্ডিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন,বিজয় সিংহ গুজরাটি। নাটকটিতে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার ছাপ নেই বললেই চলে। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের তালিকায় কেউ কেউ 'সোরাব রুস্তম'এর নাম করে থাকেন। কিন্তু নাট্যকারের কথাতেই স্পষ্ট, এটা ঠিক অপেরা বা ঠিক নাটকও নয়,এটি একটি মিশ্র রচনা।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আগে বা সমকালে ঐতিহাসিক নাটক অনেকেই লিখেছেন; যেমন— মধুসূদন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ। মধুসূদনের হাতেই আমরা প্রথম পাই বাংলা ঐতিহাসিক নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'(১৮৬১)। সমকালীন জাতীয় ভাব বা দেশপ্রীতির সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঐতিহাসিক নাটক রচনার দায় ছিল না তাঁর। কর্নেল জেম্স টডের রাজস্থান বৃত্তান্ত অবলম্বনে তিনি রচনা করেন তাঁর নাটক।প্রথম ইতিহাসাশ্রিত

নাটক, শিথিলভাবে প্রথম ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে 'কৃষ্ণকুমারী'র কথা বলা যায় বটে, কিন্তু খাঁটি শিল্পরীতির বিচারে 'কৃষ্ণকুমারী'তে ত্রুটি-বিচ্যুতি কম নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে রোমান্টিক কল্পনার বাড়াবাড়ি চোখে পড়ার মতো। জাতীয় ভাব ও দেশানুরাগকে জাগ্রত করার জন্য তিনি ইতিহাসকে নামমাত্র ব্যবহার করেছেন। বরং গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নিষ্ঠা ছিল অনেক বেশি। তবে ইতিহাসকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতে গিয়ে তিনি সৃজনশীল কল্পনার সদ্ব্যবহার সব সময় করতে পারেননি। বিশ শতকের একেবারে শুরুর দিকে স্বদেশী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ ধরনের নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ। সমকালে জনপ্রিয়তাও পেয়েছিল। কিন্তু শিল্পরীতির নির্মোহ বিচারে বলতেই হয়, ক্ষীরোদপ্রসাদের তথাকথিত ঐতিহাসিক নাটক যথাযথ ঐতিহাসিক নাটক হতে পারেনি; এগুলিতে রোমান্সের অতিরঞ্জন এবং যুগের চাহিদার কাছে নতিস্বীকার করে প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসকে অস্বীকার করার প্রবণতা চোখে পড়ে। বড়ো রকমের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে অতিক্রম করে প্রথম যথাযথ ঐতিহাসিক নাটক রচনার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে দ্বিজেন্দ্রলালের। সমালোচক অধ্যাপক দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে মূল্যবান মন্তব্য করেছেনঃ ''দ্বিজেন্দ্রলালই ইতিহাস ও কল্পনার পরিমাণ সামঞ্জস্যে, অন্তর্দ্বন্দ্বময় চরিত্রসৃষ্টিতে, ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল রচনায়, সংলাপ ও ভাষা প্রয়োগে এবং সর্বোপরি একটি বিশেষ পরিকল্পনার অধীনতায় কীভাবে সার্থকতা লাভ করে ধীরে ধীরে সে কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন।''

সফল ঐতিহাসিক নাটক রচনার পাশাপাশি দ্বিজেন্দ্রলাল আরও একটি সাফল্য বাংলা নাট্যসাহিত্যে এনে দিয়েছিলেন, তা হল বাংলায় উচ্চাঙ্গের ট্রাজেডি। দ্বিজেন্দ্রলালের আগে অনেকেই জেনে বা না-জেনে ট্রাজেডি-ধর্মী নাটক রচনা করেছেন। কিন্তু ট্রাজেডির শিল্পরূপের সাফল্যের সূত্র তাঁরা ধরতে পারেননি। তার ফলে তাঁদের হাতে ট্রাজেডি নাটক মানে হয়ে উঠেছিল বিয়োগান্তক নাটক। দ্বিজেন্দ্রলালের 'নুরজাহান' বাংলা নাট্যসাহিত্যে ট্রাজেডি নাটকের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। চরিত্র চিত্রণেও দ্বিজেন্দ্রলালের সাফল্য রীতিমতো ঈর্ষণীয়। তাঁর নাটক যেন চরিত্রের চিত্রশালা। জাহানারা, লায়লা, দিলদার কিংবা পিয়ারা বা সীতা— এরকম বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। ঐতিহাসিক নাটককে তিনি যেমন স্বদেশপ্রেমের বদ্ধ কারাগার থেকে উদ্ধার করেছিলেন, তেমনটাই তিনি পৌরাণিক নাটককে ভক্তিভাবের বন্যা থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন। কী ঐতিহাসিক নাটক, কী পৌরাণিক নাটক তিনি মনুষ্যত্বের বড়ো আদর্শকে ছোটো হতে দেননি। অন্ধ স্বদেশপ্রেমের চেয়ে বিশ্বপ্রেম কত বড়ো বা জরুরি তা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। বাংলা নাটকের টেকনিক্যাল সমস্যা নিয়ে প্রথম তিনি ভেবেছেন, সংলাপে স্বগতোক্তির ধরন বদলে দিয়েছেন। সংলাপের মধ্যে এনেছেন গদ্যের কাঠিন্য ও কবিতার কোমলতার সংমিশ্রণ। আর গান যেখানে আগে বাংলা নাটকে ছিল নিছক 'ট্রাজিক রিলিফ' — প্রথার দাসত্ব মাত্র (ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ), সেখানে সংগীত সমঝদার দ্বিজেন্দ্রলাল সংগীতকে আক্ষরিক অর্থে নাটকের অন্তরঙ্গ উপাদানে পরিণত করলেন। সব মিলিয়ে নিছক পাশ্চাত্যানুসরণ নয়, তার গঠনমূলক প্রেরণাকে সামনে রেখে দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা নাটককে একটা আদর্শায়িত মান দান করলেন; যে নাটক শুধু মঞ্চ মুখাপেক্ষী নয়, পাঠের মাধ্যমে আজও আস্বাদন করা যায় তার নাটকত্ব।

৯.৪ সারাংশ

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তেজনা দেশবাসীকে আলোড়িত করে। সেই সময় নাট্যকারদের মধ্যে দেশপ্রেম নিয়ে যে আবেগ তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। প্রথমে প্রহসনকার হিসাবে আবির্ভূত হলেও পরে যথার্থ নাটক লিখে নাট্যকাররূপে সম্মানিত হন। তিনি ঐতিহাসিক নাটকে স্বদেশপ্রেম প্রচার করেছেন। দেশ ও সমাজের কাছ থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে অবিচার পেয়েছিলেন

তার প্রতিক্রিয়া তাঁর সামাজিক নাটক ও প্রহসনগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। প্রহসন, পৌরাণিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, সামাজিক ও পারিবারিক নাটক ইত্যাদি ছিল তাঁর রচনার বিষয়। স্বাদেশিক উত্তেজনাপূর্ণ বীররসাত্মক নাটক রচনা করে তিনি বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

৯.৫ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) বাংলা নাট্যসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কৃতিত্বের পরিমাপ করুন।

২) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটকগুলির সাধারণ পরিচয় দিন।

৩) প্রহসনমূলক ধারায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একাধিক নাটক রচনা করেছেন— আলোচনা করুন।

৪) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকের শ্রেণিবিভাগ করে যে কোনো দুটি শ্রেণির নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৫) বাংলা নাট্যসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্বকীয় অবস্থানটি চিহ্নিত করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দুটি সামাজিক নাটকের পরিচয় দিন।

২) টীকা লিখুন — 'মেবার পতন' নাটক।

৩) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পৌরাণিক নাটকগুলির নামোল্লেখ করে যে-কোনো একটি পরিচয় দিন।

৪) 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের পরিচয় দিন।

৯.৬ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (২য় খণ্ড)—সুকুমার সেন।

২) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৩য় খণ্ড)— অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩) বাংলা নাটকের ইতিহাস— অজিতকুমার ঘোষ।

৪) বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস— ক্ষেত্র গুপ্ত।

৫) দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার— রথীন্দ্রনাথ রায়।

একক-১০ ❑ বিজন ভট্টাচার্য

গঠন

১০.১. উদ্দেশ্য
১০.২ প্রস্তাবনা
১০.৩ নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য
১০.৪ সারাংশ
১০.৫ অনুশীলনী
১০.৬ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১০.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে শিক্ষার্থী জানতে পারবেন আধুনিক বাংলা নাট্যসাহিত্যের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে। বিজন ভট্টাচার্য রচিত নাটকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও গণনাট্য অনুসারী নাট্যকারদের নাট্য-প্রবণতা। গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে বিজন ভট্টাচার্য মানব জীবনের দুঃখ যন্ত্রণার যে দিকগুলো তুলে ধরেছেন তার কথা। যুগ ও জীবনের চিত্র রূপায়ণের পরিচয়। গণনাট্য আন্দোলনের উন্মাদনা ও উদ্দীপনা শুরুর বিষয়। অভিনয় পরিচালনা ও নাটক রচনার ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা। এ সবের পাশাপাশি তাঁর সমাজ সচেতনতার স্বরূপ প্রকাশ করা এই এককের উদ্দেশ্য।

১০.২ প্রস্তাবনা

নিছক নাটক ও নাট্যকারদের নিয়ে আলোচনা বিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য, যতক্ষণ না আমরা দেশকালের একটা বড়ো প্রেক্ষিতে বিষয়টিকে বুঝতে চেষ্টা করব। বিজন ভট্টাচার্যের নাটক বা নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যকে বুঝতে গেলে দেশকালের প্রেক্ষাপটটি বড়ো জরুরি। এক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট দেশকালটি হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময় সংলগ্ন বাংলাদেশ।

ইতিহাসের অল্পবিস্তর খোঁজখবর যারা রাখি, তারা জানি, ১৯১৪-তে সংঘটিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কথা। বলা যায়, এরপর থেকেই বদলাচ্ছিল আমাদের চেনা পৃথিবীটা। বদলাচ্ছিল মানুষের জীবনযাত্রা, চিন্তাভাবনা সবকিছু। দ্রুত এগিয়ে আসছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা। দুটো বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে পৃথিবীতে ঘটে যাচ্ছিল বড়ো মাপের নানা ঘটনা। একদিকে সোভিয়েত বিপ্লব, তাসখন্দে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা, ক্রমশ ভারতবর্ষ তথা বাংলায় তার প্রসার, নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের প্রতিষ্ঠা (পরে এর থেকে তৈরি হয় ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘ), বামপন্থী ছাত্রসংগঠন এ এস এফ-এর গড়ে-ওঠা, প্রগতিশীল ছাত্রযুবাদের যুদ্ধবিরোধী সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট Youth Cultural Institute বা Y.C.I. এর সদস্য ছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখ। অন্যদিকে বিশশতকের তিরিশের দশকে বিশ্বব্যাপী দেখা দেয় স্বৈরতন্ত্রী শক্তির বিপুল উত্থান। শেষ পর্যন্ত সীমিত মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষাকে নস্যাৎ করে বিশ্বজুড়ে শুরু হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯)। ব্রিটিশ কলোনি ভারতবর্ষও তাতে জড়িয়ে পড়ল পরোক্ষভাবে। ব্রিটিশ বিরোধী অক্ষশক্তি জাপান বর্মা জয় করে হানা দিল

কলকাতায়। বাংলা তথা কলকাতা তখন ভিতরে ভিতরে চরম চঞ্চল — ভারতছাড় আন্দোলন, আগস্ট আন্দোলন, ইংরেজের পোড়ামাটি নীতি, সুযোগ বুঝে চোরা কারবারিদের রমরমা। গ্রামবাংলায় নেমে এল কৃত্রিম মহা মন্বন্তর — খাবারের হাহাকার। সাধারণ মানুষের দুর্দশা দেখে শিউরে উঠলেন বিবেকবান বুদ্ধিজীবী মানুষেরা। সময়ের দাবিতে এঁরাই গঠন করলেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা Indian People's Theatre Association (I.P.T.A.) সংঘের বাংলার কমিটিতে ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, সুধী প্রধান, বিষ্ণু দে, সুজাতা মুখার্জি, জলি কাউল প্রমুখ।

১০.৩ নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য

বিজন ভট্টাচার্য যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নাটক তথা থিয়েটারে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন তা হল গণনাট্য। আর এই গণনাট্যের সংজ্ঞা আমরা তাঁর মুখ থেকেই শুনে নিতে পারি। তিনি বলেন— মানুষের কল্যাণে রুটির লড়াইয়ের সঙ্গে প্রাণের লড়াইকে একসূত্রে বেঁধে নাট্য আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হল গণনাট্যের মূলকথা। এহেন গণনাট্যকে আঁকড়ে ধরাটা যে বিজন ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত কোনো ব্যাপার নয়, সেটা আমরা তাঁর 'হয়ে-ওঠা'র পর্যায়টিকে লক্ষ করলেই বুঝতে পারব।

বিজন ভট্টাচার্য জন্মেছিলেন পরাধীন বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়। কিন্তু বাবার চাকরি সূত্রে নানা জায়গা ঘুরে এসে পৌঁছেছেন কলকাতায়। কলকাতার কলেজে পড়বার সময় জড়িয়ে পড়েন জাতীয় আন্দোলনে। পড়াশোনায় ছেদ পড়ে। যোগ দেন ছাত্র আন্দোলনে। যুক্ত হন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে। সাংবাদিকতার চাকরি একটা পেয়েছিলেন; কিন্তু ১৯৪২-এ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করে চাকরি ছেড়ে দেন, হয়ে ওঠেন পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। গল্প লেখা দিয়ে সাহিত্য জীবন শুরু করলেও অচিরেই কলম ধরেন নাটক লেখার জন্য। তাঁর প্রথম নাটক একটি একাঙ্ক, নাম 'আগুন' (১৯৪৩)। সদ্য গড়ে ওঠা ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় বিজন ভট্টাচার্যের পরিচালনায় তা মঞ্চস্থ হয়। 'জবানবন্দী' নামে আরও একটি একাঙ্ক এই বছরেই লেখেন। লেখেন 'নবান্ন' (১৯৪৪) এর মতো যুগান্তকারী নাটক। এই 'নবান্ন'এর প্রযোজনা দিয়ে বলা যায় বাংলা গণনাট্য সংঘের জয়যাত্রা শুরু হয়। 'নবান্ন' বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক। তাঁর অন্যান্য পূর্ণাঙ্গ নাটকের তালিকাটি নিম্নে দেওয়া হল।

নাটকের নাম	মঞ্চপ্রকাশকাল	গ্রন্থপ্রকাশকাল
অবরোধ	—	১৯৪৭
জীয়নকন্যা	১৯৪৭	১৯৪৮
জতুগৃহ	—	১৯৫২ (পত্রিকা)
গোত্রান্তর	১৯৫৯	১৯৫৭
ছায়াপথ	১৯৬১	১৯৬২
মরা চাঁদ	১৯৬১	১৯৬১
মাস্টারমশাই	১৯৬১	—
দেবীগর্জন	১৯৬৬	১৯৬৯
ধর্মগোলা	১৯৬৭	—

নাটকের নাম	মঞ্চপ্রকাশকাল	গ্রন্থপ্রকাশকাল
কৃষ্ণপক্ষ	১৯৭৫	১৯৬৬(পত্রিকা)
গর্ভবতী জননী	১৯৬৯	১৯৭১
আজ বসন্ত	১৯৭২	১৯৭০(পত্রিকা)
সোনার বাংলা	১৯৭১	—
গুপ্তধন	—	—
চলো সাগরে	১৯৭৭	১৯৭২

'আগুন', 'জবানবন্দী' ছাড়াও বিজন ভট্টাচার্য যেসব একাঙ্ক রচনা করেছিলেন, সেগুলি হল যথাক্রমে 'মরাচাঁদ' (এইনামে পূর্ণাঙ্গ নাটকও রয়েছে, একাঙ্কটি অবশ্য আগে রচনা করেছিলেন) 'কলঙ্ক', 'জননেতা', 'সাগ্নিক', 'স্বর্ণকুম্ভ', 'চুল্লী' এবং 'হাঁসখালির হাঁস'।

বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম নাট্য রচনা একাঙ্ক 'আগুন' পাঁচটি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যে বিভক্ত। এখানে বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতি থেকে পাঁচজন মানুষকে সেকালের খাদ্যাভাবের যুগে শহরে অবশ্যম্ভাবী রেশনের লাইনে হাজির করিয়েছেন নাট্যকার। জঠরাগ্নির জ্বালার মধ্য দিয়ে মানুষেরা ক্ষুধার তীব্রতা এবং যুদ্ধের সময়ে তৈরি হওয়া কৃত্রিম খাদ্যাভাবের বিরুদ্ধে গলা মেলায় একসঙ্গে। 'জবানবন্দী'তে রয়েছে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ প্রেক্ষাপটে গ্রাম্য কৃষক জীবন নিয়ে চারটি দৃশ্য। ক্ষুধার জ্বালায় মৃত্যুমুখী মানুষগুলি শহরে এসে পায় শহুরে 'ভদ্দরলোকের' নিস্পৃহ ঔদাসীন্য। কিন্তু হেরে যাওয়াতে এই নাটক শেষ হয় না। শহরের ফুটপাথে মৃত্যুমুখী পরাণ মণ্ডলের জবানবন্দীর মধ্যে উচ্চারিত হয় বাঁচার শপথ। 'জবানবন্দী'তে যা ছিল খসড়া আকারে, 'নবান্ন' তারই বিস্তৃত রূপ। চারটি অঙ্ক ও পনেরোটি দৃশ্য সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ নাটক 'নবান্ন'। এখানে বিদেশি শাসকের অত্যাচার, শোষণ, যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণাম, দুর্ভিক্ষ, দালাল পাইকার, মহাজনদের লোভ-লালসা, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মানুষজনের আত্মসুখ সন্ধানের মতো ব্যক্তি সংকীর্ণতা ধরা পড়েছে নির্ভুলভাবে। আকালকে কেন্দ্র করে নাটকটি রচিত হলেও আকালের কথাতেই শেষ হয়নি। আকালের কারণানুসন্ধান এবং প্রতিকারের পথ চিহ্নিত করা হয়েছে এই নাটকে। সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ কী করে সোনাধানের স্বপ্নকে সত্য করে তুলতে পারে, তার ইঙ্গিত আছে নাটক শেষে।

'অবরোধ' শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে লেখা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলন দানা বাঁধছিল বামপন্থীদের কেন্দ্র করে। তৎকালীন বামপন্থী শ্রমিকদের আপসহীন মনোভাব ও কর্মধারা স্বাধীন ভারতের গোড়াতেই বিজন ভট্টাচার্য উপলব্ধি করেছিলেন। এই নাটক তারই ফসল। এখানে মালিকপক্ষকে এবং শ্রমিকনেতাকে স্বচ্ছন্দে চিনে নেওয়া যায়। 'জীয়নকন্যা'গীতিনাট্যের ভঙ্গিতে লেখা রূপক নাটক। প্রেক্ষাপটে রয়েছে বেদে জীবনের ছবি। সোনার পরীর মতো বেদেকন্যা উলুপীর সর্পদংশনে মৃত্যু, হিন্দু মুসলমান ওঝা, গুণিনদের সমবেত মন্ত্র উচ্চারণে এবং সাধনায় কন্যার প্রাণ ফিরে আসলে দেশভাগকালীন সাম্প্রদায়িক হানাহানির ফলস্বরূপ নিজেদের মৈত্রীর বিনষ্টি এবং পরে অনেক ক্ষয়-ক্ষতির বিনিময়ে আমাদের অন্তরের আকুল আকুতিতে আত্মোপলব্ধিতে পৌঁছানোর ছবি। স্বাধীনতা পরবর্তী উচ্চবিত্ত পরিবারে গল্প নিয়ে লেখা 'জতুগৃহ'। এখানে দেখানো হয়েছে আধুনিক উচ্চবিত্ত মানুষের ক্রমবর্ধমান লোভের আগুন কীভাবে তাদের পুড়িয়ে মারে, তার ছবি। বলাবাহুল্য এই নাটককে বিজন ভট্টাচার্যের প্রতিনিধি স্থানীয় রচনা বলা যায় না। বরং 'গোত্রান্তর' বিজন ভট্টাচার্যের উল্লেখযোগ্য নাট্যকর্ম। নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন, ''নীতিবাদের প্রশ্ন নয়— জীবনের ক্ষেত্রেই গোত্রান্তর আজ যুগসত্য। আর জীবনের

ক্ষেত্রে যে সত্য চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারার মতোই সমুজ্জ্বল— নাটকে তার অপলাপ করা কোনো নাট্যকারের জীবনধর্ম হতে পারে না।” বাইরে থেকে মনে হতে পারে, এই নাটক দেশভাগজাত ছিন্নমূল মানুষের সমস্যা নিয়ে রচিত, তা কিন্তু নয়। এই নাটকে আমরা দেখতে পাই, উদ্বাস্তু হরেন্দ্রবাবু কোন্ পরিস্থিতিতে কীভাবে শ্রমিক শ্রেণির একজন হয়ে ওঠেন, সেই উত্তরণের আলেখ্য। নাটকের শেষাংশে ‘ভদ্রলোকের’ লোভ আর ক্রোধের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় বস্তি। সেই বস্তি আবার গড়ে তুলতে শুরু করে ওই ছোটোলোক শ্রমিকেরা। এর বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝতে পারেন, তাঁর আপনজন ভদ্রলোকেরা নয়, ওই তথাকথিত ছোটোলোক শ্রমিকেরা। হরেন্দ্রবাবু অবশ্য এর আগেই সংস্কার ঝেড়ে ফেলে মেয়ে গৌরীর সঙ্গে বিয়ে দেন শ্রমিক কানাইয়ের। কারণ বড়োলোক বাবুদের হাত থেকে গৌরীর মানসম্ভ্রম রক্ষা করেছিল এই শ্রমিক কানাই। সব মিলিয়ে মানুষের শ্রেণিগত রূপান্তরই এই নাটকের মূল উপজীব্য বিষয়।

কলকাতার ফুটপাথবাসী ভিখারিদের নিয়ে প্রথম নাটক লেখেন বিজন ভট্টাচার্য। সেই নাটক হল ‘ছায়াপথ’। নাটকে রয়েছে অন্ধ ও পঙ্গু দুই ভিখারি বন্ধুর প্রেম ও প্রীতির গল্প। এই নাটকের সংলাপ রচনাতেও বিজন ভট্টাচার্য অনন্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ‘মরাচাঁদ’ নামে প্রথমে একটি একাঙ্ক রচনা করেন; পরে সেটিকে পূর্ণাঙ্গ নাটকে রূপ দেন। এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র অন্ধ লোকশিল্পী পবন অধিকারী। তার ভালোবাসার নারী তাকে ছেড়ে চলে যায় অন্য মানুষের কাছে। লড়াকু পবন এতে প্রবল ভেঙে পড়ে। তবে শেষ পর্যন্ত ফাটা গলায় ভাঙা ঘর জোড়া লাগাবার গান গায় সে। অনেকেই মনে করেন, পবন চরিত্রে নাট্যকারের আত্মপ্রক্ষেপ পড়েছে। ‘দেবীগর্জন’ বিজন ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকর্ম বলা যায়। এর মূল বিষয় হল— স্বাধীনতা পরবর্তী ভুঁইচাষি, ভাগচাষিদের ওপর জোতদারদের ছলে বলে কৌশলে শোষণ, শাসন ও নিপীড়ন। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে নাট্যকার তাঁর নাটকে দেখান, জোতদারের শোষণ, শাসন ও নিপীড়নের ডানহাত তথা ‘ফ্রেন্ড, ফিলোজফার এন্ড গাইড’ হল এক ভণ্ড জননেতা। নাটকে তার নাম ত্রিভুবন। অত্যাচারী জোতদার প্রভঞ্জনকে সে নানাভাবে ‘রক্ষা’ করে। শেষে অবশ্য যখন দেখে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে, তখন নিজে কেটে পড়ে। শেষপর্যন্ত শোষিত সর্বহারা কৃষক প্রজারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের অধিকার বুঝে নেয় এবং ধর্মগোলাকে সামনে রেখে জোতদারের ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দেয়। নারী নিপীড়নকারী জোতদার পালিয়ে বাঁচে না। ধরা পড়ে বিক্ষুব্ধ কৃষকদের হাতে। নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন, ‘‘ঊষর লালমাটির দেশ বীরভূমের পটভূমিতে আদিবাসী ও সাঁওতাল চাষিদের কৃষক আন্দোলনের ভিত্তিতে, শত্রুকে পরাহত করে, জননীকে খুঁজে পাবার সংগ্রামী সাধনায় দেবীগর্জন নাটকটির নামের দিক থেকে সার্থক হতে বাধা নেই— এই বিশ্বাসে একান্তই বাস্তবনিষ্ঠ কৃষক আন্দোলনের পটভূমিতে সংগ্রামী এই চিত্রকল্প কাহিনির পৌরাণিক নামকরণ করেছিলাম। আমার মনে হয় লোক-সংস্কৃতির বহতা অক্ষুণ্ণ রেখেই এই নামটি প্রযোজনার পরিপ্রেক্ষিতে সার্থক হতে পেরেছে। সুরাসুরের যুদ্ধে দেবীকে চিনে নিতে আজকের মানুষ ভুল করেনি।” বোঝা যায় লোকঐতিহ্য ও লোকপুরাণের ব্যবহারও এই নাটকে বিশেষ মাত্রা যুক্ত করেছে। নাট্যসমালোচক অধ্যাপক দর্শন চৌধুরী এই নাটক সম্পর্কে লিখেছেন, ‘‘বিজন ভট্টাচার্যের অভিনয়ের সাফল্য তাঁর ‘নবান্ন’ নাটকে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু নাট্যগঠনে, বিষয়বস্তুর বিন্যাসে, চরিত্রনির্মাণে, লোকজীবনের আচার-সংস্কারের পরিবেশ সৃষ্টির বিশ্বাসে,জীবনকে বিচার করায় এবং সর্বোপরি বিশেষ ভাবাদর্শের সার্থক প্রকাশে ‘দেবীগর্জন’ নাটক বিজন ভট্টাচার্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। তাঁর নাট্য রচনার ক্রমোন্নতির রেখাচিত্র আঁকলে ‘জবানবন্দী’ থেকে ‘নবান্নে’ উঠতে উঠতে ‘দেবীগর্জন’ সর্বোচ্চ শিখর স্পর্শ করে যায়।”

‘গর্ভবতী জননী’ বিজন ভট্টাচার্যের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নাটক। বেদে জীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত এই

নাটক। এই নাটক বলে— জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকা যায় না; জীবনকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই বড়ো কথা। দেশনেতারা ভাঁওতা দেয় ওঝার মতো, মা আবার গর্ভবতী হবেন, মা আবার গর্ভবতী হচ্ছেন। সমস্তটাই স্তোকবাক্য, একটা ধাপ্পা। ফাঁকিটা ধরতে পারেন এই নাটকের মামা — বিবেক ধরনের চরিত্র। বেদে সমাজের কেউ যখন বলে ওঠে, একদণ্ড বাঁচবার ইচ্ছে নেই। মামা তখন বলেন,তবু বাঁচতে হবে রে— এও এট্টা দায়। এখানেই নাটকটির আবেদন। 'আজ বসন্ত' একটি পরীক্ষামূলক নাটক। উদারা, মুদারা ও তারা নাটকের তিনটি অঙ্ক— যার মধ্যে দেখানো হয় যুবসমাজের মধ্যে জেগে ওঠা গভীর নৈরাশ্য। কিন্তু নাটক এখানে শেষ হয় না। স্বপ্নভঙ্গের বেদনাকে দেখিয়েও জীবনকে গানের সুরে বেঁধে নেওয়ার কথা এই নাটকে আছে। 'সোনার বাংলা' লেখেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে। বই আকারে প্রকাশিত হয়নি; তবে কবচকুণ্ডল নাট্যদল এর অভিনয় করে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দেই।

একাঙ্কগুলির মধ্যে 'আগুন', 'জবানবন্দী'র কথা আগেই বলা হয়েছে। ওই দুটি একাঙ্কের মাত্রা এক ধরনের পূর্ণতা পেয়েছে বলা যায় 'নবান্ন'এর মধ্যে। ১৯৪৬ সালে বিজন ভট্টাচার্য 'কলঙ্ক' ও 'মরাচাঁদ' নামে দুটি একাঙ্ক লেখেন। বাঁকুড়া জেলার প্রান্তবর্তী গ্রাম অঞ্চলের আদিবাসীদের নিয়ে গড়ে উঠেছে 'কলঙ্ক' নাটিকাটি। নাটিকার কেন্দ্রে রয়েছে এক সাঁওতাল পরিবার। পরিবারে রয়েছে বৃদ্ধ মোড়ল, তার স্ত্রী গিরি, পুত্র মংলা, পুত্রবধূ রত্না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে এই অঞ্চলে ছাউনি ফেলে গোরা সৈন্যরা। এদের কাজকর্ম করে দিত সাঁওতাল পরিবারের সদস্যরা। এই পরিবারের পুত্রবধূ রত্না গোরা সৈন্যদের লালসার শিকার হয়; জন্ম দেয় এক গৌরবর্ণ শিশু। তাদের সমাজের কলঙ্ক এই সদ্যোজাত শিশুসন্তানটিকে শেষ করে দেবার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্তু বৃদ্ধ মোড়ল এই কাজ হতে দেয় না। সে বরং সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের মাধ্যমে গোরা সৈন্যদের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ জানানোর কথা বলে। 'কলঙ্ক'এর কাহিনিসূত্র ধরেই পরবর্তীকালে লেখা হয় 'দেবীগর্জন'। একাঙ্কের কাহিনি বা বক্তব্যকে ব্যাপ্তি দেওয়ার জন্য তাকে পূর্ণাঙ্গ নাটক করে তোলার প্রচেষ্টা বিজন ভট্টাচার্য বেশ কয়েকবার নিয়েছেন। 'মরাচাঁদ'এর ক্ষেত্রেও এটা আমরা দেখেছি। 'লাশ ঘুইর‍্যা যাউক' একটি সময়োচিত একাঙ্ক। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই নাটিকা। দাঙ্গার বীভৎস চিত্রের মধ্যেও হিন্দু-মুসলমানের সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ অদ্ভুত কুশলতায় প্রকাশ করেছেন নাট্যকার। এই একাঙ্ক বিস্তৃত রূপ পেয়ে হয়েছে 'চলো সাগরে' নামের পূর্ণাঙ্গ নাটক। শ্মশানঘাটের চুল্লিকে কেন্দ্রীয় চরিত্র করে লেখা 'চুল্লি' একাঙ্কটি। উল্লেখযোগ্য রচনা বলা যায় না। বিজন ভট্টাচার্যের শেষ প্রকাশিত রচনা হল 'হাঁসখালির হাঁস' (১৯৭৭)। পাতাল রেল তৈরির কলকাতায় মাটি কাটতে আসা শ্রমিক নিয়ে লেখা এই একাঙ্ক। এতেও ধরা পড়েছে আবহমানকাল ব্যাপী মানুষের জীবনযন্ত্রণা। তবে নাট্যকার মুক্তির রূপটিকেও খুঁজে পেতে চেয়েছেন।

১০.৪ সারাংশ

বাংলা থিয়েটারের আলোকোজ্জ্বল অধ্যায় হল গণনাট্য-নবনাট্য ধারা। এই ধারার অগ্রণী নাট্যব্যক্তিত্ব তথা নাট্যকার হলেন বিজন ভট্টাচার্য। বলা যায় তাঁর 'নবান্ন' দিয়েই ভারতীয় গণনাট্য সংঘ পথ চলা শুরু করে। বিষয় ও প্রকরণের দিক থেকে বাংলা নাট্যসাহিত্যে এ ছিল একেবারে নতুন। নাটকে গণজীবনের সমস্যার কথা যেমন এসেছে, তেমনই রয়েছে তা থেকে বেরিয়ে আসার পথও। লোকঐতিহ্য ও লোকসংগীতকে নিপুণভাবে কাজে লাগালেন বিজন ভট্টাচার্য। জীবনের প্রথম পর্যায়ে বিজন ভট্টাচার্য যতটা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন, জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে ততটা ছিলেন না। নিপীড়িত মানুষদের কথা তখনও বলছেন, কিন্তু বোঝা যায় বামপন্থী

ভাবনা-চিন্তার প্রথাগত পথ থেকে কিছুটা সরে এসেছেন। তাই গণনাট্য তখন তাঁর কাছে অনেকটা লোকনাট্যের কাছাকাছি। তাঁর এই সময়কার নাটকগুলিতে লোকজ মিথের ব্যবহার অনেকখানি বেড়েছে। সংলাপের ভাষা নির্মাণেও বিজন ভট্টাচার্য পারঙ্গম। কোনো ছুৎমার্গের পরোয়া তিনি করেননি। সব মিলিয়ে আমাদের মনে হয়, বিজন ভট্টাচার্য যাত্রা শুরু করেছিলেন গণনাট্যের 'দশ-পঁচিশের ছক'দিয়ে পরে জীবন ও সময়ের দাবিতে সেই ছক অতিক্রম করে হয়ে ওঠেন নবনাট্যের রূপকার।

১০.৫ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) কখন কোন্ পরিস্থিতিতে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়? গণনাট্যের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

২) বিজন ভট্টাচার্যের যুগান্তকারী নাটক 'নবান্ন'— আলোচনা করুন।

৩) দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে লেখা বিজন ভট্টাচার্যের দুটি নাটকের পরিচয় দিন।

৪) 'দেবীগর্জন' কে বিজন ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকর্ম বলা যায় কেন তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

৫) একাঙ্ক নাটক 'আগুন' ও 'জবানবন্দী' পূর্ণতা পেয়েছে 'নবান্ন' নাটকে এসে— কীভাবে পূর্ণতা পেয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন।

৬) অভিনেতা, নাট্যশিক্ষক, নির্দেশক, প্রযোজক হিসাবে বিজন ভট্টাচার্যের মূল্যায়ন করুন।

৭) বিজন ভট্টাচার্যের নাটকগুলির পরিচয় দিয়ে নাট্যকার হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব পরিমাপ করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) গণনাট্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করে তার মূল কথা বুঝিয়ে দিন।

২) বিজন ভট্টাচার্যের মঞ্চায়িত পাঁচটি নাটকের নাম লিখুন।

৩) বেদে জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে এমন প্রেক্ষাপটে লেখা 'জীয়নকন্যা' নাটকের পরিচয় দিন।

৪) কলকাতার ফুটপাতবাসী ভিখারিদের নিয়ে লেখা বিজন ভট্টাচার্যের নাটক 'ছায়াপথ'— আলোচনা করুন।

৫) টীকা লিখুন— 'কলঙ্ক' নাটক।

৬) 'নবান্ন' নাটকের ঐতিহাসিক পটভূমির পরিচয় দিন।

১০.৬ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) বাংলা নাটকের ইতিহাস— অজিতকুমার ঘোষ।

২) গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়— দর্শন চৌধুরী।

৩) দুই দশকের বাংলা নাটকের বিবর্তন— গীতশ্রী দে সরকার।

৪) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (৩য় খণ্ড)—সুকুমার সেন।

৫) বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস— ক্ষেত্র গুপ্ত।

একক-১১ ❑ তুলসী লাহিড়ী, মন্মথ রায়

গঠন

১১.১. উদ্দেশ্য
১১.২ প্রস্তাবনা
১১.৩ নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী
১১.৪ নাট্যকার মন্মথ রায়
১১.৫ সারাংশ
১১.৬ অনুশীলনী
১১.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে শিক্ষার্থী জানতে পারবেন, কীভাবে গণনাট্য সংঘের প্রগতিশীল জীবন ভাবনার দ্বারা দীক্ষিত হয়ে তুলসী লাহিড়ী, মন্মথ রায় নাট্যব্যক্তিত্ব নাটক রচনায় বিশেষ ভূমিকা নিলেন। এদের রচনায় প্রকাশ পেয়েছে মানবিক আদর্শ ও বিশ্বাস। জানা যাবে নবনাট্য আন্দোলনে তুলসী লাহিড়ীর অসাধারণ কৃতিত্বের কথা। নবনাট্য আন্দোলন পর্যায়ের আরেকজন নাট্যকার মন্মথ রায়। তিনি একাঙ্ক নাটকের পুরোধা পুরুষ। চলমান জীবনধারার এই শিল্পীও তুলসী লাহিড়ীর মতো মানবজীবনের গভীর রহস্যকে তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীকালে যে সমস্ত নাটক তিনি লিখেছেন, সেখানে সাধারণ মানুষ, সমসাময়িক ঘটনা কীভাবে নাটকের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে তা জানা যাবে।

১১.২ প্রস্তাবনা

১৯৪৩ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের একটা বড়ো বদল ঘটে যায়, সেকথা আমরা আগেই বলেছি। সাধারণভাবে এই পর্যায়কে বলা হয় গণনাট্য-নবনাট্য ধারা। এই প্রগতিশীল নাট্যধারায় যেসব শিল্পী আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭-১৯৫৯)।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক বয়ঃকনিষ্ঠ নাট্যকারদের অন্যতম হলেন মন্মথ রায় (১৮৯৯-১৯৮৮)। বিজন ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রে আমরা যেমন বলতে পারি, তিনি একান্তভাবে গণনাট্যের পুরোধা সৈনিক; মন্মথ রায়ের ক্ষেত্রে তেমনটা বলা যায় না। মন্মথ রায় বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে যখন নাটক লিখতে শুরু করেন, তখন গণনাট্যের উদ্ভব হয়নি; তবে গণনাট্যের মতো প্রগতিশীল নাট্যন্দোলনের উদ্ভবের প্রেক্ষিত বা মাটি তৈরি হচ্ছিল। বাইরে তখনও চলছে বাণিজ্যিক থিয়েটার বিনোদনী পসরার পালা। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ঘরে বাইরে একটা অস্থির ভাঙা-গড়ার পর্ব শুরু হয়েছে। পাল্টাচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রা ও জীবনদৃষ্টিভঙ্গি। ফলত বদলাচ্ছে শিল্পদৃষ্টিভঙ্গি। সাহিত্য শিল্প জীবন ঘনিষ্ঠ তাপ চাপ শুষে নিচ্ছে। সাহিত্যিক শিল্পীগণ প্রত্যক্ষভাবে জীবনের পক্ষে বা সাধারণ

মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছেন। বিশ শতকের প্রাক স্বাধীনতার এমন এক কালপর্বে নাট্যকার হিসেবে উঠে এলেন মন্মথ রায়।

১১.৩ নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী

তুলসী লাহিড়ীর পিতৃদত্ত নাম হল হেমেন্দ্রচন্দ্র। সম্ভবত সরকারি রোষ থেকে নাম পালটানো হয়। নাম হল তুলসীদাস লাহিড়ী। তবে তিনি তুলসী লাহিড়ী নামেই পরিচিত ছিলেন। জন্মেছিলেন বর্তমান বাংলাদেশের রঙপুর জেলার নলডাঙায় এক জমিদার পরিবারে। পড়াশোনা করেছিলেন আইন নিয়ে। ওকালতি করার চেষ্টা করেন রঙপুরে এবং কলকাতায়। বাল্যকাল থেকেই বিশেষ ঝোঁক ছিল সংগীত ও রবীন্দ্রসাহিত্যে। সংগীত দিয়েই তাঁর মঞ্চে প্রবেশ ঘটে। সংগীতের প্রেরণা পান বাবা সুরেন্দ্রনাথের কাছ থেকে আর অভিনয়ের শিক্ষা পান রঙপুরের তারাপ্রসন্ন সান্যালের কাছে। হিজ মাস্টারস ভয়েস থেকে ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খাঁকে দিয়ে নিজের লেখা দুখানি গানের রেকর্ড করেন তুলসী লাহিড়ী। সময়টা ১৯২৯। এরপর থেকেই শুরু হয় তাঁর সুরকার, গীতিকার, পরিচালক ও অভিনেতার জীবন। ১৯৩২ তে রচনা করেন 'যমুনা পুলিনে' চিত্রকাহিনি। কিন্তু মতানৈক্যের দরুন কলকাতার সিনেমা ও গ্রামোফোনের জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। নিজেকে নিযুক্ত করেন উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার করতোয়া নদীর তীরে কৃষিকাজে। এই সময় বাংলার চাষিদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি। কলকাতায় ফিরে আসেন ১৯৪৩-৪৪ নাগাদ। নবান্ন নাটকের মহড়ার সময় তিনি ভারতীয় গণনাট্য সংঘে যোগদান করেন। পরে তিনি এই সংগঠনের সভাপতি হয়েছিলেন।

নাট্যকার হিসেবে তুলসী লাহিড়ীর প্রথম আবির্ভাব ১৯২৯সালে। তাঁর লেখা বেতার নাটক 'ঠিকাদার' সম্প্রচারিত হয় এই বছর। এতে তিনি অভিনয়ও করেছিলেন। অবশ্য এর এক বছর আগে তিনি শরৎচন্দ্রের দত্তা উপন্যাসটি নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। তাঁর নাট্যকার জীবন মোটামুটি ত্রিশ বছরের। পূর্ণাঙ্গ নাটক, বেতার নাটকে ও একাঙ্ক মিলিয়ে তাঁর রচনার সংখ্যা খুব বেশি নয়, আবার খুব কমও নয়। আসলে তাঁর সব নাটককে আজও আমরা গ্রন্থিত করতে পারিনি। এটা আমাদের লজ্জার কথা। তুলসী লাহিড়ীর প্রথম উল্লেখযোগ্য নাটক 'দুঃখীর ইমান' (১৯৪৬)। অন্যান্য পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলি হল 'যোগাযোগ' (বেতার নাটক) 'মায়ের দাবী', 'পথিক', 'ছেঁড়া তার', 'বাংলার মাটি', 'ভিত্তি', 'পরীক্ষা', 'ঝড়ের মিলন', 'চাষি', 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার'। একাঙ্কগুলি হল 'মণিকাঞ্চন', 'নাট্যকার', 'নববর্ষ', 'চৌর্যানন্দ', 'নায়ক', 'গ্রীনরুম', 'দেবী', 'তদন্ত', 'চোরাধীনতা', 'ঘরে ফেরা', 'শিল্পীর আত্মহত্যা', 'জয়মঙ্গল', 'বেইমান' ইত্যাদি। অভিনয়ের অভিজ্ঞতাও দীর্ঘ। অভিনয় করেছেন ৫০ এর বেশি বেতার নাটকে, ৬৯-এর বেশি চলচ্চিত্র এবং ২২-এর মতো নাটকে। বেশ কিছু চলচ্চিত্রের কাহিনি বা চিত্রনাট্য লিখেছিলেন। লিখেছিলেন নাট্য বিষয়ে বহু প্রবন্ধ।

আমরা আগেই বলেছি, 'দুঃখীর ইমান' তুলসী লাহিড়ীর বিখ্যাত রচনা। এই নাটকের পটভূমি হল ১৩৫০ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষ। নাট্যকারের নিবেদনে' বলা হয়েছে, 'ধনতান্ত্রিক সভ্যতার চরম পরিণতি মন্বন্তরের দিনে এই চিরবঞ্চিত ও অবজ্ঞাতের দল, যারা ধনলোভীর লোভের যূপকাষ্ঠে বলি হয়েছিল তাদের ছবি আঁকতেই এই নাটকের সৃষ্টি'। নাট্যসমালোচক অজিতকুমার ঘোষ এই নাটকের বিষয় সম্পর্কে জানিয়েছেন, ''বিশ্বগ্রাসী যুদ্ধের দুরন্ত ক্ষুধার আক্রমণে আমাদের দেশের খাদ্য গেল, জীবনধারণের সামান্যতম দ্রব্যও নিমেষের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল,সাধারণ মানুষ অন্নবস্ত্রহীন প্রেতের মতো পথে প্রান্তরে ঘুরিতে লাগিল। শুধু তাহাই নহে,

মানুষের চিরপোষিত নীতি,ধর্মসংস্কার দুর্যোগের ঝড়ে জীর্ণপত্রের মতো খসিয়া পড়িল। সমাজের এই অসহনীয় বাস্তব অবস্থা নাটকে উদঘাটিত হইয়াছে।" তবে নাটক চূড়ান্ত নেতিবাচকতার মধ্যে শেষ হয়নি। মানুষের মৃত্যু শ্মশানে তাই মনুষ্যত্বের জয় ঘোষিত হয়েছে। সেজন্য দেখি, ধর্মদাস ও বিলাতির ভালোবাসা অন্ধকারের বুকে তারার মতো ফুটে ওঠে, জামালের শোচনীয় দুর্ভাগ্যও পিতৃস্নেহের আলোকে গৌরবান্বিত হয়ে ওঠে। নাটকটি প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায় শ্রীরঙ্গম মঞ্চে অভিনীত হয় এবং থিয়েটারের ইতিহাসে স্মরণীয় প্রযোজনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। 'পথিক' ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় নাট্যশিল্প হিসেবে। কয়লাখনি অঞ্চলের বিচিত্র জীবনধারাকে নিয়ে গড়ে উঠেছে নাটকটি। এতে রয়েছে একটি দোকানে আসা-যাওয়ারত কয়লাখাদের বাবু ও মজুরদের উল্লাসতিক্ত জীবন। সমালোচক নাটক সম্পর্কে লিখেছেন, অনন্ত কালপ্রবাহে জটিল শ্রেণিবিভক্ত সমাজের বক্রকুটিল আবর্তন, মানুষের অবিরাম চলা এবং জীবনপথিকের আগমন ও ব্যক্তিমনের উদ্ভাস— নাটকে লেখকের ভাব ও আদর্শ বড়ো হলেও তার রূপায়ণে সার্থকতার পরিচয় কম। কিন্তু নাটকটির সঙ্গে আমাদের গ্রুপথিয়েটারের বিশেষ যোগ রয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও 'নবান্ন' (১৯৪৪) প্রযোজনায় আশাতীত সাফল্যের পর ভারতীয় গণনাট্য সংঘ মাত্র চার বছরের মাথায় ভেঙে যায়। গড়ে ওঠে প্রথম ভারতীয় গ্রুপ থিয়েটার বহুরূপী (১৯৪৮) এই দলে শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যদের সঙ্গে ছিলেন তুলসী লাহিড়ী। তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক' দিয়ে বহুরূপী পথচলা শুরু করে।

'ছেঁড়া তার' তুলসী লাহিড়ীর আর একটি বিখ্যাত রচনা। প্রথমে নাম ছিল 'ছিন্ন তার'। এই নাটকেও রয়েছে তেরোশ পঞ্চাশের ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের কথা। নাটকের কেন্দ্রে রয়েছে রংপুর জেলার গ্রাম্য কৃষক সমাজের একটি পরিবার ও তার দুঃখবেদনার কাহিনি। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র রহিমুদ্দী তার স্ত্রী ফুলজানকে ভরণপোষণ করতে না পেরে ফুলজানকে তালাক দেয়। রহিমুদ্দীর অপারগতা কোনো ব্যক্তিগত বিশেষ ঘটনা নয়, এর মূলে রয়েছে পঞ্চাশের কৃত্রিম— মানুষের তৈরি করা দুর্ভিক্ষ। দুর্যোগের দিনে রহিমুদ্দী তার ছেলেকে নিয়ে শহরে আসে, আর তার স্ত্রী ফুলজান যায় গ্রামের মাতব্বর বদমাইশ হাকিমদ্দীর কাছে, তার দাসী হতে। দুর্ভিক্ষের দুর্যোগ কেটে গেলে রহিমুদ্দী দেশে ফিরে তার স্ত্রী ফুলজানকে তালাক কাটিয়ে ফিরে পেতে চায়, কিন্তু হাকিমদ্দী ফুলজানকে কিছুতেই ছাড়ে না। ওদিকে ফুলজানও স্বামী-পুত্রের কাছে ফিরে আসার জন্য ব্যাকুল। হাদিসের বিধানে আটকায় তাদের মিলন। নিরুপায় যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে রহিমুদ্দী করে আত্মহত্যা। অমানবিক ধর্মবিধানের বিরুদ্ধে ব্যক্তিমানুষের অসহায় নীরব প্রতিবাদ এইভাবেই উৎসারিত হয়। দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রামের বর্ণনা, মুসলমান সমাজের চিত্র, কৃষকসমাজের ছবি, আঞ্চলিকতা চমৎকার ধারা পড়েছে নাটকটির মধ্যে। বহুরূপীর প্রযোজনায় শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্রের আসাধারণ অভিনয় নৈপুণ্যে নাটকটি রসোত্তীর্ণ হয় এবং অতিশয় জনপ্রিয়তা পায়। এটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৫০ এর ১৭ ডিসেম্বর নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে। এই নাটকে নাট্যকার নিজে অভিনয় করেন হাকিমুদ্দী চরিত্রের ভূমিকায়।

দেশভাগ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানের এক হিন্দু পরিবারের সংকট নিয়ে লেখা 'বাংলার মাটি'(১৯৫৪) নাটকটি। তবে নাটকে একটি বড়ো সমস্যার দিকে ইঙ্গিত আছে। তা হল পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা, যা অচিরেই রূপ নেয় ভাষা আন্দোলনে। এই আন্দোলনই বৃহৎ আকার ধারণ করে জন্ম দেয় একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের; যা আজ বাংলাদেশ নামে পরিচিত। শিল্প হিসেবে উত্তীর্ণ না হলেও সময়ের দাবিকে স্বীকৃতি দিতে পেরেছিল এই নাটক। নাটকের এই সামর্থ্যকে চিনে নিতে ভুল করেননি শম্ভু মিত্র। তিনি তুলসী লাহিড়ীর এই নাটক মঞ্চস্থ করেন। আলোচ্য নাট্যকারের শেষ নাটক 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার' দেশভাগ পরবর্তী বাংলার অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে

এক মধ্যবিত্ত পরিবারের বিপর্যয় নিয়ে লেখা। সংসারের কর্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যুতে সংসারে একের পর এক বিপর্যয় নেমে আসে। কিন্তু বিপর্যয়ের মধ্যে নাটক শেষ হয় না। হরিসাধন ও বাণীর মধ্যে আমরা সর্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে যেন স্নিগ্ধ আশার প্রদীপটি দেখতে পাই। নাট্যকার তাই নাটকের ভূমিকায় লেখেন, 'বাণী ও হরিসাধন এযুগের তপস্বী, তাদের তপস্যা সার্থক হবে এ বিশ্বাস রাখি।'

বাংলা একাঙ্ক নাটকের জনক বলা হয় নাট্যকার মন্মথ রায়কে। পরবর্তীকালে এই একাঙ্ক নাটককে গুণগতভাবে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছিলেন,তাঁদের একজন তুলসী লাহিড়ী। তাঁর বেশ কিছু একাঙ্কের নাম আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তবে আরও কিছু লিখেছিলেন তিনি, যেগুলির সন্ধান আজ আর পাওয়া যায় না। তুলসী লাহিড়ীর প্রতিবাদী ও প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচায়ক দুটি একাঙ্কের কথা একটু বলতে চাই। কৌতুকনিষ্ঠ অথচ গভীর সমাজবোধ সম্পন্ন একাঙ্ক হল 'চৌর্যানন্দ'। এতে দেখি,সমকালীন বাস্তবতার নির্ভুল ছবি— সমাজে জ্ঞানীগুণীদের তেমন জায়গা নেই, বরং চোরেরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ও তাদের অধিকার কায়েম হচ্ছে। 'দেবী' বাংলা একাঙ্কের ধারায় এক উল্লেখযোগ্য রচনা। এতে আছে এক আদিবাসী বিধবা রমণীর সপরিবারে বাঁচার জন্য দুর্মর লড়াইয়ের নাট্যায়ন। সমাজের চোখে তথাকথিত 'নষ্ট বিটি-ছেইলা' শুখনি কঠিন জীবন সংগ্রামে বাঘের আক্রমণে প্রাণ দেয় শেষপর্যন্ত, আর সভ্যবাবুদের কাছে আদায় করে নেয় দেবীর স্বীকৃতি। একাঙ্কের শিল্পরূপের দিক থেকেও রচনাটি উচ্চমানের।

আমরা জানি, তুলসী লাহিড়ী গণনাট্য সংঘের হাত ধরে বাংলা নাট্যজগতে যথাযথভাবে প্রবেশ করেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর নাটকে আমরা দেখি, সাধারণ মানুষ বিশেষত শ্রমিক, নিম্নবিত্ত কৃষিজীবী মানুষের প্রতি গভীর সহমর্মিতা। পূর্ণায়ত নাটক এবং একাঙ্ক— উভয় শ্রেণির নাটকেই তাঁর এই মনোবৃত্তির প্রকাশ দেখা যায়। পরবর্তীকালে তুলসী লাহিড়ী গণনাট্য সংঘ ছেড়ে শম্ভু মিত্রের 'বহুরূপী'তে যোগ দেন। আরও পরে 'বহুরূপী' ছেড়েও বেরিয়ে আসেন। প্রথমে 'আনন্দম' পরে 'রূপকার' নাট্যদলের প্রবর্তন করেন। অর্থাৎ গ্রুপথিয়েটার আন্দোলনে পুরোমাত্রায় জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু এর জন্য গণনাট্য সংঘের প্রগতিশীল নাট্যাদর্শকে ত্যাগ করতে হয়নি তাঁকে। আসলে সময়ের দাবিকে উপেক্ষা করতে পারেন না একজন দায়বদ্ধ শিল্পী। তাঁর স্পষ্ট কথা—

''সমাজের এই অবস্থায় তার জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে বাস্তবধর্মী নাটকের প্রয়োজন খুব বেশি। দিশেহারা মানুষকে আশার আলো দেখান,তার দোষ-ত্রুটি সহানুভূতির সঙ্গে দেখিয়ে দিয়ে তার সংশোধনের উপায় দেখান,মনুষ্যত্বকে উদ্বুদ্ধ করে সব দুঃখকষ্ট লাঞ্ছনা-যাতনা সহ্য করার মতো সঙ্কল্প এনে দেওয়ার আজ অত্যন্ত প্রয়োজন।''

এই জন্য তাঁর নাটকে সমাজের উপেক্ষিত মানুষের সব বঞ্চনা ও বেদনা বাস্তব সত্যের স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। শেষপর্যন্ত তুলসী লাহিড়ীর নাটকে জীবনই বড়ো হয়েছে, তত্ত্ব নয়।

১১.৪ নাট্যকার মন্মথ রায়

মন্মথ রায় অবিভক্ত বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় জন্মেছিলেন। কিন্তু তাঁর বেড়ে-ওঠা উত্তরবঙ্গের বালুরঘাটে। ছোটোবেলা থেকেই থিয়েটার ও অভিনয়ের প্রতি মন্মথ রায়ের নেশা। ন'বছর বয়সেই দুপাতার একটি নাটক লিখেছিলেন; নাম 'রাণী দুর্গাবতী'। ক্লাস এইট-নাইনে পড়বার সময়ে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর'নাটকে

অমল চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসিত হন। আসলে বালুরঘাটে নাট্যচর্চার একটা আবহ বরাবর ছিল, এখনো আছে। কলেজ জীবনেও নাটকের আগ্রহে কোনো ঘাটতি ঘটেনি, বরং বেড়েছে। লিখলেন 'বঙ্গে মুসলমান' নামে একটি নাটক। নিজের পরিচালনায় বালুরঘাটে অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন। অভিনয় শুরু হল রাত দশটায়, রাত শেষ হয়ে সূর্যোদয় হল, কিন্তু নাটকের অভিনয় শেষ হল না। দর্শকরা হল ছেড়ে বেরিয়ে গেল। এই নেতিবাচক অভিজ্ঞতা শিক্ষা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে লিখলেন একটিমাত্র দৃশ্যে সম্পূর্ণ এক বা দেড় ঘণ্টায় অভিনয়যোগ্যে একাঙ্ক নাটক— 'মুক্তির ডাক'(১৯২৩)। এক অঙ্কের স্বল্প পরিসরে পূর্ণাঙ্গ নাটকের স্বাদ —বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন। বিষয়টি নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জের। নতুন দেশকালের প্রেক্ষিতে মানুষের ব্যস্ততাময় জীবনের জন্য অনিবার্য আবিষ্কার— এই একাঙ্ক নাটক।

মন্মথ রায়ের প্রথম নাটক প্রকাশের ষাট বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত হয় তাঁর শেষ নাটক 'এদেশে লেনিন'(১৯৮৬)। চারটি পর্যায়ে ভাগ করে তাঁর নাটকগুলিকে আলোচনা করা যেতে পারে। 'মুক্তির ডাক' দিয়ে বাংলা একাঙ্ক নাটকের যে শুভসূচনা করেছিলেন, সেই ধারা অব্যাহত থাকল 'রাজপুরী', 'বিদ্যুতপর্ণা', 'সেমিরেসিস' প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এই প্রথম পর্বে (১৯২৩-১৯৩১) মন্মথ রায় মনোমোহন থিয়েটারের হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে লিখলেন পুরাণাশ্রয়ী নাটক 'চাঁদসদাগর'(১৯২৭)। ঋকবেদের বৃত্রাসুর ও দধীচির আত্মত্যাগের কাহিনি নিয়ে লিখলেন 'দেবাসুর'। এই ধারায় বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ রচনা হল 'কারাগার' (১৯৩০)। এর গান লিখেছিলেন কবি নজরুল ইসলাম। নাটকটিতে পৌরাণিক কাহিনি ভেদ করে বড়ো হয়ে উঠেছে সমকালীন দেশাত্মবোধ; মরিয়া শ্বেতাঙ্গ শাসক যে কারণে নাটকটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

মন্মথ রায় দ্বিতীয় স্তরে (১৯৩৩-১৯৩৮) লিখলেন কতকগুলি ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক। যেমন মীরকাশিম, মহুয়া,অশোক, খনা ইত্যাদি। 'মীরকাশিম' নাটকে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে সমকালীন বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের তীব্রতা। এরপর প্রায় দীর্ঘ দেড় দশক মন্মথ রায় নাটক লেখা থেকে দূরে থাকলেন। কারণ এই সময়কালের মধ্যে রয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতি, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, অর্থনৈতিক মন্দা এবং দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা। স্বাধীনতা পরবর্তী (১৯৫২-১৯৬৩) কালপর্বে শুরু হল মন্মথ রায়ের নাটকের তৃতীয় পর্যায়। এই পর্যায়ের নাটকে ফুটিয়ে তুললেন তৎকালীন সমাজের বাস্তব ছবি। শোষিত নির্যাতিত মানুষের পক্ষে প্রতিবাদী নাট্যকারের কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠল। কৃষক সমস্যা নিয়ে লিখলেন 'চাষির প্রেম'। মালিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব নিয়ে রচনা করলেন 'ধর্মঘট'। লিখলেন 'লাঙল'— বাংলার বামপন্থী কৃষক আন্দোলনের 'লাঙল যার জমি তার' কর্মসূচির সফল নাট্যরূপ। গণনাট্য আন্দোলনের শরিক হয়ে লিখলেন 'সাঁওতাল বিদ্রোহ'। 'অমৃত অতীত' লিখলেন বাংলার প্রথম প্রজাবিদ্রোহের কাহিনি আশ্রয় করে। এই পর্বেই লেখেন রাজনৈতিক ব্যঙ্গনাটক 'আজব দেশ'। এ নাটক সম্পর্কে উৎপল দত্তের মন্তব্য স্মরণীয়; ''আজব দেশ তথাকথিত নব্য লেখকদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় প্রগতিশীল নাটক কাকে বলে।'' এই পর্বের নাটকগুলির মধ্যে 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' ও 'অমৃত অতীত' কে রচনা হিসেবে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করেছেন অজিতকুমার ঘোষের মতো নাট্যসাহিত্যের ঐতিহাসিক। তাঁর মতে বাকিগুলি প্রয়োজনভিত্তিক ও উদ্দেশ্যমূলক।

মন্মথ রায়ের নাটকের শেষ পর্বের শুরু 'মহা-উদ্বোধন' (১৯৬৩) দিয়ে। যুবক নরেন্দ্রনাথ ও রামকৃষ্ণদেবকে নিয়ে লেখা এই নাটক। এক ধরনের জীবনী নাটক। এই ধারাতেই লেখেন ইউক্রেনের বিপ্লবী জনকবিকে নিয়ে 'তারাস শেভচেঙ্কো', বাংলার সম্প্রীতির মিথ-পুরুষ লালনকে নিয়ে 'লালন ফকির'। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের শতবার্ষিকীতে তাঁকে নিয়ে লেখেন 'শরৎ বিপ্লব', নাট্যব্যক্তিত্ব অমরেন্দ্রনাথ দত্তকে নিয়ে 'অমর প্রেম', বিখ্যাত

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে নিয়ে 'ডাঃ সরকার' এবং শেষে 'এদেশে লেনিন'। এই সময়ের অসাধারণ ঘটনা বা স্মৃতি উপলক্ষেও রচনা করেন কয়েকটি নাটক। যেমন সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষ পূর্তিতে 'আঠারশ বাহাত্তর', ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে '২১শে ফেব্রুয়ারি' ইত্যাদি।

মন্মথ রায় তাঁর গোটা নাট্যকার জীবনে একশোর বেশি একাঙ্ক নাটক রচনা করেছেন; যেগুলি সংকলিত হয়েছে বেশ কয়েকটি সংকলনে; যেমন'একাঙ্কিকা', 'নব একাঙ্ক', 'ফকিরের পাথর', 'একাঙ্ক গুচ্ছ', 'একাঙ্ক অর্ঘ্য' ইত্যাদি। মন্মথ রায়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি একাঙ্ক নাটক হিসেবে 'রক্ত কদম', টোটোপাড়া', 'মরা হাতি লাখ টাকা', 'কোটিপতি নিরুদ্দেশ', 'মহাসাগর'-এর নাম করা যায়। বেশ কয়েকটি চিত্রনাট্য তিনি রচনা করেন। যেমন 'কুমকুম', 'মীনাক্ষী(', 'হসপিটাল', 'পয়গম' ইত্যাদি।

মন্মথ রায়ের নাট্যচর্চায় তাঁর শিল্পদৃষ্টি তথা জীবন দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান দুটি স্তর আমরা লক্ষ করি। একটা প্রাক-স্বাধীনতা পর্ব আর অন্যটা স্বাধীনতা পরবর্তী পর্ব। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে নাট্যকারের মধ্যে আমরা পাই, সময়-সঞ্জাত প্রগতিশীল আধুনিক জীবন দৃষ্টিভঙ্গি। সময়ের মূল্য বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তাঁর হাতে যথাযথভাবে ধরা দিল যুগোপযোগী নাট্য-আঙ্গিক একাঙ্ক। শুধু প্রকরণগতভাবে নয়, নাটকের বিষয়বস্তুতে যুগমানসের প্রতিফলন ধরা পড়ল নির্ভুলভাবে। পুরাণের কাহিনি নিয়ে নাটক লিখলেন; কিন্তু তাতে পুরাণের ভক্তিরস গৌণ হয়ে গেল, বড়ো হয়ে উঠল সমকালীন জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা। আধুনিক মানুষের প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ সেখানে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে। কোথাও দেখি,দেব বিদ্রোহী প্রতিনায়কেরাই সেখানে নায়কপ্রতিম হয়ে উঠেছে। যেমন— চাঁদ সদাগর, বৃত্রাসুর, কংস। পাপাত্মা ও ঘৃণ্য চরিত্রের পক্ষেও যে কিছু যুক্তি, কিছু কৈফিয়ত আছে, তা নাটকে জোরালো ভাবে দেখানো হয়েছে। 'কারাগার'-এর মধ্যে যে জাতীয় আবেগ পুরাণের মোড়কে পরিবেশিত হয়েছিল, মীরকাশিম নিয়ে লেখা ঐতিহাসিক নাটকে তা এল সরাসরি— প্রবলভাবে। আধুনিক জীবনের ঘাত, প্রতিঘাত, জটিল মনস্তত্ত্ব ধরা পড়েছে 'অশোক; ও 'খনা'র মতো নাটকে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মন্মথ রায়ের নাট্যসত্তায় প্রত্যাশিত বদল ঘটে। নানা ঘটন-অঘটনের মধ্য দিয়ে এল দেশের স্বাধীনতা। বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জনের পর দেখা গেল সাধারণ মানুষের জীবনে তখনো শোষণ,পীড়নের অত্যাচার। সংশয়হীনভাবে তিনি নিজেই বলেছেনঃ ''দ্বিতীয় পর্বে আমার পরবর্তী নাটকগুলি রাজনৈতিক এবং সামাজিক ভাবধারার সঙ্গে অধিকতর সংযুক্ত না হয়ে পারেনি। কারণ যুগমানসকে উপেক্ষা করা নাট্যকারের ধর্ম নয়।'' বলা যায় সময়ের ডাকে তিনি হয়ে উঠলেন গণনাট্য যুগের সাংস্কৃতিক যোদ্ধা। এই পর্বে তাঁর বিদ্রোহ হল শোষিত নিম্নশ্রেণির পক্ষ নিয়ে ধন ও ক্ষমতামত্ত শাসক ও শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে। তখনকার সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক নানা পদে তিনি আসীন ছিলেন; কিন্তু কখনো তিনি আপস করেননি।১৯৬২ তে তখনকার পশ্চিমবঙ্গের শাসক 'ড্রামাটিক পারফরম্যান্স বিল' নামে যে কালাকানুন পুনঃপ্রবর্তিত করতে চেয়েছিলেন, তাতে সমস্ত বুদ্ধিজীবী দলমত নির্বিশেষে প্রতিবাদে এককাট্টা হয়েছিলেন। এই প্রতিবাদ-আন্দোলনের সামনে ছিলেন মন্মথ রায়। বিলটি সরকার তুলে নিতে বাধ্য হয়। মন্মথ রায়ের কর্মধারা লক্ষ করলে এটা বোঝা যায়, সমাজতন্ত্রের পক্ষে তিনি জোরালো সওয়াল করেছেন বারবার। কিন্তু তাঁর সমাজতন্ত্র কোনো বিশেষ পুস্তক পাঠের ফসল নয়, যে কারণে তা কোনো বিশেষ তত্ত্বের ঘেরাটোপে আবদ্ধ ছিল না। বরং বলা যায় তাঁর সমাজতন্ত্র মানবিকতা বোধে অনুপ্রাণিত এক মতবাদ। তাই রামকৃষ্ণদেব, মা সারদা। স্বামী বিবেকানন্দ, গান্ধিজি বা লেনিনের কথা তাঁর নাটকে এসে যায় অনায়াসে। বলা যায় ভাববাদী সমাজতন্ত্র, অধ্যাত্মবাদ, গান্ধিবাদ ও লেনিনবাদের মিলিত পথই তাঁর পথ। এরজন্য কোনো রাজনৈতিক দলের ভিতরের লোক তিনি ছিলেন না।

কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর জায়গাটি ছিল পরম শ্রদ্ধার। সেই জায়গা থেকে তিনি নাট্যচর্চা করেছেন, একজন দায়বদ্ধ শিল্পী হিসেবে কর্তব্য পালন করে গেছেন।

১১.৫ সারাংশ

রাজনৈতিক দর্শনের চেয়ে মানবিক জীবনভাবনাকে নাটকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তুলসী লাহিড়ী। শাসকের শোষণ কীভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে মানুষকে যন্ত্রণাদগ্ধ করে তা অত্যন্ত সহমর্মিতার সঙ্গে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরসহ খনি অঞ্চলের বিচিত্র জীবন-যাপনের কথা আছে এখানে। তুলসী লাহিড়ীর নাটক আসলে সমাজ জীবনের ছবি। মন্মথ রায়ও তুলসী লাহিড়ীর মতো একই পথের পথিক। সাধারণ মানুষের জীবনের কথা বলার পাশাপাশি তিনি পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক উভয় প্রকারের নাটক লিখে বাংলা নাট্য সাহিত্যে বিশেষ অবদান রেখেছেন। মানবিক আদর্শ নিয়ে ও প্রত্যয় নিষ্ঠ হয়ে নাটক রচনার মাধ্যমে মহৎ সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন উভয়েই।

১১.৬ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) বাংলা নাট্য সাহিত্যে তুলসী লাহিড়ীর অবদান আলোচনা করুন।

২) বাংলা একাঙ্ক নাটকের জনক মন্মথ রায়ের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৩) 'দুঃখীর ইমান' এবং 'ছেঁড়া তার' তুলসী লাহিড়ীর বিখ্যাত রচনা দুটি দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে লেখা— প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে নাটক দুটির পরিচয় দিন।

৪) পূর্ণায়ত নাটক ও একাঙ্ক নাটক উভয় শ্রেণির নাটকে তুলসী লাহিড়ীর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন— বিশদে আলোচনা করুন।

৫) মন্মথ রায় রচিত ইতিহাসাশ্রয়ী নাটকগুলির পরিচয় দিন।

৬) প্রাক্ স্বাধীনতা পর্ব এবং স্বাধীনতা উত্তর পর্বে মন্মথ রায়ের নাট্যচর্চায় যে জীবনদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) গণনাট্য-নবনাট্য ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

২) তুলসী লাহিড়ীর বেতার নাটক 'ঠিকাদার'-এর পরিচয় দিন।

৩) 'বহুরূপী' গ্রুপ থিয়েটার গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করুন।

৪) টীকা লিখুন — 'বাংলার মাটি' নাটক।

৫) 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার' নাটকের পরিচয় দিন।

৬) মন্মথ রায়ের নাটকের চারটি পর্যায়ের ভাগ সালসহ উল্লেখ করুন।

৭) টীকা লিখুন— 'কারাগার' নাটক।

৮) মন্মথ রায় রচিত কয়েকটি জীবনীমূলক নাটকের উল্লেখ করে যে-কোনো একটির পরিচয় দিন।

১১.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৩য় খণ্ড)— অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (৩য় খণ্ড)—সুকুমার সেন।

৩) বাংলা নাটকের ইতিহাস— অজিতকুমার ঘোষ।

৪) বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস — ক্ষেত্র গুপ্ত।

৫) বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস — দর্শন চৌধুরী।

একক-১২ ❑ উৎপল দত্ত, বাদল সরকার

গঠন

১২.১. উদ্দেশ্য
১২.২ প্রস্তাবনা
১২.৩ নাট্যকার উৎপল দত্ত
১২.৪ নাট্যকার বাদল সরকার
১২.৫ সারাংশ
১২.৬ অনুশীলনী
১২.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১২.১ উদ্দেশ্য

এই এককে যে বিষয়গুলি জানা যাবে তা হল— নাটক, যাত্রা, চলচ্চিত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে উৎপল দত্তের নাট্য প্রতিভার কথা। নাট্যকার ও নাট্য পরিচালক উৎপল দত্তের সমাজভাবনার কথা। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর স্বপ্নের কথা। বাদল সরকার বাংলা নাটকের তৃতীয় ধারা বা থার্ড থিয়েটারের জনক। বিশিষ্ট ধারার এই নাট্যকারের নাট্যবৈশিষ্ট্যের স্বরূপ জানা যাবে এখানে। পাওয়া যাবে উৎপল দত্ত ও বাদল সরকারের আধুনিক বাংলা নাটকের পরিচয়। অন্যান্য অনেক নাট্যকারের মতো উৎপল দত্ত, বাদল সরকার কীভাবে বাংলা নাটকের মানচিত্রকে বড়ো করেছেন সেই প্রসঙ্গ। জীবনশিল্পী উৎপল দত্ত এবং বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বাদল সরকারের নাট্য-জীবনের নানা দিক প্রকাশ করাই এই এককের উদ্দেশ্য।

১২.২ প্রস্তাবনা

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলায় এক প্রবলতম নাট্যব্যক্তিত্ব হলেন উৎপল দত্ত। তিনি একজন বড়ো মাপের অভিনেতা, অভিনয়-শিক্ষক, নাট্যপরিচালক, নাট্যবোদ্ধা এবং নাট্যকার। প্রতিটি সত্তাই প্রতিটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এই প্রতিটি সত্তাকে জুড়ে দিয়েছিল এক জোরালো জীবন দৃষ্টিভঙ্গি তথা শিল্প দৃষ্টিভঙ্গি— যার ভরকেন্দ্রে রয়েছে এক প্রবল কমিউনিস্ট সত্তা।

এখানে আমরা আলোচনা করব তাঁর নাট্যকার সত্তা নিয়ে; অবশ্যই প্রাসঙ্গিকতা বোধে অন্যান্য সত্তার কথা এসে যাবে। গণনাট্য সংঘের অগ্রণী সংগঠক বা তেমন কোনো পদাধিকারী ছিলেন না উৎপল দত্ত। খুব অল্প সময় যুক্ত ছিলেন তিনি এই সংগঠনের সঙ্গে। কিন্তু নাটক বা নাট্যচর্চার মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে উৎপল দত্ত ছিলেন সংঘের প্রাথমিক নাট্যকারদের তুলনায় আরও তীব্র, আরও শক্তিশালী এবং স্বতঃস্ফূর্ত। উৎপল দত্তই পথ দেখালেন। সোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকার নিগ্রো, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ থেকে শোষিত, নির্যাতিত মানুষ এল নাটকের কাহিনিতে। তুলে ধরা হল তাদের সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী শক্তির

সঙ্গে এবং অবশেষে তাদের অন্তিম জয়। এইসূত্রে উৎপল দত্তের হাত ধরে বাংলা নাটক যুক্ত হল বিশ্বনাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা নাট্যসাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র স্থানের অধিকারী হলেন বাদল সরকার (১৯২৫-২০১১)। নাটকের বিষয় ও রীতি নিয়ে তাঁর নিত্যনতুন কৌতূহল বাংলা নাট্যসাহিত্যে সার্বিক বৈচিত্র এনেছে। কৌতুক নাটক নিয়ে তাঁর আত্মপ্রকাশ, কিন্তু হঠাৎ ঝুঁকে পড়েন অ্যাবসার্ড নাটকের দিকে। কিন্তু সেখানেই থেকে থাকেননি, আবার অন্য পথ ধরেছেন। তাঁর নাটক নিয়ে বিতর্ক কম নেই, কিন্তু নাট্যকার বাদর সরকারকে অস্বীকার করা যায় না। এবং এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে তিনি আধুনিক বিশ্ব নাট্যন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন বাংলা নাটককে।

১২.৩ নাট্যকার উৎপল দত্ত

উৎপল দত্ত জন্মেছিলেন অবিভক্ত বাংলাদেশের বরিশালে; কিন্তু বেড়ে-ওঠা তথা ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়েছে এ বাংলায়— শিলং, বহরমপুর এবং কলকাতায়। উৎপল দত্তের নাট্যজীবনের শুরু কলকাতার সেন্ট লরেন্স স্কুলে। নাট্যাভিনয় সূত্রে যাতায়াত শুরু হয় সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। বাবা গিরিজারঞ্জন ছিলেন শেক্সপিয়ারের অনুরাগী পাঠক। পুত্র উৎপলও ছোটো থেকে আবৃত্তি করতেন শেক্সপিয়ারের নাটক। স্কুলজীবন থেকেই নাটক ও রাজনীতি বিষয়ে প্রখর সচেতন তিনি। কলেজ জীবনে থিয়েটার তথা নাট্যচর্চাকে বেশি সময় দেওয়ার জন্য প্রিয় বিষয় ইতিহাস না নিয়ে,নিলেন ইংরেজিতে অনার্স। এই কলেজের ছাত্রজীবনেই লিখলেন তাঁর প্রথম নাটক 'Betty Belshazzar' (১৯৪৯)। গড়ে তুললেন নাটকের দলও —'দ্য অ্যামেচার শেক্সপিয়ারিয়ানস'। অভিনয়কে জীবনের ধ্রুবতারা করে নিলেন। পারিপার্শ্বিকতার তাপচাপে নাট্যাভিনয়কে নিছক শৌখিন মজদুরি না করে মানুষের বেঁচে থাকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার কথা ভাবলেন। সেই ভাবনা থেকে তৈরি করলেন 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ'। ভাবনাগত নৈকট্যের কারণে এই সময় যোগদান করেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘে। সংঘে তিনি বেশিদিন থাকেননি ঠিকই, কিন্তু গণনাট্যের আদর্শ উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁকে। সেই সময়ের কথা স্মরণ করতে গিয়ে পরবর্তীকালে জানিয়েছেন উৎপল দত্ত ঃ "নাটক হবে বাংলায়, নাটক হবে অসংখ্য সাধারণ মানুষের জন্য, নাটক কইবে সংগ্রামের কথা সর্বস্তরের সংগ্রাম,প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ।"

উৎপল দত্তের লেখা প্রথম মৌলিক নাটক হল 'ছায়ানট' (১৯৫৯)। প্রসঙ্গত একটি তথ্য কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না, তা হল নাট্যকার উৎপল দত্তের হয়ে-ওঠার প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিলেন শোভা সেন। অকপট উৎপলকে তাই বলতে শুনিঃ "প্রধানত শোভা সেনের নাছোড়বান্দা তাগিদে আমি প্রথম মৌলিক নাটক লিখি— ছায়ানট। নাটক লেখা আমার কল্পিত ভবিষ্যত ছকে কোনোদিনই ছিল না। পথনাটিকা লিখতাম, কিন্তু মঞ্চের জন্য পূর্ণাঙ্গ নাটক লেখার যোগ্যতা আমার আছে এমন চিন্তাও মাথায় আসেনি।" আরও এক অন্তরঙ্গ প্রেরণার কথা উৎপলের স্বীকারোক্তি থেকে পাওয়া যায়। উৎপল জানাচ্ছেন ঃ "নাটক লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম কেন না অনেক খুঁজে আমরা যে নাটক চাই তা পাইনি। কিছু চাষির কান্না বা মধ্যবিত্ত পরিবারের বিলাপের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছিল তৎকালীন গণনাট্য। (লিটল থিয়েটার ও আমি)"— 'ছায়ানট' এই ভাবনায় হাতেখড়ি— শিক্ষানবিশী পর্যায়ের রচনা।

নাটকের সর্বক্ষণের কর্মী হবেন বলেই ছেড়ে দিলেন সাউথ পয়েন্ট স্কুলের চাকরি। এই সময়কালেই রচনা করেন 'অঙ্গার'(১৯৫৯) নামক বিখ্যাত নাটক। এই নাটক রচনার পিছনে একটি বড়ো ঘটনাও রয়েছে। ওই সময়ে ধানবাদের বড়াধেমো কয়লাখনিতে একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। কয়লাখাদে আগুন ধরে যায়। পাহাড় ধ্বসে পড়ে। ভিতরের শ্রমিকদের বেরোনোর পথ বন্ধ যায়। শ্রমিকদের কথা ভেবে খাদের মধ্যে জলস্রোত ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

এরকম একটি ভয়াবহ বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে মাত্র পনেরো দিনে নাটকটি রচনা করেন উৎপল। এর প্রযোজনাও বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। এর পরের উল্লেখযোগ্য নাটক 'ফেরারী ফৌজ' (১৯৬১)। ১৯৩০ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নাটকটি রচিত। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর বিখ্যাত কবিতার নাম নাটকের সঙ্গে যুক্ত করার অনুমতি দিয়েছিলেন। অদ্বৈত মল্লবর্মনের বিখ্যাত উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম'কে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন এই সময়কালেই। বিদেশি নাটকের অনুবাদ উৎপল দত্ত বহুবার করেছেন।১৯৬৪ এর দাঙ্গা ও পরবর্তীকালের ঘটনায় ক্রুদ্ধ উৎপল একটি বিদেশি নাটক অনুবাদ করে লেখেন 'প্রোফেসর মামলক'(১৯৬৫)। এতে তিনি দেখালেন, জাতি বিদ্বেষ ব্যবহার করে কীভাবে শাসকশ্রেণি শ্রমিকশ্রেণির শক্তি নষ্ট করে দেয়, তার আলেখ্য। ১৯৪৬ এর নৌবিদ্রোহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখেন 'কল্লোল'(১৯৬৫)। 'কল্লোল' অভিনীত হয়েছিল আটশো পঞ্চাশ রজনী। নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচনা 'তীর' (১৯৬৭) নাটকে উৎপল তুলে ধরলেন জোতদারদের অত্যাচার,পুলিশের জুলুম এবং কৃষকের প্রতিরোধ। 'অজেয় ভিয়েতনাম'(১৯৬৬) এর কাছাকাছি সময়ের রচনা। এর মধ্য দিয়ে বলা যায় বাংলা নাটক দেশ ছাড়িয়ে বিশ্বপ্রেক্ষিত খুঁজে নিল নিজের কথাকে বলার জন্য। ১৯৫৯-১৯৭০ উৎপল দত্তের নাট্যজীবন মিনার্ভা পর্ব নামে পরিচিত। এই পর্বে নাট্যকার উৎপলের শেষ যে দুটি নাটক আমরা পেয়েছিলাম, সেগুলি হল 'মানুষের অধিকারে' এবং 'লেনিনের ডাক'।

১৯৭১-১৯৯৩ উৎপল দত্তের নাট্যজীবনের পি এল টি পর্ব। আসলে ১৯৭১-এ তিনি তৈরি করেন তাঁর নতুন নাটকের দল, যার নাম পিপলস্ লিট্ল থিয়েটার বা পি এল টি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। পি এল টির জন্য তিনি প্রথম লেখেন 'ঠিকানা'। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা। এই পর্বের দ্বিতীয় নাটক 'টিনের তলোয়ার' (১৯৭১)। রাজনীতির প্রত্যক্ষ যোগ এই নাটকে নেই ঠিক কথা; কিন্তু উৎপল দত্ত জাত চেনালেন এই নাটকের মধ্য দিয়ে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের শতবার্ষিকীকে উপলক্ষ করে তিনি বুঝিয়ে দিলেন দায়বদ্ধ নাটক বা থিয়েটার বা থিয়েটারকর্মীর কোনো থেমে যাওয়া নেই; সময়ের চড়াই-উৎরাই ভেঙে তাকে তার বক্তব্যে থাকতে হয় অবিচল। এই সময়কালেই ইতিহাসের প্রেক্ষিতে রচিত হয় 'সূর্য শিকার'। ১৯৭২-তে উৎপলের হাত থেকে পাওয়া গেল আরও একটি বিখ্যাত নাটক 'ব্যারিকেড'। পশ্চিমবঙ্গের আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের প্রেক্ষিতে লেখা হয় নাটকটি। মোঘল ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রচিত 'টোটা' মঞ্চস্থ হয় ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দিল্লির লালকেল্লায়।

বিশ শতকের সত্তরের দশকের মাঝামাঝি।পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অস্থিরতা ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। চারিদিকে খুনোখুনি, মাস্তানি। এরকম এক সন্ত্রাসকবলিত সময়ের কথা বলল 'দুঃস্বপ্নের নগরী'। আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই নাটকের অভিনয়ের ওপর আক্রমণ নেমে এল। কিন্তু উৎপলের কলম ও কণ্ঠ থেমে থাকেনি। তিনি লিখেছেন একের পর এক নাটক— 'লেনিন কোথায়?', 'এবার রাজার পালা', তিতুমীর', 'স্তালিন ১৯৩৪'। মাইকেল মধুসূদন দত্তকে নিয়ে লিখলেন 'দাঁড়াও পথিকবর'। কাল মার্ক্স এর মৃত্যু শতবর্ষ উপলক্ষে রচনা করেন 'শৃঙ্খল ছাড়া' (১৯৮৩)। 'মালোপাড়ার মা'এই সময়ের রচনা। দেশভাগ ও গান্ধিহত্যা নিয়ে লেখেন 'একলা চলো রে'। উৎপল দত্তের নাট্যকার জীবনের শেষ তিনটি নাটক (অসুস্থ অবস্থায় রচনা) হল 'লালদুর্গ'(১৯৯০), 'জনতার আফিম' এবং 'ক্রুশবিদ্ধ কিউবা'।

বাংলা যাত্রাকেও উৎপল দত্ত সমৃদ্ধ করেছেন নিজের প্রিয় বৈপ্লবিক জাগরণী মন্ত্র দিয়ে। লিখেছেন 'রাইফেল', 'জালিয়ানওয়ালাবাগ', 'সন্ন্যাসীর তরবারি', 'অরণ্যের ঘুম ভাঙছে', 'দামামা ঐ বাজে'-এর মতো পালা। সংখ্যাটা কুড়ির কম নয়। আসলে যাত্রার উপাদান তিনি থিয়েটারে আনতে চেয়েছিলেন। উৎপল দত্ত নিবিড়ভাবে যুক্ত

ছিলেন চলচ্চিত্রের সঙ্গেও। এতে অভিনয় করেছেন দাপটের সঙ্গে। চলচ্চিত্র পরিচালনাও করেছেন। এক সময় চিত্রনাট্য রচনাতেও হাত দিয়েছেন। 'ঝড়' (১৯৮২) ছবির চিত্রনাট্য ও পরিচালনা উৎপল দত্তের। এতে তিনি অভিনয়ও করেছিলেন। গোর্কির মা-কে তিনি নিজের মতো করে উপস্থাপন করেছিলেন 'মা' ছবিতে। চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য তিনি কিছু পুরস্কারও পেয়েছিলেন। উৎপল দত্তের সমস্ত কাজকর্মের সঙ্গে রাজনীতির যোগ ছিল অকাট্য। আসলে যে আদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন তার প্রচার এবং প্রকাশে কোনো রকম দ্বিধা ছিল না তাঁর। বিপরীত পন্থীরা তাঁর কাজের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি অকুতোভয়। তাঁকে অস্বীকার করতে পারেন না তাঁর অতি বড়ো শত্রুও; বাংলা নাট্যচর্চার মধ্য দিয়ে যিনি নিজেকে করে তুলেছিলেন আন্তর্জাতিক নাট্যব্যক্তিত্ব।

১২.৪ নাট্যকার বাদল সরকার

বাদল সরকারের জন্ম কলকাতায়। প্রকৃত নাম সুধীন্দ্রনাথ। বাদল দিনে জন্মেছিলেন, ভেসে গিয়েছিল কলকাতা। তাই বাবা, ঠাকুরদা ডাকলেন বাদল নামে। এই নামেই পরিচিত হলেন দেশে-দেশান্তরে। হাওড়ার শিবপুরে পড়তেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং। যুক্ত হন বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনে, পরে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত অবশ্য পার্টির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। এই সময়েই বলা যায় থিয়েটারকে আঁকড়ে ধরলেন। অবশ্য নাটকের প্রতি ভালোবাসা আশৈশব। ছোটোবেলায় নাটক পড়তেন, রেডিওতে নাটক শুনতেন। কৈশোরেই একটি ইংরেজি নাটক বাংলায় রূপান্তর করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বাদল সরকার স্বয়ং জানিয়েছেনঃ ''... সেই ঘটনাকেই বলা যেতে পারে আমার নাট্যজগতে প্রবেশ। একাধারে নাট্যকার,পরিচালক এবং প্রধান অভিনেতা হিসেবে।" তখনকার বিহারের মাইথনে সহকর্মীদের নিয়ে গঠন করলেন 'রিহার্সাল ক্লাব'। অভিনয়যোগ্য নাটকের অভাবে শুরু করলেন নাটক রচনা। শুরুটা হল কমেডি বা হাসির নাটক দিয়ে। প্রথম নাট্যরচনা 'সলিউশন এক্স' (১৯৫৬)। বিদেশি চলচ্চিত্রের অনুসরণে এটি লেখা। লন্ডনে বসে লেখেন মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাটক 'বড়ো পিসিমা' (১৯৫৯) এবং ছোটো নাটক 'শনিবার' (১৯৫৯)। দুটিই লঘুরসের। দেশে ফিরে লিখলেন 'রাম শ্যাম যদু' (১৯৬১)।একের পর এক নাটক লিখে চললেন।

প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটলেও সমকালীন আর্থসামাজিক সমস্যা থেকে কোনোদিনই মুখ ঘুরিয়ে নিতে পারেননি।তাই ১৯৬০এর দশকে যেসব আর্থসামাজিক মঞ্চনাটক লিখলেন, সেখানে আমরা দেখলাম তাঁর মানসিক টানাপোড়েন। এই সময়ের রচনাগুলি হল 'এবং ইন্দ্রজিৎ' (১৯৬৩), 'সারারাত্তির' (১৯৬৩), 'বাকি ইতিহাস' (১৯৬৫), 'ত্রিংশ শতাব্দী' (১৯৬৬),'পাগলা ঘোড়া' (১৯৬৭),'সার্কাস' (১৯৬৯) ইত্যাদি। এর মধ্যে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' এবং 'পাগলা ঘোড়া' সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৫০-এর দশক থেকেই বাদল সরকার একজন থিয়েটার কর্মী। প্রথমে শুরুটা করেছিলেন অপেশাদারভাবে। ১৯৬৭-তে গড়ে তোলেন নিজের নাট্যদল 'শতাব্দী'। এর জন্য মঞ্চনাটক লিখতে গিয়ে টের পেলেন প্রসেনিয়াম মঞ্চ ও তার অনুসারী নাটকের সীমাবদ্ধতা। এখান থেকে বেরোনোর পথ খুঁজতে লাগলেন। প্রথমে বিকল্প থিয়েটার হিসেবে খুঁজে পেলেন অঙ্গনমঞ্চ। বিকল্প থিয়েটারের খোঁজ অঙ্গনমঞ্চেই থেমে থাকেনি। গ্রহণ করলেন মুক্তমঞ্চকে। শেষপর্যন্ত প্রসেনিয়াম থিয়েটারের প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার সঙ্গে লোকনাট্যের আঙ্গিক মিলিয়ে তিনি তৈরি করলেন এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের থিয়েটার— থার্ড থিয়েটার নামে যা পরিচিত। এই থিয়েটার একইসঙ্গে নমনীয়,বহনীয় এবং সুলভ। এই নাট্যধারায় বাদল সরকার লিখলেন একের পর এক নাটক। 'স্পার্টাকুস' (১৯৭৩)কে এই ধারার প্রথম নাটক বলা যেতে পারে। এই ধারার আরও নাটকগুলি হল 'মিছিল' (১৯৭৪), 'রূপকথার কেলেঙ্কারী'

(১৯৭৫), 'লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী' (১৯৭৫), 'ভোমা' (১৯৭৬) 'সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস' (১৯৭৬), হট্টমেলার ওপারে' (১৯৭৭), 'বাসি খবর' (১৯৭৮), 'উদ্যোগ পর্ব' (১৯৮২), 'খাট মাট ক্রিং' (১৯৮৩), 'ভুল রাস্তা' (১৯৮৮), 'ক চ ট ত প' (১৯৯৩), 'বগলাচরিতমানস' (১৯৯৭), 'সুটকেস','বীজ', ভানুমতী কা খেল', 'নাট্যকারের সন্ধানে তিনটি চরিত্র' ইত্যাদি।

'বড়ো পিসিমা' লঘুরসের নাটক। এ নাটকে কৌতুকরস এসেছে প্রধানত পরিস্থিতি থেকে। ঘটনা এ নাটকে তুলনামূলকভাবে কম। বরং ক্ষিপ্র ও দ্যুতিময় এই নাটকের সংলাপ কৌতুকের অগ্নিকণার মতো জ্বলে জ্বলে ওঠে। নাট্যসমালোচক অজিতকুমার ঘোষ এই নাটক ও নাট্যকার সম্পর্কে জানাচ্ছেনঃ ''নাট্যকার বিভিন্ন চরিত্রের হাব-ভাব, ক্রিয়া ও আচরণ সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করিয়াছেন সেগুলিও খুব সরস ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। সেগুলির শুধুমাত্র নাটকের পাঠকরাই পাইবেন,দর্শকরা সেই রস হইতে বঞ্চিত হইবেন।'' নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় ১৯৬০ সালে। প্রযোজনা করে 'চক্র' বলে কলকাতার একটি সংগঠন, যার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বাদল সরকার নিজে। এধরনের নাটক লেখার কারণ হিসেবে নাট্যকারের যুক্তি হল, বাংলায় সার্থক হাসির নাটক সংখ্যায় কম। হাসিটাও যে জীবনের একটা অংশ, এটা মানতেন 'এবং ইন্দ্রজিৎ'এর নাট্যকার। তাই নাট্যজীবনের শুরুর দিকে যেমন হাসির নাটক লিখেছেন, তেমনি পরের দিকেও লিখেছেন। তারই উদাহরণ 'বিচিত্রানুষ্ঠান', 'যদি আর একবার', 'বল্লভপুরের রূপকথা', 'কবিকাহিনি' ইত্যাদি।

'এবং ইন্দ্রজিৎ' বাংলা নাট্যসাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। নাটকটির শ্রেণি-পরিচয় নিয়ে রীতিমতো বিতর্ক। অনেকেই মনে করেন বাদল সরকারের এই রচনাটি অ্যাবসার্ড নাটক। আবার কেউ কেউ তা মনে করেন না। নাট্যসমালোচক ও বাংলা নাট্যসাহিত্যের ঐতিহাসিক অজিতকুমার ঘোষ তাঁর 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেনঃ ''বাদল সরকারের বহু-বিতর্কিত নাটকটি আধুনিক বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ নূতন নাট্যধারা প্রবর্তন করিল। এই নূতন নাট্যধারা বর্তমান বিশ্বনাটকে 'অ্যাবসার্ড' নাট্যধারা নামে পরিচিত।'' বলাবাহুল্য অ্যাবসার্ড নাটকের মূলে রয়েছে এক নেতিবাচক জীবনদর্শন। এই জীবনদর্শন হল সঙ্গতি,সামঞ্জস্য ও অর্থময়তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সমালোচক মনে করেন,এই নাটকে লেখক ও ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে নেতিবাচক জীবনদর্শনই ব্যক্ত হয়েছে। এ নাটকে মৃত্যুকামনা বড়ো প্রবল। ইন্দ্রজিতের কথায় এক জায়গায় পাই, 'আসলে মরে যাওয়াটা পরম সুখের। কত লোক মরে সুখে আছে।— আমাকেও তো একদিন না একদিন ঐ রকম মরতে হবে। এখনই মরি না কেন?' কিন্তু শেষপর্যন্ত এই নাটক হতাশার কথা বলে না। নাটক শেষ হয় এই উচ্চারণেঃ 'পথ,আমাদের শুধু পথ আছে।' বাদল সরকার নিজেও এই নাটকটিকে স্বপ্নভঙ্গের নাটক মনে করতেন না।

'বাকি ইতিহাস'নাটকেও রয়েছে ক্লান্তি, অবসাদ, শূন্যতাবোধ, আত্মহত্যা-প্রবণতা ইত্যাদি অ্যাবসার্ড নাটকীয় কিছু বৈশিষ্ট্য। নাটকের শুরুটা এইরকমঃ শরদিন্দু ও বাসন্তী খবরের কাগজে তাদের পরিচিত সীতানাথ চক্রবর্তী নামক এক ব্যক্তির আত্মহত্যার খবর পড়ে বিচলিত হয় ও তারা সেই খবর নিয়ে দুটি কাহিনি রচনা করে। নাটকের শেষাংশে দেখি, বিমূঢ়, উদভ্রান্ত শরদিন্দু আত্মহত্যা করতে যায়, এমন সময় তার বন্ধু শরদিন্দুর চাকরিতে প্রোমোশনের খবর আনে। দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে শরদিন্দু ফেরে প্রাণের পৃথিবীতে। জটিল মনস্তত্ত্বমূলক নাটকটি প্রযোজনা করে বহুরূপী নাট্যসংস্থা। 'পাগলা ঘোড়া'তে দেখি, শ্মশানের অন্ধকারে বসে আছে চার ব্যক্তি, যাদের জীবনে সব আশা,আনন্দ, প্রেম ধ্বংস হয়ে গেছে। এমন এক ধ্বংসকালীন পরিস্থিতিতে হাজির হয় এক মেয়ে, যে নিয়ে আসে জীবনের আস্বাদ ও আহ্বান। বিধ্বস্ত পুরুষগুলির উদ্দেশ্যে গভীর আততি মিশিয়ে বলে ওঠেঃ '' পাগলা ঘোড়া! একটু আমার দিকে এসো না? একটু ডেকে বলো না-ওরে বিবি সরে দাঁড়া। আমি কি বিবি নই? আমি কি বিবি হতে

পারিনা ?" বহুরূপীর বিখ্যাত প্রযোজনাগুলির মধ্যে 'পাগলা ঘোড়া' অন্যতম। মঞ্চনাটক হিসেবে এই নাটকগুলি লেখা হলেও প্রকরণ প্রথাগত নয়। স্বভাববাদী মঞ্চনাটকের গণ্ডি পেরনোর একটা চেষ্টা লক্ষ করা যায় এই নাটকগুলিতে।

বাদল সরকারের তৃতীয় ধারার সব নাটকেই আমরা পাই, শোষণভিত্তিক চেহারা আর সেই সঙ্গে বলা হয়েছে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রয়োজনীয়তার কথা। কিন্তু তাই বলে শিল্পগত দিকটি উপেক্ষা করা হয়নি। এই ধারার নাটকগুলিতে বিষয়গত বৈচিত্র্য যথেষ্ট। আর তা পরিবেশন করার জন্য নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন কৌশল। অতীত বা বর্তমানের শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার ছবি আঁকতে কখনো ইতিহাসের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, কখনো রামায়ণ-মহাভারতের কোনো পর্বকে কাজে লাগানো হয়েছে, আবার কখনো সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে ব্যবহার করা হয়েছে। নাটকের আঙ্গিকে পাই কোলাজ, কখনো ফ্যান্টাসি বা কবিগানের মতো লোকশিল্পের প্রয়োগ। এর মধ্য দিয়েই বাদল সরকার তাঁর তৃতীয় ধারার নাটককে পাঠক-দর্শকের কাছে নিয়ে গেছেন। পাঠক বিশেষত দর্শক ভেতর থেকে এই ধরনের নাটকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ভারতীয় থিয়েটারে এ এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। ভারতের বাইরেও তাঁর নাটক তথা থিয়েটার নন্দিত হয়েছে। বলা হয়, বাদল সরকারের 'মিছিল' থেকে লাহোরের আধুনিক নাটকের সূত্রপাত। আধুনিক ভারতীয় থিয়েটারের ইতিহাসে বাদল সরকার এক অগ্রণী পুরুষ। মারাঠিতে যে কাজটা করেছেন বিজয় তেন্ডুলকর, হিন্দিতে মোহন রাকেশ কিংবা কানাড়ায় গিরিশ কারনাড, বাংলায় এই কাজটাই করেছেন বাদল সরকার। তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ নানা পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন বাদল সরকার। পেয়েছেন 'সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার', 'সংগীত নাটক আকাদেমি ফেলোশিপ' এবং 'পদ্মশ্রী'।

১২.৫ সারাংশ

উৎপল দত্ত বাংলা তথা ভারতবর্ষের অন্যতম নাট্যপ্রতিভা। নাটক রচনা, পরিচালনা, নাটক ও চলচ্চিত্রে অভিনয় উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর দক্ষতা তুলনা রহিত। মার্কসবাদে বিশ্বাসী এই শিল্পীর নিজস্ব একটা দর্শন ছিল। তিনি সারাজীবন অত্যাচার-অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। ভিন্ন স্বাদের নাটকের মাধ্যমে জারি ছিল তাঁর এ লড়াই। স্বপ্ন দেখেছেন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার। শতাধিক নাটকে শ্রমিক, কৃষক, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা লিখে মানবিক দায়বদ্ধতা পালন করেছেন তিনি। সমাজ সচেতন শিল্পী হিসাবে এটা তাঁর কর্তব্য বলে তিনি মনে করতেন।

প্রায় একই বক্তব্য পরিবেশন করা যায় নাট্যকার বাদল সরকারের স্বপক্ষে। তিনিও তাঁর সময়ের বিশিষ্ট নাট্যকার। বিচিত্র বিদ্যার অধিকারী এই নাট্যকার আধুনিক নাট্যসাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি অ্যাবসার্ড ও তৃতীয় ধারার নাটকের অন্যতম প্রবক্তা। অজস্র নাটক যেমন তিনি অনুবাদ করেছেন, তেমনি তাঁর নাটক বিভিন্ন ভারতীয় ও ইংরেজি ভাষায় অনূদিতও হয়েছে। তাঁর নাটকে শোষিত, অত্যাচারিত নিম্নবর্গের মানুষের কথাও আছে। বহুমুখী প্রতিভা ও নাট্যচর্চার কারণে তিনি যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করেছেন।

১২.৬ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) নাট্যকার উৎপল দত্তের নাট্যজীবনের ধারাবাহিক পরিচয় লিপিবদ্ধ করুন।

২) নাট্যকার উৎপল দত্তের নাট্য-প্রবণতাগুলি আলোচনা করুন।

৩) উৎপল দত্ত একজন প্রথম শ্রেণির নট, নাট্যকার ও নাট্য পরিচালক—উক্তিটির আলোকে নাট্যকারের পরিচয় দিন।

৪) 'অঙ্গার', 'কল্লোল', 'ফেরারী ফৌজ', 'টিনের তলোয়ার'— উৎপল দত্তের নাট্যজীবনের এক একটি আলোড়িত পর্ব—আলোচনা করুন।

৫) বাংলা নাট্যসাহিত্যে বাদল সরকারের অবদান আলোচনা করুন।

৬) বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বাদল সরকারের নাটকের পরিচয় দিন।

৭) 'এবং ইন্দ্রজিৎ' এবং 'বাকি ইতিহাস' বাদল সরকারের নাট্যজীবনের মাইল ফলক— আলোচনা করুন।

৮) স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা নাট্যসাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র স্থানের অধিকারী হলেন বাদল সরকার— আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) কে, কোন্ 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' তৈরি করেন?

২) টীকা লিখুন— 'টিনের তলোয়ার' নাটক।

৩) উৎপল দত্তের লেখা 'অঙ্গার' নাটকের পরিচয় দিন।

৪) উৎপল দত্তের লেখা যাত্রাপালার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৫) থার্ড থিয়েটার বিষয়ে আলোচনা করুন।

৬) টীকা লিখুন— 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটক।

৭) বাদল সরকারের 'ভোলা' নাটক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৮) বাদল সরকারের 'সলিউশন এক্স' নাটকের পরিচয় দিন।

৯) জীবনের মিছিল বা প্রতিবাদের মিছিল বাদল সরকারের 'মিছিল' নাটকে কীভাবে স্বপ্নের মিছিল হয়ে উঠেছে তার পরিচয় দিন।

১০) উৎপল দত্তের 'দুঃস্বপ্নের নগরী' নাটকের ভয়ঙ্করতার পরিচয় দিন।

১২.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (৩য় খণ্ড)—সুকুমার সেন।

২) বাংলা নাটকের ইতিহাস— অজিতকুমার ঘোষ।

৩) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৩য় খণ্ড)— অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪) বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস — ক্ষেত্র গুপ্ত।

৫) বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক— পুলিন দাস।

৬) উৎপল দত্ত ও তাঁর থিয়েটার— সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

মডিউল-৩
কথাসাহিত্য

একক-১৩ ❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গঠন

১৩.১ উদ্দেশ্য

১৩.২ প্রস্তাবনা

১৩.৩ ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩.৪ গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩.৫ সারাংশ

১৩.৬ অনুশীলনী

১৩.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১৩.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে কথাসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যবিশ্ব ও সাহিত্যপ্রতিভা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানলাভ করতে পারবেন। উপন্যাসের বিষয়, বহুমুখী ভাবনায় আলিম্পিত চরিত্রেরা, তাদের দ্বান্দ্বিক উপস্থিতি, উপন্যাসের গঠন কাঠামো, ভাষার বিস্তৃত অঙ্গন শিক্ষার্থীদের সাহিত্যজ্ঞানের পরিধিকে সম্প্রসারিত করবে। একই সঙ্গে ছোটোগল্প নিয়ে তাঁর বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ছোটোগল্পের গঠন ও শিল্পরূপের নির্মাণ-বিনির্মাণের পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সমৃদ্ধ করবে।

১৩.২ প্রস্তাবনা

এই এককের আলোচ্য বিষয় কথাসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পর বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত কিংবা 'আঁতের কথা' নির্মাণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নতুন পথ নির্মাণ করেছিলেন। বাঙালির চিত্তলোকে, সাহিত্যভাবনায় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি যে তরঙ্গাভিঘাত সৃষ্টি করেছিল, তার উজ্জ্বলতা, অভিনবত্ব ও বিপুল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পাঠকের মনোযোগ অধিকার করে। বিষয়ের অভিনবত্ব, সমান বাস্তবতায় নিহিত চরিত্রের দ্বান্দ্বিকতা, তাদের গতিপ্রকৃতি, তাগিদ, পিছুটান, ভাব-ভাষার প্রাণময় ঐতিহ্য রবীন্দ্র—সৃষ্টির অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন রূপকে চিনিয়ে দেয়। সমান্তরালে ছোটোগল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরূপ ও স্বভাবকে চিনে নিতে পারি। তিনিই ছোটোগল্পের প্রথম সার্থক স্রষ্টা। তাঁর লেখনীতে ব্যাপ্ত মানববিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের চেতনায় প্রাণোদীপ্ত হয় ছোটোগল্পের নান্দীপাঠ।

১৩.৩ ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে আধুনিকতার যে নতুন অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছে তার প্রবর্তক প্রকৃতপক্ষে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর(১৮৬১-১৯৪১)। অবশ্য বঙ্কিমের উত্তরাধিকার নিয়েই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-যাত্রার সূত্রপাত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র নন। দুই মানসও বিভিন্ন, রবীন্দ্রের কাল বঙ্কিমের কালও নয়; রবীন্দ্র ও বঙ্কিমের সমাজ ধর্মের চেতনাও এক নয়। কাজেই উভয়ের পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যে অভিনবত্ব দেখা গেছে তা সংক্ষেপে এই —

প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথের প্রথম দুটি উপন্যাস (বৌ ঠাকুরানীর হাট, রাজর্ষি) ইতিহাসাশ্রিত। এক্ষেত্রে তিনি যথার্থই বঙ্কিম অনুসারী। কিন্তু বঙ্কিম যেমন সুকৌশলে ইতিহাস, রোমান্স ও বাস্তবজীবনকে একসূত্রে গেঁথে তুলেছিলেন; রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর কাছে তা ছিল একান্তভাবে স্বভাব বিরুদ্ধ। তিনি ইতিহাস ও রোমান্সের চোরাবালি থেকে উপন্যাসের ভিত্তিকে বাস্তবজীবনের দৃঢ়ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ সামাজিক উপন্যাসে এক সূক্ষ্মতর মনোবিশ্লেষণমূলক বাস্তবতার প্রবর্তন। বঙ্কিমী উপন্যাসে নীতির প্রতি পক্ষপাত, আকস্মিক ঘটনার বাহুল্য, পূর্বাগত সামাজিক সংস্কারের প্রতি আনুগত্য অথবা মনোজগতের সূক্ষ্ম বিস্তৃত বিশ্লেষণের চেয়ে বাহ্যঘটনার উপর অধিক নির্ভরতাকে পরিত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথ মধ্যবিত্ত সমাজের প্রাত্যহিক জীবনের সূক্ষ্ম রসপূর্ণ মনোবিশ্লেষণের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন।

তৃতীয়তঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্ময়তা এবং স্বগত দৃষ্টি তাঁর উপন্যাসগুলিকে কাব্যধর্মী করে তুলেছে। তবে মধ্যবিত্ত সমাজ রবীন্দ্র উপন্যাসে উপজীব্য হলেও তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে ঠিক আমাদের চেনা-জানা ঘরের সাধারণ জীবনের সুখ-দুঃখভাগী বলে মনে হয় না। অবশ্য 'চোখের বালি'- 'নৌকাডুবি'র পর থেকেই এই স্বাতন্ত্র্য দেখা গেছে। তাই গোরা, নিখিলেশ, সন্দীপ, শচীশ, অমিত, লাবণ্য প্রমুখ চরিত্রের সমস্যা, তাদের জীবন যাত্রা, তাদের আদর্শ- সমস্তর মধ্যেই একটা অসাধারণত্বের স্পর্শ লক্ষ্য করা যায়।

পর্ববিভাগ — রবীন্দ্রউপন্যাসের শ্রেণিবিভাগ করলে মোটামুটি তিনটি সুস্পষ্ট স্তর পাওয়া যায়।

প্রথম পর্বে রচিত দুটি উপন্যাসে- 'বৌঠাকুরানীর হাট' (১৮৮৩), 'রাজর্ষি' (১৮৮৭) ইতিহাস একটি অর্থহীন আশ্রয়মাত্র। 'বৌঠাকুরানীর হাট'-এ পাঠান দস্যু দ্বারা রায়গড়ের রাজা বসন্তরায়কে হত্যা অথবা রাজর্ষিতে মোগল সৈন্যের আক্রমণ, অথবা সুজার রাজধানী উপন্যাসের দিক থেকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

দ্বিতীয়ত, এগুলি গল্পপ্রধান। ঘটনার প্রাচুর্য বেশি। উদয়াদিত্য, সুরমা, বসন্তরায়- এদের অজস্র কাহিনি নিয়ে বৌঠাকুরানীর হাট বসেছে। 'রাজর্ষি'তেও লেখক নক্ষত্ররায়, গোবিন্দমাণিক্য সকলের কথা বিস্তৃত ভাবে বলেছেন।

তৃতীয়ত, ঐতিহাসিকতা ও মনোবিশ্লেষণ এখানে সার্থক না হলেও রবীন্দ্র মানসের একটি বিশেষ ধর্ম এই দুটি উপন্যাসে প্রতিফলিত। হৃদয়াবেগের প্রাবল্য থাকলেও কোমল চিত্তের ব্যথা বেদনার প্রকাশ মুখ্য হয়ে উঠেছে। প্রতাপাদিত্যের ক্রুরতার পাশে বসন্তরায়ের মুক্ত উদার প্রাণের সারল্যের আকর্ষণ অনেক বেশি।

দ্বিতীয় পর্ব

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসগুলি হল- 'চোখের বালি' (১৯০৩) 'নৌকাডুবি' (১৯০৬), 'গোরা' (১৯১০)। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের প্রভাব কাটিয়ে উঠেছেন। উপন্যাসে কাহিনি হিসাবে সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের বাঙালি জীবনকেই বেছে নিলেন।

দ্বিতীয়ত, রোমান্সের অভাব পূরণ করলেন জীবনের অন্তর্মুখী মনোবিশ্লেষণ দ্বারা। তাই উপন্যাস হয়ে উঠল বিশ্লেষণ প্রধান। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে মানবমনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রহস্য নির্ধারিত হয়েছে। ঘটনার পরিবর্তনের স্রোত চরিত্রগত গভীর উৎস থেকেই উৎসারিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, এই পর্বের রচনায় সমাজ ও সংস্কারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিহৃদয়ের সংঘর্ষ ফুটে উঠেছে। 'চোখের বালি'তে ব্যক্তিজীবনের সমস্যার সঙ্গে সংসার জীবনের সমস্যা ঘনীভূত। 'নৌকাডুবি'তেও ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের সমস্যা লক্ষিত হয়।

চতুর্থত, লক্ষণীয় ব্যক্তিত্বের এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নর-নারীর প্রেমের একটি ভূমিকা আছে। 'চোখের বালি'র বিনোদিনীতে বিধবার হৃদয়ে প্রেমের অভিব্যক্তি বিষবৃক্ষের কুন্দনন্দিনীর মতো কণ্ঠিত নয়। ভারতীয় নারীর কাছে স্বামী নামক ব্যক্তিটির চেয়ে স্বামী নামক idea টাই 'নৌকাডুবি'তে প্রধান হয়ে উঠেছে।

উপন্যাস বিশ্লেষণ

'চোখের বালি' (১৯০৩) বাংলা সাহিত্যে প্রথম সমাজ জীবনাশ্রিত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণাত্মক সমস্যা নির্ভর উপন্যাস। আশালতা-বিহারী- মহেন্দ্র-বিনোদিনী এই চারটি চরিত্রের আকর্ষণ বিকর্ষণ সরলতা-দুর্বলতাকে কেন্দ্র করে এর কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। লেখক প্রত্যেকের পরিণতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করেছেন। সমাজনীতি বিরুদ্ধ প্রেম এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু হলেও রবীন্দ্রনাথের কোনোপ্রকার নীতিবোধ দ্বারা মার্জিত হয়নি। লেখকের সে অভিপ্রায় ছিল না।

'চোখের বালি'র পরবর্তী উপন্যাসে 'নৌকাডুবি'তে (১৯০৬) বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির অপেক্ষা কাহিনির ক্ষিপ্রগতির প্রতি লেখকের মনোযোগ বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। এ দিক দিয়ে এই উপন্যাস 'চোখের বালি'র তুলনায় অপরিণত। সমস্ত ঘটনাই আকস্মিকতার ফ্রেমে বাঁধা। রমেশ, কমলা, নলিনাক্ষ, হেমনলিনীর জীবনে যে জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছিল তার উপশম উপন্যাসের মুখ্য বিষয়।

তৃতীয় পর্ব

'গোরা' (১৯১০) উপন্যাসের পর থেকে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে একটি গভীর ভাবগতি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ভাব-কল্পনায়, ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গিতে, বিষয় বিন্যাসে, সর্বোপরি জীবন সমালোচনায় এই পর্বের রচনাগুলি পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলি থেকে একেবারেই পৃথক। এই পর্বে তিনি লিখেছেন মোট সাতখানি উপন্যাস—চতুরঙ্গ (১৯১৬), ঘবে. বাইরে (১৯১৬), শেষের কবিতা (১৯২৯), দুই বোন (১৯৩৩), মালঞ্চ (১৯৩৪) এবং চার অধ্যায় (১৯৩৪) উপন্যাসগুলির সামগ্রিক আবেদন ও অভিনবত্ব এইখানে—

প্রথমত, গোরা ও আগের উপন্যাসগুলির (অবশ্য বৌঠাকুরানীর হাট ও রাজর্ষি বাদে) সামাজিক আশ্রয় ও পটভূমি সাধারণভাবে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি। কিন্তু পরবর্তী উপন্যাসগুলি বিশেষভাবে 'চতুরঙ্গ', 'যোগাযোগ', 'ঘরে বাইরে', 'শেষের কবিতা'র আশ্রয় নগর নির্ভর শিক্ষিত, মার্জিত, কাব্যবিলাসী উচ্চ মধ্যবিত্ত। তাদের দীপ্ত, তির্যক, শাণিত ভাষা ও বাগভঙ্গি বিদগ্ধ নগর জীবনের সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছে। এই চরিত্রগুলির বেশিরভাগই সমাজ নিরপেক্ষ, অজস্র ব্যক্তিত্ব ও সম্পন্ন সাধারণ জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কহীন।

দ্বিতীয়ত, এই পর্বের উপন্যাসে ঘটনা অপেক্ষা একটি বিশেষ তত্ত্ব বা ভাবের প্রাধান্য বেশি। 'গোরা' উপন্যাসেও সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব স্থান পেয়েছে। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসেও তাই। গোরা উপন্যাসে কোনো বিশেষ বিশেষ চরিত্র বিশেষ বিশেষ অবস্থায় নানারূপ ঘটনাবর্ত সৃষ্টি করেছে। উপন্যাসিক সেই বিভিন্ন ঘটনাগুলিকে সূত্র দিয়ে গেঁথেছেন। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের ধারা কিন্তু অন্যরকমের। ব্যক্তিগতভাবে সামাজিক সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়া, একটি বৃহত্তর নৈতিক সংঘর্ষ এবং স্বদেশি যুগের বাংলা রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান বিষয়। পরিশেষে, দেশ, ধর্ম ও মানবতা ধর্মের সামাজিক সত্তা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের যে বিরোধে রবীন্দ্রনাথের চিত্তে মানবতার ধর্ম হল জয়ী। আবার 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা', 'দুইবোন', 'মালঞ্চ' ও 'চারঅধ্যায়'- এই পাঁচটি

উপন্যাস ব্যক্তিগত জীবনের উপন্যাস। এদের মধ্যে সমাজতত্ত্ব বা রাষ্ট্রনীতিমূলক আলোচনা নেই। 'যোগাযোগ'-এ তিনি দেখাতে চেয়েছেন, সন্তানের শুভ আগমে নরনারীর বিরুদ্ধতা কিরূপে পরাস্ত হয়। 'শেষের কবিতা'য় লাবণ্য ও অমিত একে অপরের কাছে এসে অন্তরের স্বাদ পেয়েছে, যেমন- 'চতুরঙ্গ'-এর শচীশ পেয়েছে জগমোহন ও দামিনীর সংস্পর্শে এসে। 'চার অধ্যায়'-এর লেখক এমন দুটি নর-নারীর কাহিনি গ্রহণ করেছেন যাদের জীবনে সশস্ত্র বিপ্লব একটি আকস্মিক অধ্যায় মাত্র। অনুরূপ 'দুই বোন'-এও নারীত্বের ও জননীধর্ম ব্যাখ্যাত হয়েছে।

তৃতীয়ত, 'গোরা' ও 'গোরা' পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাসে তথ্য ও ঘটনা বিন্যাসের পারম্পর্য এমনভাবে সজ্জিত এবং উপন্যাসোক্ত চরিত্রগুলির বিকাশের স্তর এমনভাবে গ্রথিত হয়েছে যে পাঠকের মনে বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রগুলি জীবনের খণ্ডাংশ মুহূর্তগুলি বৃহত্তর ঐক্যের মধ্য দিয়ে সমগ্রভাবে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়।

চতুর্থত, এই পর্বের উপন্যাসগুলিতে তথ্য সন্নিবেশ সংক্ষিপ্ত, মনোবিশ্লেষণ ও দীর্ঘায়িত নয়। দামিনী বা কেটির সকল কথা উপন্যাসে বলা হয়নি। কিন্তু দুই একটি স্থানে স্বল্প কথায় চকিত ঘটনার উপর যে ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিত বিদ্যুৎ চমকের মতো দীপ্তি পেয়েছে তার সাহায্যেই মুহূর্তের মধ্যে কোনো চরিত্র বা ঘটনার সমস্তটাই উদ্ভাসিত হয়।

পঞ্চমত, এই সংক্ষিপ্ত সাংকেতিকতা উপন্যাসগুলিকে স্থূল ঘটনার যবনিকা সরিয়ে কবিকল্পনা অধ্যুষিত তটভূমিতে অধিষ্ঠিত করেছে। বস্তুত কবি কল্পনার দীপ্তি ও ঐশ্বর্য উপন্যাসগুলিকে বিশ্লেষণধর্মী না করে কাব্যধর্মী করে তুলেছেন। এই কাব্যধর্ম সূক্ষ্ম রহস্যময় চরিত্রগুলিকেও আলোকিত করেছে। শচীশ-দামিনী -শ্রীবিলাসের সম্পর্কটি, বিমলা সন্দীপের আকর্ষণ, অমিত লাবণ্যের রহস্যময় চির অতৃপ্ত প্রেম, মধুসূদন কুমুদিনীর বিরুদ্ধ ইচ্ছাশক্তির তীব্র দ্বন্দ্ব-এদের সকলের মধ্যেই অসম্পূর্ণতার ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিত আছে। ফলত যে গীতিধর্ম ও কাব্যসুলভ গতিরসের ধারা 'চতুরঙ্গ'-এ সূচিত হয়েছিল, 'শেষের কবিতা'য় এসে তা যেন লাবণ্যময়ী হয়ে ওঠে। শেষের কবিতা তাই চরম কাব্যোপন্যাস।

ষষ্ঠত, এই পর্বের উপন্যাসগুলি বুদ্ধিপ্রধান উপন্যাস। রসসৃজন,চরিত্র পরিকল্পনা ও জীবন বিশ্লেষণে মননের প্রাধান্য। ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গিও বুদ্ধিদীপ্ত। শচীশের জ্যাঠামশায়ের জীবন কাহিনি বা 'যোগাযোগ'-এর মধুসূদনের পূর্বজীবনের ইতিহাস বর্ণনা যেন বুদ্ধিদীপ্ততার প্রকাশ।

সপ্তমত, এই পর্বের লেখকের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি বুদ্ধির প্রখর উত্তাপে বাহুল্যবর্জন করে গভীর ব্যঞ্জনা ও অর্থবহ গৌরব লাভ করেছে। দৃঢ় অথচ তীক্ষ্ণ, কঠিন অথচ সংক্ষিপ্ত বহু উক্তি যেন প্রবচনের মতো উপন্যাসগুলির পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে।

উপন্যাস বিশ্লেষণ

এই পর্বের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) এবং 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪)-এই চারটি উপন্যাস বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার ছ'বছর আগে রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' রচনা করেছিলেন। বিশেষ যুগের বিশেষ সমাজের এক ভাবদ্বন্দ্ব ছিল গোরার বিষয়বস্তু। চতুরঙ্গের বিষয়বস্তুও এক ভাব দ্বন্দ্ব। তবে তা একান্ত আত্মগত এবং চিরকালীন আধ্যাত্মিক জৈবিক— এই দুই ভিন্নমুখী টানে মানুষের জীবনে যে দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে ওঠে তারই ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ। অন্তর্মুখী সংঘাত, মানুষের এই আত্মবিরোধ— শচীশ ও দামিনীর জীবনে সমস্যা উপস্থিত করেছে। দেহ যেমন সত্য, তেমনি সত্য দেহাতীতের জন্য মানুষের ব্যাকুলতা— এই বার্তা তিনি দিতে চেয়েছেন।

আঙ্গিকের দিক দিয়েও এই উপন্যাস সাধারণ ও প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম। চারটি অঙ্গ— জ্যাঠামশাই, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস যেন চারটি স্বতন্ত্র গল্প। 'চতুরঙ্গ' থেকেই বাংলা উপন্যাসের Form ভাঙতে শুরু করেছে।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে আত্মপ্রক্ষেপের শিল্পকৌশলের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাস 'চতুরঙ্গ'-এর মতো আর এক বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর রচনা। কারণ এতে খুবই স্পষ্ট ও বলিষ্ঠভাবে দুটি সামাজিক প্রশ্ন উত্থাপিত।

(১) সমকালীন রাজনৈতিক মত্ততার দুর্বলতা ও সুদূর পরিণাম।

(২) ঐতিহ্য পরম্পরায় আগত হিন্দু দাম্পত্য জীবনের সঙ্গে আধুনিক জীবনচেতনার বিরোধ।

স্বদেশী যুগের সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির সঙ্গে এই উপন্যাসের অঙ্গাঙ্গী যোগ দেখে অনেকে এটিকে রাজনৈতিক উপন্যাস বলেছেন। একথা সত্য রাজনীতি এখানে প্রবল হলেও প্রধান হয়ে উঠেছে মানবিক সম্বন্ধ। নিখিলেশ-বিমলা-সন্দীপের অন্তর্জগতের টানাপোড়েন, রাজনীতি ও দাম্পত্য জীবনের এই সংঘাতই 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের সমস্যা।

এই পর্বের উপন্যাস 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি এবং একাধিক কারণে সম্পূর্ণ অভিনব। 'শেষের কবিতা'র মতো কাব্যোপন্যাস বাংলা সাহিত্যে আর রচিত হয়নি। বাঙালি পাঠকের কাছেও এই উপন্যাস সমাদৃত আজও।

প্রেমের বিচিত্র লীলা কবিত্বের যে সুকোমল বেদনায় রঞ্জিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে তার জুড়ি নেই। পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর যে স্থির নিরুদ্বেগ সম্পর্ককে আমরা প্রেম নামে অভিহিত করি প্রাত্যহিকতার মধ্যে তার অসীমতা ক্ষুণ্ন হয়। অমিত-লাবণ্যর প্রেম এই প্রাত্যহিকতার নির্দিষ্ট বৃত্তে আবর্তিত হয়নি।

'শেষের কবিতা'র তুলনায় 'যোগাযোগ' এ (১৯২৯) ভাবগত ও গঠনগত ঐক্য অপেক্ষাকৃত কম।

'দুই বোন' (১৯৩৩) ও 'মালঞ্চ' (১৯৩৪) প্রকৃতপক্ষে এক পর্যায়ের দুই উপন্যাস। নারীর প্রতি পুরুষের ভালবাসার দুইরূপ- একরূপে যে পত্নী, অন্যরূপে সে প্রিয়া -বিভিন্ন দিক দিয়ে সেকথা উপস্থাপিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) রাজনৈতিক আন্দোলনের আলোচনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি যে কত গভীর ছিল তা এই উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে।

১৩.৪ গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ছোটোগল্পের ধারায় প্রধান বৈতালিক গায়ক। তাঁর গল্পে কাহিনি ও কবিত্বের অপূর্ব সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। একেবারে প্রথমে 'ভিখারিনী', 'ঘাটের কথা', 'রাজপথের কথা' ও 'মুকুট' নামে চারটি গল্প লিখেছিলেন।উদ্ভাসপূর্ণ কবিত্বই এর প্রধান সুর,ঘটনার ঘনঘটা বা শিল্পরীতি এপর্বে সুসংহত হয়নি। তাঁর গল্পজীবনকে কয়েকটি পর্বে বিশ্লেষিত করা যায়।

প্রথম পর্বে অর্থাৎ হিতবাদী-সাধনা (১৮৯১-১৮৯৩) পর্বে রবীন্দ্রগল্প মোটামুটি ছিল আবেগদীপ্ত। পল্লীপ্রকৃতিপৃক্ত, রসময়পল্লী বাংলার নদ-নদী শোভিত মুক্ত প্রকৃতির শ্যামল উদার শান্তিময় শোভা এবং তার মানবজীবনের হাসিকান্না জড়িত জীবনযাত্রা এই পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'দেনা পাওনা' এই পর্বের প্রথম গল্প। এই পর্বের গল্পে নিসর্গ প্রকৃতির সঙ্গে পদ্মার ভূমিকাও ওতপ্রোতভাবে এসেছে। অতি সরল মানবতা, সহজ, সরল জীবনের চালচিত্র ছোট ছোট সুখ-দুঃখ এই পর্বের গল্পের শিরোভূষণ হয়েছে। ব্যঞ্জনাপ্রাণতায় গল্পগুলি রসসমৃদ্ধ। 'সমাপ্তি', 'দৃষ্টিদান', 'সুভা', 'খাতা', 'জীবিত ও মৃত', 'পোস্টমাস্টার' প্রভৃতি এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য গল্প।

দ্বিতীয় পর্ব বা সাধনা-ভারতী (১৮৯৪-১৯০২) যুগের ছোটোগল্পের সঙ্গে প্রথম পর্বের গল্পের সুরের মিল

আছে। এই পর্বের গল্পে যুগপৎ পল্লী ও নগর সরল- জটিল স্থান লাভ করেছে। এখানে সৃষ্টির সঙ্গে মনন যুক্ত হয়েছে। জীবন সমালোচনার মৃদু সুর ও নারীর উচ্চকণ্ঠ ঘোষণার সূত্রপাত ঘটে এই পর্বেই। 'অতিথি', 'গুপ্তধন', 'শাস্তি', 'নষ্টনীড়', 'অনধিকার প্রবেশ' ইত্যাদি এই পর্বের উল্লেখযোগ্য গল্প।

কিন্তু তৃতীয় পর্বে অর্থাৎ ভারতী-সবুজপত্র (১৯০২-১৯৩৩) যুগে এসে রবীন্দ্রগল্পের পটপরিবর্তন হল। প্রথম জীবনের জীবনরস এবং গীতিকবিতা ও প্রকৃতিপৃক্ততার রেশ কেটে গল্পে এল জীবন সমালোচনা ও জীবনসমীক্ষার বিশ্লেষণমূলকতা। গল্পের ভাব ও আঙ্গিকতার সিংহাসন দখল করল বাস্তব সমাজ-সমস্যা, সমাজসমালোচনা, এল মননশীলতা। এই পর্বের গল্পে নারীর স্বাতন্ত্র্য ও প্রতিবাদ গল্পকে দিয়েছে নবমাত্রা। 'স্ত্রীর পত্র', 'পয়লা নম্বর', 'সে', 'হালদার গোষ্ঠী', 'রবিবার' এই পর্বের বিশিষ্ট গল্প।

বিষয়বস্তু বিচারে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে তার গল্পকায়াকে গড়ে তুলেছেন। যা নীচে আলোচিত হল—

(ক) **গীতিকবিতাধর্মী ছোটোগল্প ঃ**

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শ্রেষ্ঠ গীতিকবি। এই বৈশিষ্ট্যে জারিত হয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ ছোটোগল্প রসরূপতা লাভ করেছে। তাঁর প্রথম জীবনের অধিকাংশ রচনাই গীতিধর্মী, ব্যঞ্জনাধর্মী প্রাণ।জীবনসত্যের আবর্তে আশা- আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে দোদুল্যমান বাঙালি জীবনের ছবি এখানে কাব্যগুণান্বিত হয়ে প্রকাশিত। 'পোস্টমাস্টার', 'সুভা', 'সমাপ্তি', 'দৃষ্টিদান' প্রভৃতি গল্প যেন গীতিকবিতার সুরে বাঁধা। 'পোস্টমাস্টার' গল্পের শেষে এক বিশ্ব ব্যাপী অব্যক্ত মর্মবাণী ব্যক্ত হয়েছে- ''জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আসে, ফিরিয়া ফল কি? পৃথিবীতে কে কাহার'' এই উক্তি তো গীতিকবিতা উদ্ভাসনেই ভরপুর। 'সুভা' গল্পে প্রকৃতির সাথে বোবা নারীর একাত্মতা গীতিময় ব্যঞ্জনাকে ফুটিয়ে তোলে।

(খ) **প্রেমপ্রণয় মূলক গল্প ঃ**

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গল্পে তিনটি স্তর- প্রণয়-ভালোবাসামূলক, স্নেহপ্রেমমূলক ও দাম্পত্যপ্রেমমূলক গল্প। 'জয়পরাজয়', 'কঙ্কাল', 'একরাত্রি', 'দূরাশা', 'মধ্যবর্তিনী', 'নষ্টনীড়' প্রভৃতি নিটোল প্রেমের গল্প। 'কঙ্কাল'গল্পে এক তরুণীর অতৃপ্ত প্রেম কামনার কথা প্রতিফলিত। 'কাবুলিওয়ালা' ও 'ছুটি' স্নেহপ্রেমযুক্ত গল্পের সার্থক উদাহরণ। পিতৃহৃদয়ের কাহিনি। সন্তানস্নেহে ব্যাকুল পিতৃহৃদয় তা সে কলকাতার সভ্য সমাজের হোক বা আফগানিস্তানের শিলাকঙ্করময় ভূমিতে হোক, সর্বত্রই যে একই ধারা প্রবাহিত সেই গভীর অনুভবের নিবিড় উচ্চারণ 'কাবুলিওয়ালা'। 'ছুটি' গল্পেও ফটিককে ঘিরে এই স্নেহরসের উৎসারণ।

'স্ত্রীর পত্র', 'পয়লানম্বর', মধ্যবর্তিনী', 'নষ্টনীড়' প্রভৃতি দাম্পত্য প্রেমের গল্প। এই সব গল্পে প্রেম-অপ্রেমের কথা আছে। এখানে নারীর মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত। প্রথম দিকের গল্পগুলিতে যেখানে বধূ নির্যাতনের ছবি দেখা যায় অন্যদিকে তেমনি পরবর্তী গল্পগুলিতে নারীর বিদ্রোহাগ্নি প্রকাশিত হতে দেখি। 'নষ্টনীড়'এর চারু স্বামী প্রেম না পেয়ে অমলকে ভালোবেসেছে। 'স্ত্রীর পত্র'এ দেখা গেছে নারী সংসার ছেড়ে মুক্ত হতে চেয়েছে। সংসারে নারী পরিসরকে এই গল্পে যত্নের সঙ্গে দেখানো হয়েছে। 'পয়লা নম্বর' নারীর আত্মজাগরণের গল্প, ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার গল্প। গল্পের শেষে অনিলার গৃহত্যাগের ঘটনা নারীর ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে।

(গ) **সমাজসমস্যা মূলক গল্প ঃ** 'দেনা পাওনা', 'সুভা', 'খাতা', 'হৈমন্তী', 'হালদার গোষ্ঠী' প্রভৃতি গল্পে সমাজের নানা কদর্য দিক প্রকাশিত। কোথাও পণপ্রথা নামক সামাজিক ব্যাধির নির্মমতায় এক সাধারণ মেয়ের মৃত্যু ঘটেছে, কোথাও বধূ নির্যাতনের রূপ স্পষ্ট আবার কোথাও বাল্য বিবাহকে কেন্দ্র করে সমস্যা আবর্তিত হয়েছে।

(ঘ) **অতিপ্রাকৃত গল্প ঃ**

রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু গল্পে অতিপ্রাকৃত রসের সৃষ্টি হয়েছে বলে কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন। 'কঙ্কাল', 'নিশীথে', 'মণিহারা', 'ক্ষুধিত পাষাণ'এই ধরনের গল্প। অতিপ্রাকৃতরসের গল্পে অতিপ্রাকৃত অবস্থা শেষ পর্যন্ত মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় উদ্ভাসিত। 'কঙ্কাল','জীবিত ও মৃত' গল্পে জীবন্ত অস্তিত্ব অতিপ্রাকৃতের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে।

এ ধরনের গল্প ছাড়াও 'তোতাকাহিনী', 'ঘোড়া', 'কর্তার ভূত' প্রভৃতি গল্পগুলি রূপকধর্মিতার গুণে অনন্য মাত্রা লাভ করেছে।

আঙ্গিক পারিপার্শ্ব, ভাষা ও ভাবসুষমা রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পকে শিল্পদ্যুতি দিয়েছে। কখনও আত্মকথন, কখনও কথোপকথন, কখনও সংলাপে গল্পগুলি গড়ে উঠেছে। কখনও গল্পের লিখনধর্মিতা চোখে পড়ার। আবার কখনও গল্পের শুরু রূপকথাধর্মী তা কানে শোনার। সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছোটোগল্পগুলিকে ছোট প্রাণ ছোট ব্যথার চিত্রণে মাধুর্যময়।

১৩.৫ সারাংশ

বিভিন্ন সময়ানুভবের সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিচিত্রতা কথাশিল্পের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির নতুন মাত্রা এনে দেয়। বহু শতাব্দী ধরে সীমাবদ্ধ বাঙালির সাহিত্যবোধ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিভাণ্ডারে খুঁজে পায় সপ্ত-সিন্ধুর কলরোল। মধ্যবিত্ত বাঙালিসমাজ, ব্যক্তিহৃদয়ের সমস্যা এবং প্রেমের অন্তর্জগৎ উদ্ঘাটন তাঁর মূল অভিপ্রেত এবং মূল শিল্পরীতি সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ। কাহিনির বয়নে, চরিত্র সৃজনায়, ঘটনা সম্পৃক্তিতে, নারীচরিত্র নির্মাণে, পরিবেশ সৃষ্টিতে সর্বোপরি ভাষার ঔজ্জ্বল্য নির্মাণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় প্রধান ভগীরথ তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

১৩.৬ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) বাংলা উপন্যাসের ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান আলোচনা করুন।

২) বাংলা ছোটোগল্পের ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিনবত্ব বিচার করুন।

৩) বাংলা মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৌলিকতার পরিচয় দিন।

৪) 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের বিষয়বস্তু লিখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৫) প্রেমপ্রণয়মূলক গল্পের বিষয় নির্মাণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশিষ্টতার পরিচয় দিন।

৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাসগুলির পর্ববিভাগ করে বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইতিহাস আশ্রিত একটি উপন্যাসের নাম লিখুন। এটি কত সালে প্রকাশিত হয়?

২) 'চোখের বালি' উপন্যাসের প্রকাশসাল লিখুন। এটি কী জাতীয় উপন্যাস?

৩) প্রকাশসালসহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যধর্মী উপন্যাসের নাম লিখুন।

৪) 'গোরা' উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা কয়েকটি অতিপ্রাকৃত গল্পের নাম লিখুন।

৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতিকবিতাধর্মী কয়েকটি গল্পের পরিচয় দিন।

৭) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন্ উপন্যাস মহাকাব্যিক গঠনে নির্মিত হয়েছে?

১৩.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) অরবিন্দ পোদ্দার, রবীন্দ্রমানস, ইন্ডিয়ানা : কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬০।

২) বুদ্ধদেব বসু, রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্য, নিউ এজ পাবলিশার্স : কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, জানুয়ারি ১৯৮৩।

৩) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ, বাকসাহিত্য প্রা.লি. : কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭।

৪) নীহার রঞ্জন রায়, রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, নিউ এজ পাবলিশার্স : কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৯।

৫) শ্রী ভূদেব চৌধুরী, রবীন্দ্র উপন্যাস: ইতিহাসের প্রেক্ষিতে, দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৬।

৬) উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির উজ্জ্বল স্রোতে, আনন্দ পাবলিশার্স : কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪২৩।

৭) গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণশিল্প, দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০১।

৮) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-পরিক্রমা, দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০

৯) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা, দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৬।

১০) ক্ষেত্র গুপ্ত, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), গ্রন্থনিলয় : কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০০১।

১১) তপোব্রত ঘোষ, রবীন্দ্র-ছোটোগল্পের শিল্পরূপ, দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৮।

একক-১৪ ❑ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গঠন

১৪.১ উদ্দেশ্য
১৪.২ প্রস্তাবনা
১৪.৩ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৪.৪ গল্পকার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৪.৫ সারাংশ
১৪.৬ অনুশীলনী
১৪.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১৪.১ উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীরা এই এককে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে উপস্থিত সমাজ ও জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় প্রকাশকে লক্ষ্য করতে পারবেন। জানতে পারবেন কথাকারের চেতনায় সমাজ-বাস্তবতার বিচিত্র তরঙ্গিত বিক্ষেপকে। শিক্ষার্থীরা বদলে যাওয়া কথাসাহিত্যের মানচিত্রকে পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। শিক্ষার্থীরা ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র ও গল্পকার শরৎচন্দ্রের অভিন্ন সত্তাকে ভাবনার সেতু দিয়ে সংযোগ করতে পারবেন।

১৪.২ প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রপ্রতিভাকে স্বীকার করে বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে নতুন চমক নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি উপন্যাস ও ছোটোগল্পের শিল্পাঙ্গিক ও শিল্পবোধটাকে নিজস্ব ঘরানায় পাল্টে দিয়েছিলেন। তিনি সমাজের অন্ত্যজ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, মানুষের জীবনের বিচিত্র চাওয়া-পাওয়া, তৃপ্তি-অতৃপ্তিকে সহজ সরলভাবে গল্পে-উপন্যাসে মূর্ত করে তোলেন। সমাজ ও সময়ের বৈশিষ্ট্য তিনি প্রকাশ করেছিলেন সাহিত্যের বিস্তৃত অঙ্গনে। তাঁর সময়নির্ভর সামাজিক দলিলে বাস্তব জীবন-জিজ্ঞাসা যেমন আত্মপ্রকাশ করেছে তেমনি ব্যক্তির অস্তিত্ব চেতনাও রূপায়িত হয়েছে। এইভাবেই সমাজ-বাস্তবতার নতুন মাত্রা সংযোজনে ও তাঁর প্রকাশনৈপুণ্যে কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হয়।

১৪.৩ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

‘আধুনিক যুগসঙ্কটের ছায়ায় গত যুগের বাঙালি সমাজের একটি প্রাণগত পরিচয় শরৎ সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, শরৎচন্দ্র প্রাণে-মনে সেই গত যুগেরই বংশধর; তাহার রচিত সাহিত্যে আমরা একটা বিলীয়মান যুগের বাঙালি সভ্যতা, বাঙালি সমাজ এবং সেই সমাজের শক্তি ও অশক্তির যে মর্মান্তিক লিপিচিত্র পাইয়াছি তাহাই বাংলা সাহিত্যে

অমর হইয়া থাকিবে।' — বাংলা সাহিত্যাকাশে রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের পর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) নিজস্ব শিল্পাঙ্গিক ও শিল্পবোধকে নতুন মাত্রায় নির্মাণ করেন। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষতায়, বাস্তব অনুভূতির তীব্রতায়, চরিত্রের প্রতি সহমর্মিতায়, তীক্ষ্ম সমালোচনায় ও নারী চরিত্রের অনুভূতির প্রগাঢ় বিশ্লেষণে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, 'No other Bengali author not Rabindranath himself had Saratchandra's measure of immediate success– like Dickens– he was the idol of the public.' শরৎচন্দ্রের প্রতিটি রচনাই বিষয় বৈচিত্র্যে ও শিল্প স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। তিনি প্রকাশকলার স্বকীয়তায় বাংলা উপন্যাসকে নিয়ে নতুনভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করেছেন। শরৎচন্দ্রের জীবনদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য ও শিল্পগত বৈচিত্র্যের নিরিখে বা উপন্যাস বৈশিষ্ট্যকে আমরা যেভাবে চিহ্নিত করতে পারি।

১. শরৎচন্দ্র বাংলা ও বাঙালির অতি সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, সুখ-দুঃখ, তৃপ্তি-অতৃপ্তিকে মূর্ত করেছেন।

২. তিনি উপন্যাস বিশ্বে তীক্ষ্ণ ও অসন্দিগ্ধভাবে বাস্তবতার সুরকে সংযুক্ত করে নিয়েছেন। ফলত উপন্যাসের শব্দসংগীত প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র সংঘাতগুলিকে নিয়ে পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয়। বাস্তবতার সঙ্গে ভাব প্রকাশের গভীরতা তাঁর উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৩. নিছক বাস্তব জীবনের ঘটনাকে তিনি উপন্যাসে আশ্রয় দেন নি। বরং 'বাস্তব জীবনকে গ্রহণ করে অতি বিচিত্র কৌশলে তার সঙ্গে রোমাঞ্চের অদ্ভুত মিল ঘটিয়েছেন।'

৪. যাদের জীবনে চোখ ধাঁধানো রঙের ছড়াছড়ি নেই, যাদের কথা কেউ লেখে না সমাজের সেই সব মানুষ শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে চরিত্র হয়ে ওঠেন।

৫. নারী চরিত্র অঙ্কনে শরৎচন্দ্রের মৌলিকতা লক্ষণীয়। প্রত্যেকটি নারীর মধ্যে কোথাও সতেজ প্রকাশভঙ্গি কোথাও দৃপ্তবোধ কোথাও স্নেহময়ী রূপ আবার কোথাও প্রেমিকারূপে আত্মপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। পারিবারিক কর্তব্য পালনের মধ্যেও নারীর ব্যক্তিত্বের জাগরণ শরৎচন্দ্রের উপন্যাসবিশ্বে উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

৬. সমাজের সংকীর্ণতা, কুসংস্কার প্রবণতা ও সমাজশক্তির উৎপীড়ন শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে তীক্ষ্ণতায় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সেই সঙ্গে শরৎচন্দ্র সামাজিক নীতির সমালোচনাকেও বিভিন্নভাবে উপন্যাসে গুরুত্ব দিয়েছেন।

৭. শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নিষিদ্ধ সমাজবিরোধী প্রেম চিত্রণে অসাধারণ দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রেমে নারীরা কখনও জ্বলন্ত, কখনও প্রার্থিত পুরুষকে না পেয়ে বিরহে আকুল আবার কখনও সমাজ নিষিদ্ধ প্রেমে অগ্নিশুদ্ধ, আবার কখনও আদর্শবাদে বিলীন—তিনি নানান রূপে নারীর হৃদস্পন্দনকে কম্পিত করে তুলেছেন।

৮. উপন্যাসে চরিত্র সৃজনে, সম্পর্কের বিন্যাসে এবং সর্বোপরি পরিবেশ পরিস্থিতি নির্মাণে তিনি বাহুল্যবর্জিত সহজ-সরল প্রাণোচ্ছল ভাষা ব্যবহার করেছেন।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ব্যতিক্রমী নিজস্ব রীতিতে শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসবিশ্বকে মৌলিক গুণে অনবদ্য করেছেন।

প্রকাশকাল অনুসারে শরৎচন্দ্র প্রণীত উপন্যাসগুলি হল 'বড়দিদি' (১৯১৩), 'বিরাজবৌ' (১৯১৪), 'পরিণীতা' (১৯১৪), 'পণ্ডিতমশাই' (১৯১৪), 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬), 'চন্দ্রনাথ' (১৯১৬), 'বৈকুণ্ঠের উইল' (১৯১৬), শ্রীকান্ত, প্রথম পর্ব (১৯১৭), 'দ্বিতীয় পর্ব' (১৯১৮), 'তৃতীয় পর্ব' (১৯২৭), 'চতুর্থ পর্ব' (১৯৩৩), 'দেবদাস' (১৯১৭) ইত্যাদি। তাঁর উপন্যাসগুলিকে আলোচনার সুবিধার্থে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসরণে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করে নিতে পারি।

ক. পারিবারিক বিরোধমূলক উপন্যাস — এই ধারার উপন্যাসগুলিতে পারিবারিক সংঘর্ষের মনস্তাত্ত্বিক ও জটিলতর রূপ প্রকাশিত হয়েছে। পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ, ব্যক্তিহীনতা, দুর্বলচিত্ত ,অসংযত ও অস্থির মুখ উপন্যাসগুলিতে প্রবল আকার ধারণ করেছে। 'নিষ্কৃতি' উপন্যাসে ভ্রাতৃবিরোধ, যৌথ পরিবারের স্বার্থপরতার দিকটি উঠে এসেছে। 'পণ্ডিতমশাই' ও 'বৈকুণ্ঠের উইল' উপন্যাস দুটিতে সম্পর্কের টানাপোড়েনে পশ্চাতপট হিসাবে পারিবারিক বিরোধ প্রকাশিত হয়েছে।

খ. দাম্পত্য প্রেম ও প্রেমের বিরোধমূলক কাহিনি — এই গোত্রের উপন্যাসে প্রেম বিশ্লেষণে শরৎচন্দ্র বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। 'শুভদা' উপন্যাসের শুভদা চরিত্রটি আমাদের আকর্ষণ করে। 'পরিণীতা' উপন্যাসে বাঙালি পরিবারের রোমান্টিক আবেগসর্বস্ব প্রেম প্রকাশিত হয়েছে। 'বিরাজবৌ'তে দাম্পত্য প্রেমের নিবিড়তা একদিকে যেমন বর্ণিত হয়েছে অপরদিকে তার দারুণ বিপর্যয়ের ছবিও চিত্রিত হয়েছে।

গ. সমাজসমস্যামূলক উপন্যাস- 'অরক্ষণীয়া', 'পল্লীসমাজ', 'বামুনের মেয়ে' প্রভৃতি উপন্যাসে সামাজিক অত্যাচার নিপীড়নের অমানবিক স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। 'পল্লীসমাজ'-এ সামন্ততান্ত্রিক শোষণের চিত্র স্পষ্ট হয়েছে। 'অরক্ষণীয়া', 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসে সামাজিক প্রথার নির্দয় রূপ ও কৌলিন্যপ্রথার কুফল উপস্থাপিত হয়েছে। এই ধরনের উপন্যাস থেকেই আমরা লেখকের সামাজিক দায়বদ্ধতার নিদর্শন খুঁজে পাই।

ঘ. পূর্বরাগপুষ্ট মধুর প্রেমের কাহিনি — 'পরিণীতা', 'দত্তা', 'দেনাপাওনা' ইত্যাদি এই শ্রেণিভুক্ত। 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু হল অত্যাচারী জমিদার জীবানন্দ ও তার স্ত্রী অলোকার ভৈরবী সন্ন্যাসীতে রূপান্তর, তাদের ভিতরকার সম্পর্কের বহুমাত্রিক জটিলতা নির্মাণ এবং সর্বোপরি জীবানন্দের পরিবর্তন। 'পরিণীতা' ও 'দত্তা' উভয় উপন্যাসের কাহিনি মধুর প্রেম-প্রীতি বন্ধনকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। 'দত্তা' উপন্যাসে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা লক্ষ করা যায়।

ঙ. সমাজবিরোধী নিষিদ্ধ প্রেম- চরিত্রহীন উপন্যাসে সতীশ এবং সাবিত্রী, 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী, 'গৃহদাহ' উপন্যাসে মহিম, অচলা ও সুরেশ- প্রত্যেক চরিত্রের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক সম্পর্কের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘাত-প্রতিঘাত, হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা, সামাজিক প্রথার প্রতি আনুগত্য, বাসনা-কামনার বিড়ম্বনা এবং সেই সঙ্গে নারীর আত্ম-উপলব্ধির কথা প্রকাশিত হয়েছে।

চ. মতবাদপ্রধান উপন্যাস — শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনের উপন্যাস 'পথের দাবী' ও 'শেষ প্রশ্ন'তে মতবাদ মূর্ত হয়ে ওঠে। পরাধীন ভারতবর্ষে মর্মযন্ত্রণার বেদনাময় আলেখ্য রচিত হয়েছে 'পথের দাবী' উপন্যাসে। এই উপন্যাসে মূলতত্ত্ব বিপ্লববাদ প্রতিষ্ঠা। রাজনৈতিক আন্দোলনে স্বাধীনতাকামী যোদ্ধারা জীবনপণ করে যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন তাকে তিনি বিদ্রোহাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্মাণ করেছেন।

সুতরাং সামগ্রিক বিচারে শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসবিশ্বে এমন এক স্বতন্ত্র জগৎ নির্মাণ করেছেন যা সব শ্রেণির পাঠককে অন্তর্লীন ভালোবাসায় আকৃষ্ট করে রাখে।।

১৪.৪ গল্পকার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রভাতকুমারের পর বাংলা ছোটোগল্পের জগতে নতুনত্বের মাত্রা নিয়ে আবির্ভাব ঘটেছিল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮)। ছোটোগল্পের আঙ্গিক-প্রকরণ ও বিষয়বস্তুর ধারণাকে একেবারে নিজস্ব রীতিতে পাল্টে ফেলেছিলেন তিনি। শরৎচন্দ্রের গল্প বৈশিষ্ট্য তথা স্বাতন্ত্র্যকে এভাবে ধরা যেতে। যথা :

১. বাঙালির বিচিত্র, সরল জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাসনা-কামনার তৃপ্তি-অতৃপ্তিকে গল্পে মূর্ত করেছেন। এ চিত্রণ চিরন্তন, শাশ্বত।

২. ছোটোগল্পের নির্দিষ্ট শিল্পাঙ্গিককে ভেঙে ভিন্ন রূপ দিলেন শরৎচন্দ্র। তিনি কথনভঙ্গিতে গল্প শেষে অপ্রত্যাশিত চমক না রেখে ব্যতিক্রমী বিন্যাসকে সংযুক্ত করেছিলেন।

৩. সমাজের অন্ত্যজ মানুষের জীবনের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষণশীল সমাজের নীচতা, জিঘাংসা তাঁর গল্পে ব্যাপকভাবে উঠে এসেছে।

৪. পুরুষ চরিত্রের সমান্তরালে নারী চরিত্রের স্পষ্ট রূপচিত্রণই তাঁর গল্পশিল্পের প্রধান হাতিয়ার।

'যমুনা' মাসিক পত্রে প্রকাশিত 'রামের সুমতি', 'পথ নির্দেশ' ও 'বিন্দুর ছেলে' তিনটি গল্প তাঁকে সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেয়। তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য ১৯১৪, মেজদিদি ১৯১৫, নিষ্কৃতি ১৯১৭, কাশীনাথ ১৯১৭, স্বামী ১৯১৭, ছবি ১৯২০, হরিলক্ষ্মী ১৯২৬, অনুরাধা সতী ও পরেশ ১৯৩৪।

শরৎচন্দ্রের প্রথম গল্প 'মন্দির' কুন্তলীন পুরস্কার লাভ করেছিল। 'মহেশ' গল্পে গল্পকার জমিদার শাসিত আচার শাসিত, ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজে মানুষের দুরবস্থার ছবি এঁকেছেন। মূক পশু মহেশের জীবনের সূত্রে মানুষের জীবনের লীলা চিত্র উন্মোচনের এই কাহিনি নিষ্ঠুর বাস্তবতার মোড়কে নির্মিত। একটি দরিদ্র কৃষকের পরিবার দারিদ্র্য ও নিপীড়নের শিকার হয়ে সমাজের নিয়ম শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়। গফুরের সঙ্গী মহেশ, তার জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায়। গফুর সন্তানের মতো ভালোবাসে অথচ তাকে খেতে দিতে পারে না। জমিদার এ ব্যাপারে নিরুত্তর থাকলেও তার নিষ্ঠুরতার প্রমাণ গল্পে পাওয়া যায়। অনাহারে গফুরের মহেশ মরে গেলে গফুরকে সর্বস্বান্ত করে জমিদার। তিনি অর্থহীন শাস্ত্র শাসনের, সমাজ শাসনের রূপকে ও সেই সঙ্গে পশু-মানুষের সম্পর্ককে বিষয়ের আয়োজনে তীক্ষ্মভাবে প্রকাশ করেছেন।

একই কথা 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পটি সম্পর্কেও বলা চলে। আচার ও ধর্মের রীতি-নীতিকে ব্যবহার করে লাঞ্ছিত মানবতাকে মুখুজ্যে গিন্নির শবদাহের একটি ঘটনাকে অবলম্বন করে প্রকাশিত হয়েছে। যে কাহিনি শ্মশানে শুরু হয়েছিল, তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে তিনি আরেক শ্মশানের কাহিনিকে নির্মাণ করেছিলেন যেখানে আমাদের অভ্যস্ত সংস্কার মুখ থুবড়ে পড়ে। 'বিলাসী' শরৎচন্দ্রের ব্রাত্যজীবনাশ্রয়ী একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। সমাজের উঁচুতলার মানুষের দ্বারা যে নিচের তলার মানুষরা অত্যাচারিত লাঞ্ছিত হয়— তার ভাবচিত্রের সার্থক রূপায়ণ ঘটে এই গল্পে।

শরৎচন্দ্র বলেছেন- 'প্লট সম্বন্ধে আমাকে কোনোদিন চিন্তা করিতে হয় নাই, কতকগুলি চরিত্র ঠিক করিয়া লই, তাহাদিগকে ফোটাবার জন্যে যাহা দরকার আপনি আসিয়া পড়ে।' তাঁর প্রত্যেকটি গল্পই এই বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

চরিত্র প্রধান গল্পের উদাহরণ হিসাবে 'একাদশী বৈরাগী'র কথা বলা যায়। একাদশী বৈরাগী অত্যন্ত কৃপণ ও হৃদয়হীন। কিন্তু তার নিজের বিশ্বাসের প্রতি তার অবিচলিত মনোভাবে সে কাউকে ভয় করে না। সমাজের সব নিয়ম অস্বীকার করে। তাই তার ভাগিনী সমাজের চোখে পতিতা হয়েও তার চোখে নয়। 'মামলার ফল' গল্পেও গঙ্গামণি এবং 'পরেশ' গল্পের নায়ক পরেশ সৎ ও বিবেকী সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে তার দৃঢ়তায়।

'বিন্দুর ছেলে' ও 'রামের সুমতি' বৈচিত্র্যহীন পারিবারিক দ্বন্দ্বের মধ্যে অভিনব গল্প। অভিনবত্ব এই কারণে যে প্রচলিত ধারণাকে ভেঙে শরৎ সাহিত্যে সাধারণত দেখা যায় বিমাতা স্নেহশীলা। যেখানে নিজের সন্তানের চেয়ে নিকট আত্মীয়ের সন্তানের প্রতি অধিক স্নেহ প্রকাশিত হয়।

'মন্দির' বা 'কাশীনাথ' গল্প সমাজ-বাস্তবতার অতি তীক্ষ্ণ উদাহরণ। জীবনের কোনো সমস্যা, কোনো মানসিক জট, চরিত্রের কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে অল্প উপাদানের আয়োজনে উদ্ভাসিত করা তাঁর লক্ষ্য ছিল না,তাঁর লক্ষ্য ছিল সমাজ, সমাজের অন্দরমহল এবং ব্যক্তি ও সমাজের সংঘর্ষ। তাঁর গল্পবিশ্ব জগত ও জীবনকে দেখার বিশেষ দৃষ্টিকোণ বা জীবনাভিজ্ঞতায় সার্থক হয়ে ওঠে, প্রতিফলিত হয় লেখকের ভিন্ন জীবনদর্শন।

১৪.৫ সারাংশ

গল্প-উপন্যাসের প্রচলিত ছক ভেঙে, ব্যতিক্রমী নিজস্ব ঐশ্বর্যলোকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য-ভুবনকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সমকালীন সমাজের সীমাবদ্ধতায় তিনি স্বতন্ত্রভাবে নির্মাণ করে দিয়েছিলেন নারী-পরিসরকে। তাঁর সাহিত্য বিশ্বে নারীরা খুঁজে পায় আত্মপ্রত্যয়ে বলিষ্ঠ জীবনাকাঙ্ক্ষার রসদ। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-ভুবনের কাহিনি-কাঠামোর নববিন্যাস, চরিত্রগত নতুন আদর্শের প্রতিষ্ঠা ও ভাষায় প্রাঞ্জলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য — এককথায় নবনির্মিতির স্পষ্ট ছবি।

১৪.৬ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) বাংলা উপন্যাসের ধারায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অবদান আলোচনা করুন।

২) বাংলা ছোটোগল্পের ধারায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনবত্ব বিচার করুন।

৩) বাংলা সামাজিক উপন্যাসের ধারায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৌলিকতার পরিচয় দিন।

৪) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা সমাজ নিষিদ্ধ প্রেমমূলক উপন্যাসের পরিচয় দিন।

৫) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা গল্পের বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম সার্থক উপন্যাসটির নাম কী? এটি কত সালে প্রকাশিত হয়?

২) 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের প্রকাশসাল লিখুন। এটি কী জাতীয় উপন্যাস?

৩) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দাম্পত্য প্রেম নিয়ে লেখা একটি উপন্যাসের নাম লিখুন।

৪) 'মহেশ' গল্প সম্পর্কে আপনার অভিমত লিখুন।

৫) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা কয়েকটি সমাজসমস্যামূলক গল্পের নাম লিখুন।

৬) 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কোন মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তা লিখুন।

৭) নারী জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি উপন্যাসের পরিচয় দিন।

৮) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কোন্ গল্পটি কুন্তলীন পুরস্কার পায়?

১৪.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) দেবেশ রায়, উপন্যাস নিয়ে, দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০০।

২) ক্ষেত্র গুপ্ত, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড), গ্রন্থনিলয়: কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০০।

৩) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা, দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৬।

৪) দেবেশ রায়, উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে, দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ, ২০০৫।

৫) সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, পুনর্মূল্যায়নে শরৎচন্দ্র, বুক সেন্টার : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬।

৬) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা (বাংলা ছোটোগল্পের একশ কুড়ি বছর : ১৮৯১-২০১০), দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৪।

৭) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে বিংশ শতাব্দীর উপন্যাস, দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৪।

৮) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা, দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৬।

৯) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রা. লি. : কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৪-২০০৫।

১০) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৩।

একক-১৫ ❑ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গঠন

১৫.১ উদ্দেশ্য

১৫.২ প্রস্তাবনা

১৫.৩ ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫.৪ গল্পকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫.৫ সারাংশ

১৫.৬ অনুশীলনী

১৫.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১৫.১ উদ্দেশ্য

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যের কথাবস্তুতে বিচিত্র পরিচয়ের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। পল্লিপ্রকৃতির ও মানুষের একাত্মতা নির্মাণে তিনি বস্তু- অতিক্রান্ত যে ভাববিশ্ব নির্মাণ করেছিলেন তা কালাতিজয়ী। এই একক থেকে শিক্ষার্থীরা তাঁর শিল্পীসত্তার বিশিষ্টতার কথা জানতে পারবেন। শিক্ষার্থীরা তাঁর জীবনভাবনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ লিখনশৈলী সম্পর্কে সার্বিক ধারণা লাভ করতে পারবেন এবং তাঁর উপন্যাস ও ছোটোগল্পের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন।

১৫.২ প্রস্তাবনা

একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আজও আমরা সত্তার গভীরে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-জীবনানন্দের সঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থিতিকে অনুভব করতে পারি। নিসর্গ-রূপমুগ্ধ শিল্পী বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যের নিবিড় পাঠে আমাদের মনশ্চক্ষুতে ভেসে ওঠে তারাপদের প্রকৃতিমুগ্ধতা কিংবা জীবনানন্দের রূপসী বাংলার সহজ সরল অনাড়ম্বর ছবি। বাস্তবের মধ্যে আরেক বাস্তবের, সাধারণের মধ্যে অসাধারণত্বের, পরিচয়ের মধ্যে অপরিচয়ের অভিনব পথ সন্ধানী বিভূতিভূষণ স্বীয় প্রতিভায় নিজস্ব কক্ষপথে একাকী পরিক্রমণ করেন। প্রকৃতির অসীম টানে, মানুষের প্রতি অপরিসীম বিশ্বাসে, ঈশ্বরানুভূতিতে তিনি বর্ণময় রূপের বিন্যাসে সহজ-সরল অথচ গভীর শিল্পবোধের স্থপতি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। ভাষার স্নিগ্ধতার আবেশ তাঁর কথা ভুবন জুড়ে বিরাজিত। ফলত বিশ্বসাহিত্যের আঙিনায় তাঁর সাহিত্যজগত নিঃসন্দেহে গৌরবের দাবিদার।

১৫.৩ ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ত্রিশের দশকে বাংলা উপন্যাস যখন কল্লোলীয় অবক্ষয় ও নৈরাশ্যের রূপায়ণে গতিপথ পরিবর্তনে ব্যাপ্ত ছিল,

তখন জীবনদর্শন ও উপন্যাসের অভিনব বিষয়বস্তুর ডালি নিয়ে হাজির হয়েছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)। প্রকৃতিচিত্রণে, অধ্যাত্ম চেতনায় এবং সারল্য ও সততায় কল্লোলীয় গতিপথ পরিবর্তনের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে অথচ পরিবর্তনের সমান্তরাল পথে পা ডুবিয়ে হাঁটলেন বিভূতিভূষণ। সে পথ বিশ্ববোধের, প্রকৃতিপ্রেম ও ঈশ্বর বিশ্বাসের। সে পথের পাথেয় দরিদ্র জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা আর মমতা। আধুনিক মানুষের জীবন যখন যুক্তির অসংখ্য পাকের আবর্তে দিশেহারা, মানুষ যখন বৃত্তবন্দী, সাহিত্য যখন দুর্ভেদ্য গ্রন্থনার জালে আবদ্ধ তখন এই ধারণায় প্রবল বলিষ্ঠ প্রতিবাদের বার্তা নিয়ে এসেছিলেন বিভূতিভূষণ। তিনি প্রমাণ করে দিলেন, 'সাহিত্য বিষয়ের কোনো সীমা নেই, বাঁধা নেই, সমস্ত জিনিসই চিরকালের অজানা'।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯), 'অপরাজিত' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩২), 'দৃষ্টিপ্রদীপ' (১৯৩৫) 'আরণ্যক' (১৯৩৯), 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৯৪০), 'বিপিনের সংসার' (১৯৪১), 'দুই বারি'(১৯৪১), 'অনুবর্তন'(১৯৪২), 'দেবযান' (১৯৪৪) 'কেদাররাজা' (১৯৪৫), 'অথৈজল' (১৯৪৭), 'ইছামতী' (১৯৫০), মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 'অশনিসংকেত' (১৯৫১)। উপন্যাসসমূহের বিষয় আলোচনায় ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণের যে বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষিত হয়, সেগুলি হলঃ-

১) মাটির কাছাকাছি জীবন বিভূতিভূষণের উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়। অর্ধেক প্রকৃতি-অর্ধেক মানুষ নিয়েই তাঁর সাহিত্য-বিশ্ব।

২) বিভূতিভূষণের উপন্যাসের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে প্রকৃতি। কখনো তিনি প্রকৃতিকে দেখেছেন এক অপরিসীম বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে আবার কখনো বিশ্বপ্রকৃতির সীমাহীন নিবিড় সৌন্দর্যকে অনুভব করেছেন মহাকালের প্রেক্ষাপটে যেখানে সৌন্দর্যবস্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন ও স্মৃতিরূপে মনের গভীরে নিঃশব্দে সঞ্চারিত হয়, আবার কখনো প্রকৃতিরূপ চেতনা থেকে তিনি উন্নীত হয়েছেন অরূপ চেতনায় অর্থাৎ প্রকৃতি তাঁর উপন্যাসকে বিভিন্ন রূপে স্বতন্ত্র করেছে।

৩) বিভূতিভূষণের শিল্পী হৃদয়ের সব থেকে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল তাঁর অকৃত্রিম সহানুভূতিশীলতা, নিতান্ত সাদামাটা সাধারণ জীবনের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতিতে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি অসাধারণ তৃপ্তিমধুর হয়ে গড়ে উঠেছে।

৪) বিভূতিভূষণের উপন্যাস গঠনরীতির মধ্যে কথকতার মেজাজ লক্ষিত হয়, ভাষায় জটিলতা কিংবা আঙ্গিক বিন্যাসের মারপ্যাঁচ নয়, সহজ ভাষায়, সরল কথায় সরসতার উপর ভর করে তাঁর উপন্যাস রচিত।

বিভূতিভূষণ মানবজীবনের পাঁচালীকার। সময়ের বিস্তৃত বক্ষে জীবনকে স্থাপিত করে তার অন্তহীন পথচলাকে কথাবস্তুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর উপন্যাসের প্রত্যেক চরিত্র আজীবন আদি অন্তহীন পথেই জীবনকে অন্বেষণ করে চলে। তাঁর 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটি তিনখণ্ডে বিভক্ত বল্লালী-বলাই, আম-আঁটির ভেপু, অক্রূর সংবাদ। প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি সেকালের প্রতিনিধি ইন্দিরা ঠাকরুণের মৃত্যুতে। দ্বিতীয় খণ্ডের সমাপ্তি নিশ্চিন্দপুর ত্যাগ করে কাশীযাত্রায়। তৃতীয় খণ্ডের সমাপ্তি কাশীর লাঞ্ছিত জীবনযাত্রার অবসান সূচনায়। হরিহর-সর্বজয়া-অপু-দুর্গা নিয়ে নিশ্চিন্দিপুরের এক ছোটো পরিবার। হরিহর স্বপ্নবিলাসী, বাস্তব বিমুখ, সংসার উদাসীন, ভ্রাম্যমান। দারিদ্র্য তার নিত্য সঙ্গী, অপু তারই পুত্র। উপন্যাসে ইন্দির ঠাকরুণ বল্লালী আইনের শেষ প্রতিনিধি। দুর্গা ও হরিহরের মৃত্যুর পর অপুরা যখন কাশী যাত্রা করে তখন অপু ছেড়ে যায় দুর্গাকে, নিসর্গকে, তার শৈশবকে, নিশ্চিন্দিপুরকে। বিভূতিভূষণ যে কতো বড়ো নিপুণ-নির্মম শিল্পী তার প্রমাণ জীবন-মৃত্যুর ফ্রেমে বাঁধা এই উপন্যাস। ইন্দির ঠাকরুণ, দুর্গা ও হরিহরের মৃত্যু; পরপর এই তিনটি মৃত্যু এই উপন্যাসে সমৃদ্ধ করেছে জীবনকে। দ্বিতীয়

খণ্ডে রানুদিকে, তৃতীয় খণ্ডে লীলাকে পেয়েছে অপু। একজনের স্নেহ, অন্যজনের ভালোবাসা অপুকে গড়ে তুলেছে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সর্বজয়ার মাতৃস্নেহ। আসলে নিশ্চিন্দিপুরের গ্রাম্য-প্রকৃতির প্রতিনিধি রূপেই অপুর জীবনে সর্বজয়ার প্রভাব ব্যাপ্ত হয়েছে। একদিকে মৃত্যুতে, অপরদিকে জীবনের অঙ্গীকার দুয়ে মিলে গড়ে উঠেছে 'পথের পাঁচালী'।

'পথের পাঁচালী'র বিস্তার 'অপরাজিত'তে, 'পথের পাঁচালী'র জীবন ছিল সরল একমুখী। 'অপরাজিত'র জীবন জটিল বহুমুখী। গ্রাম্যকৈশোর অপু আর কৈশোরোত্তীর্ণ ছাত্র অপু এক নয়। অপুর বন্ধনমোচনের পালা শুরু হয়েছে তার স্কুলে ভর্তি হওয়ায়, সেই পালা মধ্যবিন্দুতে পৌঁছেছে সর্বজয়ার মৃত্যুতে। মায়ের মৃত্যুসংবাদে অপুর মনোভাব মিশ্রিত, প্রথমে মুক্তির আনন্দ, পরমুহূর্তে নিজের মনোভাবে আতঙ্ক। মায়ের মৃত্যুর পর অপু ছিল সহায়শূন্য, বন্ধুশূন্য, গৃহশূন্য, আত্মীয়শূন্য জগতে সম্পূর্ণ একাকী। আর এই বদ্ধ জীবনে আনন্দ নিয়ে আসে অপর্ণা। অপর্ণার মধ্য দিয়ে অপু সর্বজয়াকে, নিশ্চিন্দিপুরকে ফিরে পেয়েছে। কিন্তু অপর্ণার মৃত্যুতে অপুকে গ্রাস করে বিরাট শূন্যতা। অবশ্য শূন্যতা ভরাট হয় কাজলের মধ্য দিয়ে। কাজল অপুর প্রতিরূপ, তার দ্বিতীয় সত্তা। এর মধ্যেই সে খুঁজে পেয়েছে তার হারানো শৈশবকে, তার সমস্ত মোহ-মাধুর্যকে। উপন্যাসের শেষে বহির্বিশ্বে বন্ধনমুক্ত জীবনপথিক অপু হেঁটে যায় অজানা দেশের পথে, আর কাজল জীবনের চলমানতা, প্রবাহমানতা, অবিচ্ছিন্নতার প্রতিনিধি হয়ে থেকে যায় নিশ্চিন্দিপুরে।

'আরণ্যক' এর কথক সত্যচরণ, 'পথের পাঁচালী'র অপু আর তাদের সৃষ্টিকর্তা বিভূতিভূষণ ভিন্নরূপে একই সত্তার প্রকাশ। 'আরণ্যক'এ সত্যচরণের জীবনে অরণ্য প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষ। দিগন্তশীল মহালিখা রূপের পাহাড় ও মোহনপুরা অরণ্যানীর পটভূমিতে নাঢ়া বইহার ও লবটুলিয়ার অরণ্য প্রান্তর বিনষ্ট করে বসতি স্থাপনের কাজটি সত্যর হাতেই নিষ্পন্ন হয়েছিল। তবু এই অরণ্য প্রকৃতিকে সত্য ভালোবেসেছে। সেই সঙ্গে তার মনের মণিকোঠায় সাজানো আছে বহু চরিত্র ভানুমতী, মঞ্চী, যুগলপ্রসাদ, রাজু পাঁড়ে, গনোরী প্রমুখ। এই উপন্যাসের মূল বিষয়— অরণ্য ধ্বংস করে মানুষের বসতি স্থাপন, এখানে গ্রাম উঠে গেছে শহরে। আধুনিক সভ্যতায় এই ধ্বংস থেকে পরিত্রাণ নেই, আরণ্যক বাহ্যত এরই কাহিনি। অন্তরে এক অসাধারণ প্রকৃতি-অভিজ্ঞতার বিবরণ, ভূমি সংলগ্ন জীবনের আখ্যান। এই উপন্যাস বিষয়বস্তুতে, প্রকরণে, চরিত্রচিত্রশালায়, ভাষায় আমাদের প্রচলিত উপন্যাস সংস্কারকে বিপর্যস্ত করে দেয়।

'আদর্শ হিন্দু হোটেল' উপন্যাসে রাণাঘাটে হোটেল ব্যবসাবুদ্ধির একটি সরস ও উপভোগ্য চিত্র আঁকা হয়েছে। নাগরিক চাতুর্য ও কারিগরি মারপ্যাঁচ বর্ণনায় ফাঁকে ফাঁকে লেখক এখানে ঘন বাঁশবন ও আগাছার জঙ্গলের আড়ালে অযত্ন বিকশিত বন্যফুলের ন্যায় মৃদু সৌরভপূর্ণ পল্লীজীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন তাতে তাঁর প্রকৃতি মুগ্ধতার পরিচয় ব্যক্ত হয়। 'দেবযান' উপন্যাসে পরজন্মে বিশ্বাসের পটভূমিতে কল্পনার বিশালতা ও বৈচিত্র্যের পটভূমিতে অজানা বিশ্বাসের ছবি ফুটে উঠেছে ভ্রাম্যমান তরুণ দেবতার বিশ্বপরিক্রমার বিবরণের সূত্রে। সেই সঙ্গেই পাই নিম্নবিত্ত বাঙালি সংসারের প্রতি লেখকের গভীর মমতা, যাকে গরীবের সংসারের প্রতি লেখকের লোভ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রকৃতিপ্রেম, জীবনের প্রতি অনুরাগ আর সেই সঙ্গে গভীর ঈশ্বরপ্রেম, এই তিন মিলে সৃষ্ট হয়েছে 'ইছামতী'। উপন্যাসের নায়ক ভবানী বাড়ুয্যে। যে পরিব্রাজক থেকে গৃহী হয়েছে তিলু-বিলু-নিলু এই তিন বোনকে বিবাহ করার মধ্য দিয়ে। কিন্তু তার অন্তরের বদল হয়নি। ভবানীর অন্তরে যে আধ্যাত্মিক পিপাসা তা নষ্ট হয়নি। তার ঈশ্বরপ্রেম আর লেখকের ঈশ্বরপ্রেমে ব্যবধান নেই। আসলে বিভূতিভূষণ এক অধ্যাত্মবিশ্বাসী আদর্শবাদী শিল্পী,

যিনি প্রকৃতি মুগ্ধতায় এবং গ্রাম্যজীবন ও পূর্বতন পারিবারিক জীবনের সারল্যে বিশ্বাস করেন। 'ইছামতী' সে বিশ্বাসের ছবি, জীবনপ্রবাহের প্রতীক। বিভূতিভূষণের গ্রামবাংলা চেতনার অপর নিদর্শন 'অশনি সংকেত'। উপন্যাসটির পটভূমি 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'। মন্বন্তর কত ভয়ঙ্কর তা কাপালীদের ছোটো বউ জেনেছে, অনঙ্গ বউ জেনেছে। বিভূতিভূষণ নির্বিকারভাবে দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকেছেন। উপন্যাসে কাপালীদের ছোটো বউ বার বার দেহ বিক্রি করে নিয়ে আসে চাল। পেট ভরানোর ভাত চাই। অন্নহীন পরিবেশকে গড়ে তুলেছেন তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনচিত্রের মাধ্যমে।

অর্থাৎ জীবনশিল্পী বিভূতিভূষণ শৈল্পিক নৈপুণ্যে এইসব বস্তুনিষ্ঠ ছবি আঁকার মধ্য দিয়ে বাংলা উপন্যাসের জগতে স্বতন্ত্র পদচিহ্ন রেখে গেছেন।

১৫.৪ গল্পকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্পর্শে যখন বাংলা কথাসাহিত্য সমৃদ্ধির পথে সেই সময়ে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব বাংলা কথাসাহিত্য জগতে নতুন সম্ভাবনা সূচিত করেছিল। তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে বয়সে প্রবীণ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) এক অলৌকিক জীবনের কথকতা নির্মাণ করেছিলেন। পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীর সঙ্গে মাটির ও মানুষের কথা তিনি শুনিয়েছেন। ফেলে আসা গ্রাম্য জীবনের মাধুর্য ও স্নিগ্ধতা, তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীবন তাঁর গল্পের প্রধান সুর। তাঁর গল্পসত্তার বৈশিষ্ট্যকে আমরা এইভাবে চিহ্নিত করতে পারি,

১. বিভূতিভূষণের গল্পে জীবন ও মানুষের প্রতি অকৃত্রিম মমত্বের কথা প্রকাশিত হয়েছে।
২. তাঁর গল্পসত্তায় স্মৃতিকথার উদ্ভাসন লক্ষ করা যায়।
৩. জটিল জীবনের ছবি না এঁকে তিনি তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীবনের ভালো-মন্দের, সুখ-দুঃখের, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের ছবি এঁকেছেন। শহুরে কৃত্রিম জীবনকে বাদ দিয়ে অতিপরিচিত হাসি-কান্নায় মুখরিত তাঁর গল্পবিশ্ব।
৪. বিভূতিভূষণের গল্পে মানুষের শুভবোধের উপর গল্পকারের বিশ্বাসের কথা ধ্বনিত হতে দেখা যায়। এখানেই তাঁর ঈশ্বরানুভূতির তথা অধ্যাত্মচেতনার ঠিকানা পাওয়া যায়। ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যা উত্তরণের সমাধান সূত্র তিনি কথনভঙ্গির মধ্যে রেখে দেন।
৫. সহজ কথায়, সাবলীল ভাষায় তিনি গ্রামীণ জীবনকে সুরভিত করে তুলেছিলেন।

ছোটোগল্পকার রূপে তিনি মানব হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে দুঃখবেদনার, সুখ-আনন্দের মণিমুক্তোকে তুলে নিয়ে আসেন। ১৯২২-১৯৫০ এই সময়পর্বে বিভূতিভূষণ ২২৪টি গল্প লিখেছিলেন। তাঁর গল্পগ্রন্থের সংখ্যা ১৯টি। উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলি হল— মেঘমল্লার (১৯৩১), মৌরীফুল (১৯৩২), যাত্রাবদল (১৯৩৪), জন্ম ও মৃত্যু (১৯৩৭), কিন্নরদল (১৯৩৮), বেণীগীর ফুলবাড়ি (১৯৪১), নবাগত (১৯৪৪), তালনবমী (১৯৪৪) ইত্যাদি। বিভূতিভূষণের ছোটোগল্পগুলি বিষয় বৈচিত্র্যে অনবদ্য। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'উপেক্ষিতা' প্রকাশিত হয় ১৩২৮ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যার 'প্রবাসী' পত্রিকায়। তাঁর গল্পের মজ্জায় মিশে আছে প্রকৃতি। তাঁর গল্পে প্রকৃতি রক্তমাংসের জীবন্ত চরিত্র। গল্পবিষয়ে প্রবেশ করলে গল্পসত্তার বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

'কুশল পাহাড়ী' গল্পে দেখা যায় বিশ্বপ্রকৃতি রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের ডালি নিয়ে উপস্থিত। এ গল্পে গল্পকার বিভূতিভূষণের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়। বিভূতিভূষণের ছোটোগল্পে শুধু প্রকৃতি নয়, প্রকৃতি ও মানুষের অকৃপণ সহাবস্থান লক্ষিত হয়। কোমল কঠিন প্রকৃতির কোলে লালিত মানব চরিত্রের কোমল রূপ তাঁর গল্পে চিত্রিত।

বেশিরভাগ গল্পে প্রকৃতি ও মানুষের স্নিগ্ধরূপ দেখা যায়। যেমন 'জাল' গল্পে রামলাল নামক এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রকৃতির স্নিগ্ধ রূপে আকৃষ্ট হয়ে শহর ছেড়ে নির্জন স্থানে নতুন বাসস্থানের কথা ঘোষিত হয়েছে। 'সিঁদুরচরণ' গল্পে মানুষের অল্পে তুষ্ট জীবনের অসাধারণ লীলাচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'পুঁইমাচা' গল্পে ক্ষেন্তি চরিত্রের মধ্য দিয়ে দুর্গার আভাস ফুটে উঠেছে। ক্ষেন্তি ও পুঁইমাচা যেন এক অভিন্ন সত্তা। 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি','তালনবমী' গল্পেও প্রকৃতি ও মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক উত্থাপিত হয়েছে।

বিভূতিভূষণের ছোটোগল্পে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান জায়গাটি হল মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা না দেখিয়ে জীবনের অকৃত্রিম রূপকে প্রকাশ। 'বুধোর মায়ের মৃত্যু', 'আমার ছাত্র', 'তামাসা', 'দ্রবময়ীর কাশীবাস', 'সিঁদুরচরণ', 'বুধীর ঘরে ফেরা' ইত্যাদি গল্পে দুঃখ-দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার রূপ প্রকাশিত হয়েছে, উপস্থাপিত হয়েছে অন্ত্যজ মানুষের দুঃসহ দিনযাপনের ছবি।

গল্পের মধ্যে তিনি কোথাও আদিম জৈবতার কথা লেখেননি। যুদ্ধোত্তর অবক্ষয়ের মধ্যে সাহিত্য রচনা করতে বসেও তিনি জীবনকে পরম প্রেমে আবৃত করে দেখতে চেয়েছেন। বিশ্বাস ভঙ্গ নয়, বরং আশ্বাসের জগত সৃষ্টি করে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা গল্প মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'মৌরীফুল', 'মেঘমল্লার' প্রভৃতি গল্পে তিনি মানুষের সাধ ও সাধ্যের টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত জীবনের বাণীমূর্তি ফুটিয়ে তুলেছেন।

বিভূতিভূষণের গল্পগুলি খুব সাধারণভাবে স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে গড়ে উঠেছে। গল্পকে কথকতার ভঙ্গিতে নির্মাণ করে দেশজ লৌকিক বিধিকে সংযুক্ত করেছেন। তাঁর রচনাভঙ্গির মধ্যে এক আশ্চর্য ধরনের সারল্য আছে। গল্প শেষে যে, চমক পাঠক প্রত্যাশা করেন— সেই চমক সৃষ্টিতে বিভূতিভূষণ কখনই আগ্রহ প্রকাশ করেননি। জীবন দর্শনে এক নির্লিপ্ত, নিরাসক্তি বোধ তাঁর গল্পের মধ্যে লীন হয়ে আছে। তিনি বলেছেন 'যেসব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে, তাদের কথা বলতেই হবে, তাদের সে গোপন সুখ-দুঃখকে রূপ দিতে হবে।' জীবনের দুঃখই শুধু সত্য নয়। জীবনের আনন্দঘন দিকটিকে উদযাপন করার জন্য তিনি প্রেমানুভূতি আনন্দময় পরিবেশ গল্পে রচনা করেছেন।

গল্প রচনার ক্ষেত্রে প্রচলিত আঙ্গিক ব্যবহারের গতানুগতিক পথকে পরিত্যাগ করে বিভূতিভূষণ নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন। গল্পের পরিসরে মুহূর্ত সৃষ্টি করে অতি সাধারণ বিষয়কে অসাধারণ করে তুলেছেন। তাই বলা যায়, বিভূতিভূষণের গল্পে যে বিচিত্র বিষয় ও রসের আস্বাদ পাওয়া যায় তা সর্বতোভাবেই উপভোগ্য।

১৫.৫ সারাংশ

বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যে প্রকৃতি ও মানুষ গভীরতা, নির্জনতা, চলমানতা ও দার্শনিকতার ঐশ্বর্যে, মাধুর্যে পরিব্যাপ্ত। এখান থেকেই পাঠক পান আধ্যাত্মিকতার প্রথম পাঠ। অপু ও দুর্গার বিস্ময়ভরা চোখে, সত্যচরণের জীবন-উপলব্ধিতে প্রকৃতি ও মানুষের নিগূঢ়তা ফুটে ওঠে। আবার সমকালীন সমাজ পরিস্থিতিও তাঁর কথাবস্তুতে বাস্তবতার আশ্রয়ে নির্মিত হয়। তবে তিনি নিজের উপলব্ধি তাঁর মতো করেই নিরাভরণ, সহজ, সরল ভাবেই প্রকাশ করেছেন। ফলত তাঁর প্রত্যেকটি শব্দচয়ন যেন একতারার মিঠেল সুরমূর্ছনা। তাঁর কথাবস্তুর পাতায় পাতায় ভাব-ভাষা-অভিজ্ঞতা-দর্শনের অজস্র অনুচ্ছেদ স্বাতন্ত্র্যের অভিজ্ঞান। আর এখানেই তিনি একমেবদ্বিতীয়ম।

১৫.৬ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) বাংলা উপন্যাসের ধারায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৌলিকতা বিচার করুন।

২) বাংলা ছোটোগল্পের ধারায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনবত্ব বিচার করুন।

৩) বাংলা উপন্যাসের ধারায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিসর্গদৃষ্টির পরিচয় দিন।

৪) 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের বিষয়বস্তু লিখে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৫) ছোটোগল্পকার রূপে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন?

৬) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোদের জন্য লেখা উপন্যাসগুলির পরিচয় দিন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা প্রথম গল্পটির নাম কী? এটি কোন্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

২) 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের প্রকাশসাল লিখুন। এটি কী জাতীয় উপন্যাস?

৩) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্বন্তর নিয়ে লেখা একটি উপন্যাসের নাম লিখুন। কত সালে প্রকাশিত হয়?

৪) 'আরণ্যক' উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৫) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা দুটি গল্পের নাম লিখুন।

৬) 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস কোন্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

৭) কোন্ উপন্যাসের জন্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কার পান? তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

১৫.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) দেবীপদ ভট্টাচার্য, উপন্যাসের কথা, দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত প্রথম দে'জ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৩।

২) অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৫৭।

৩) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা (বাংলা ছোটগল্পের একশ কুড়ি বছর : ১৮৯১-২০১০), দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৪।

৪) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে বিংশ শতাব্দীর উপন্যাস, দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৪।

৫) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যে ছোটগল্প, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. : কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪০৫।

৬) ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও ছোটগল্পকার, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রা.লি. : কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০০৬-২০০৭।

৭) গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন কথাসাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮০।

৮) ভূদেব চৌধুরী, ছোটগল্পের কথা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পরিমার্জিত তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০০।

৯) অলোক রায়, বাংলা উপন্যাস: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, পুস্তক বিপণি : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০০।

১০) দেবেশ রায়, উপন্যাস নিয়ে, দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ,২০০০।

১১) ক্ষেত্র গুপ্ত। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড), গ্রন্থনিলয় : কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০০।

১২) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা, দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৬।

১৩) দেবেশ রায়, উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে, দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ, ২০০৫।

১৪) রুশতী সেন, বিভূতিভূষণঃ দ্বন্দ্বের বিন্যাস, প্যাপিরাস : কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৩।

একক-১৬ ❑ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

গঠন

১৬.১ উদ্দেশ্য
১৬.২ প্রস্তাবনা
১৬.৩ ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬.৪ গল্পকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬.৫ সারাংশ
১৬.৬ অনুশীলনী
১৬.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১৬.১ উদ্দেশ্য

আধুনিক জীবন- চেতনার বলিষ্ঠ রূপকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্বিষ্ট বৃহত্তর জগতের বিবিধ অন্তেবাসী জীবনের মধ্যে সদর্থক পদক্ষেপ অনুসন্ধান। এই এককে শিক্ষার্থীরা তারাশঙ্করের জীবনদর্শন সম্পর্কে জানতে পারবেন, জানতে পারবেন বিভিন্ন বৃত্তির মানুষের জীবন সংগ্রাম সম্পর্কে। কোন সময় পর্বে তিনি কথাসাহিত্যের ভুবন নির্মাণ করেছিলেন, তাঁর সাহিত্য-ভাবনায় কোন কোন বৈশিষ্ট্য মিশে আছে, কোন কোন পৃথক বৈশিষ্ট্যের কারণে কল্লোল যুগেও কথাসাহিত্যের পৃথক জগৎ নির্মাণ করতে পেরেছিলেন, তাঁর উপন্যাস ছোটোগল্পের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যই বা কী — এমনি নানা জিজ্ঞাসার উত্তর শিক্ষার্থীরা খুঁজে পাবেন। সর্বোপরি তাঁর উপন্যাস ও ছোটোগল্পের সামগ্রিক পরিচয় শিক্ষার্থীদের ভাবনার জগৎকে উসকে দিতে সাহায্য করবে।

১৬.২ প্রস্তাবনা

তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যের বিপুল জগতে নানা শ্রেণির মানুষ ভিড় করে এসেছে। তারা এসেছে নানা বৃত্তি থেকে, সমাজের নানা স্তর থেকে। কাহার-বাগদি-দুলেরা যেমন এসেছে তেমনি এসেছে সামন্ততান্ত্রিক মানুষও। এই নানা মানুষের স্বভাবের সূক্ষ্মতা, তাদের জটিলতা, তাদের অনুভবের বিচিত্র প্রকাশভঙ্গির বিন্যাস যে পরিচয়ের দানা মেলে ধরে তা অতুলনীয়। কথাসাহিত্যে মহাকাব্যিক বিস্তার, ভাষার বৈভব, আস্তিক্যবোধে আস্থা, মানবিক জীবনবোধে উত্তরণের শিল্পিত আবিষ্কার তারাশঙ্করকে কথাসাহিত্যের সমৃদ্ধির আসনে অধিষ্ঠিত করে।

১৬.৩ ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

‘‘আমি সাহিত্য ক্ষেত্রে এসেছিলাম স্বাভাবিক আলাদা দৃষ্টিকোণ নিয়ে, অন্তরের স্বতন্ত্র উপলব্ধি নিয়ে। ‘চৈতালী ঘূর্ণি’ তে আমি তা প্রথম বলতে চেষ্টা করেছিলাম। ‘ধাত্রীদেবতা’,‘কালিন্দী’ তে নতুন করে সেই কথা বলে আমি

সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।..... রাজনৈতিক বন্ধন মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় যে দুর্নিবার আবেগ আমি জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে বিভিন্ন ভঙ্গিতে প্রকাশিত হতে দেখেছিলাম, তারই মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলাম মানুষের সনাতন জীবনমুক্তির সাধনা। জীবন মুক্তি বলতে ভয়ের বন্ধন, ক্ষুদ্রতার গণ্ডি, অভাবের পীড়ন, জীবনে জোর করে চাপানো সকল প্রকার প্রভাবের বিরুদ্ধে মানুষ সংগ্রাম করে চলেছেন। সেই তাঁর অভিযান।" (কালের প্রতিমা থেকে উদ্ধৃত)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) তাঁর বৃহত্তর কর্মশালায় জীবন-ভাবনার বিচ্ছুরণে মানুষের অবস্থানকে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এক অনন্য প্রতিভা। তিনি আমাদের অস্থির সংশয়, বিক্ষুব্ধ অবিশ্বাসী যুগের প্রধান কথাশিল্পী। তারাশঙ্করের আগে বাংলা সাহিত্যের তিন জ্যোতিষ্ক— বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র তাঁর মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে আছেন। তাই বিংশ শতকের শিল্পী হয়েও তিনি ঐতিহ্য অনুসরণ থেকে বঞ্চিত হননি। আধুনিক হবার কোনো বিশিষ্ট সাধনা তাঁর নেই। তবু যুগের তরঙ্গসঙ্কুলতা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর উপন্যাসে মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি আছে, আছে জীবন জিজ্ঞাসার গভীরতা, রাঢ়ের রুক্ষ্ম ভূমির স্পর্শ, শ্রমজীবী চরিত্রের সুনিপুণ গঠন এবং সুতীব্র আত্মানুসন্ধান। যা তাঁর উপন্যাসকে দুর্লভ শিল্পোৎকর্ষ দিয়েছে। জীবনের সংবেদনের অমোঘতায় তারাশঙ্কর সমকালের শ্রেষ্ঠ উত্তীর্ণ শিল্পী। আর তাঁর জীবন একান্তভাবে বীরভূমের পরিচিত আঞ্চলিক জীবন।

তারাশঙ্করের উপন্যাসকে মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়, সেই অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায় -

প্রথম পর্ব (১৯২৭-১৯৩৭)- এই পর্বে রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে 'চৈতালী ঘূর্ণি' (প্রথম উপন্যাস,১৯৩০), 'পাষাণপুরী', 'নীলকণ্ঠ ','রাইকমল', 'আগুন' ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। এই পর্বকে বলা যায় প্রস্তুতি পর্ব। এই পর্বের বৈশিষ্ট্যগুলি হল

(১) এই পর্বের উপন্যাসগুলি আকারে ক্ষুদ্র।(২) বাংলার কৃষিকেন্দ্রিক গ্রাম সমাজের বিপর্যয় এবং যন্ত্রশিল্পের ক্রমবিস্তার সমাজসত্য হিসাবে উপন্যাসে প্রতিফলিত। (৩) রাজনৈতিক আদর্শবাদের প্রতি একটি বিশিষ্ট প্রবণতা তাঁর উপন্যাসকে স্বতন্ত্র করেছে। (৪) বৈষ্ণবী নায়িকার মুক্তি সন্ধান এই পর্বের উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। (৫) রাঢ় বাংলার গোষ্ঠী সম্প্রদায় বা বিশিষ্ট শ্রেণির সামগ্রিক জীবনচিত্র তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। (৬) জীবনসত্যের সন্ধানে কোনো কোনো চরিত্রে দার্শনিকতার মাহাত্ম্য সংযুক্ত হয়েছে।

'রাইকমল' উপন্যাসে তারাশঙ্কর একটা সম্পূর্ণ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে এঁকেছেন। এখানে বৈষ্ণবদের বিশ্বাস ও লীলা প্রাচুর্যের মধ্যে এক বৃহত্তর সমাজের ইঙ্গিত বহনের চিত্র লক্ষ করা যায়। 'আগুন' উপন্যাসে ব্যক্তির জটিল ও অন্তহীন জিজ্ঞাসা প্রাধান্য পেলেও অরণ্য প্রকৃতির উপর বিপুল যন্ত্রশক্তির অধিকার বিস্তারের কথা প্রাধান্য পেয়েছে।

দ্বিতীয় পর্ব (১৯৩৯-১৯৫০-৫১)- এই পর্বে রচিত প্রধান উপন্যাস 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'কবি', 'গণদেবতা', 'মন্বন্তর', 'সন্দীপন পাঠশালা', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'। দ্বিতীয় পর্বের এই উপন্যাসগুলি তারাশঙ্করকে বাংলা সাহিত্যে নিঃসংশয়িত প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।এই পর্বের সাধারণ লক্ষণগুলি মোটামুটি এই ধরনের- (১) একটি সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবন চিত্র, তাঁর কামনা, বাসনা, বিশ্বাস, সংস্কার, ভৌগোলিক অবস্থান যেন মহাকাব্যিক বিশালতা নিয়ে তারাশঙ্করের এই পর্বের উপন্যাসে প্রকাশিত। (২) মানুষের জৈব প্রবৃত্তির প্রাবল্য বিচিত্র ভঙ্গির মধ্যে দিয়ে নানা রূপে প্রকাশিত এই পর্বের রচনায়। এই প্রবৃত্তির বিচিত্র রং কখনো তা কামনায় উগ্র, কখনো লোভে লালায়িত, কখনো ক্রোধে বহ্নিমান আবার কখনো শক্তি দম্ভে উদগ্র। (৩) এর পাশাপাশি আছে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবন জিজ্ঞাসা। কোথাও সে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় পুরুষ, আবার কোথাও বহুর মধ্যে একের প্রতিনিধি। (৪) তারাশঙ্করের উপন্যাসের রূপ-রীতি এই পর্বে দুটি পথে বিভক্ত- ক) একজন ব্যক্তির জীবন

অভিজ্ঞতা ও জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে বহু ঘটনা ও বিচিত্র মানুষের সমাবেশ, খ) গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের ব্যাপক জীবন কথার বর্ণনা।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭) উপন্যাসে কাহারদের সমাজব্যবস্থার পাশাপাশি তাদের বাস্তববোধ ও সামগ্রিক জীবনবোধের পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। অন্ত্যজ গোষ্ঠীর লৌকিক ও অপ্রাকৃতিক সংস্কার- বিশ্বাস কীভাবে এক গোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'। 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯) 'গণদেবতা' (১৯৪২-এ প্রকাশ, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্তি), 'কবি'(১৯৪৪), প্রভৃতি উপন্যাসেও রাঢ়বাংলার আঞ্চলিক জীবনের ব্যাপক চিত্রণ লক্ষিত হয়।

তৃতীয় পর্ব (১৯৫০-এরপর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত)- 'আরোগ্যনিকেতন', 'বিচারক', 'রাধা', 'সপ্তপদী', 'মহাশ্বেতা দেবী' প্রভৃতি এইপর্বের উল্লেখযোগ্য রচনা। এই পর্বের উপন্যাসের ভাবকল্পনা ও রূপলক্ষণ — পূর্ববর্তী পর্ব থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র, স্বাতন্ত্র্যের মাত্রা আমরা এইভাবে চিহ্নিত করতে পারি—

(১) এই পর্বের উপন্যাস জৈব প্রবৃত্তির লীলা থেকে মহত্তর মানববৃত্তিতে উত্তরিত হয়েছে। ভারতের অতীত মাহাত্ম্য ও সত্যানুসন্ধানের প্রতি তীব্র আসক্তি থেকে নিরাসক্তিতে প্রবেশ করার মন্ত্রগ্রহণ করেছিলেন যার প্রতিফলন ঘটেছে এই পর্বে সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে। (২) এই পর্বের উপন্যাসের নায়কেরা আত্মার সত্যানুসন্ধানে উদ্ভাসিত হয়েছে। প্রত্যেকেই জীবন সত্যের সন্ধান করেছে। প্রবৃত্তি থেকে নিরাসক্তির ঠিকানায় আশ্রয় চেয়েছে এবং শেষপর্যন্ত আদর্শবাদের জয় ঘোষিত হয়েছে। (৪) তারাশঙ্কর এই পর্বের উপন্যাসে প্রায়ই গ্রাম পটভূমি পরিত্যাগ করে নাগরিক হয়ে উঠেছেন।

'সপ্তপদী'তে রূপজ প্রেমবাসনা থেকে প্রেমশুদ্ধিতে উত্তরণ , 'বিচারক' এ বাঁচার জৈব প্রবৃত্তি, 'কীর্তিহাটের করচা'য় সম্পদ ভোগ বাসনা, 'আরোগ্যনিকেতন'-এ মৃত্যুর গ্রাম থেকে জীবনকে ধরে রাখবার সাধনা সবই এই পর্বের উপন্যাসে আমরা লক্ষ করতে পারি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক নন, বিংশ শতকের প্রথমার্ধে পশ্চিমবাংলার রাঢ় অঞ্চলের গ্রাম জীবন ও তার জটিল আর্থসামাজিক বিন্যাসের রূপকার তিনি। তাঁর শিল্পীমন দেশ কাল সমাজের পটভূমিকায় যে বিচিত্র নরনারীর চিত্রশালা নির্মাণ করেছে, মাটির মমত্ব ও মানুষের মহিমার কথা শুনিয়েছে তা দেশ কাল নিরপেক্ষ রূপ লাভ করেছে। আর এখানেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ, স্বতন্ত্র।

১৬.৪ গল্পকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ ও মানিকের মতো বিষয়ের অভিনবত্বে বাংলার ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রধারার জীবন পথিক হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)। তারাশঙ্কর গ্রামীণ জীবনচর্যায় তাঁর সাহিত্য জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন। কল্লোল পত্রিকায় লিখেও তিনি কল্লোল হননি। তাঁর জগৎ পরম বিশ্বাসের জগৎ। তাই কল্লোলের যে প্রবল বিদ্রোহ ও ভোগবিলাস লক্ষ করা যায় তারাশঙ্করের দৃষ্টি ছিল তার বিপরীতের। সিরিয়াস বিষয়ের বোধন, বরণ ও তাকে প্রতিষ্ঠিত করেন বাংলা ছোটোগল্পের জগতে। বাংলার ছোটোগল্পের গতিমুখে তিনি এক অপরিসীম স্থৈর্য্য নিয়ে গল্পের রাজাসন নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর গল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ মৌলিক জীবন জিজ্ঞাসার জন্ম দিয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন কল্যাণস্নিগ্ধ সত্য সুন্দর জীবনই কাম্য। এই বিশ্বাসের ডানাতে ভর করে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ছোটোগল্পকে সমৃদ্ধ করেন। তারাশঙ্করের গল্পে প্রবেশ করলে নিম্নলিখিত

বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করা যায়—

১. তারাশঙ্কর রাঢ় অঞ্চলের নিপুণ কথাকার। রাঢ়ের জীবনচর্চা ও জীবনচর্যা তারাশঙ্করের গল্পে নানারূপে প্রতিভাত। এক আঞ্চলিক জীবনসত্যের দৃষ্টান্ত তিনি গল্পে স্থাপন করেছিলেন।

২. তারাশঙ্করের ছোটোগল্পে লোকজীবন তার অন্তরঙ্গ রূপের ডালি নিয়ে উপস্থিত। বিশ্বাস, সংস্কার, আচার, অনুষ্ঠান, উৎসব— লোকজীবন সমগ্রতা নিয়ে গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে।

৩. তারাশঙ্করের ছোটোগল্পে ধনতন্ত্রের সাথে সামন্ততন্ত্রের বিরোধ লক্ষ করা যায়।

৪. তিনি অন্ত্যজ মানুষের জীবনকে পরম সহমর্মিতায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

৫. তাঁর গল্পগুলি আঞ্চলিক গণ্ডীকে পেরিয়ে চিরকালের সাহিত্যের পদমর্যাদা লাভ করেছে।

৬. তাঁর গল্পগুলি এক মহাকাব্যিক ব্যাপকতায় ভাস্বর। তিনি রাঢ় অঞ্চলের ঐশ্বর্য বিস্তার বৈচিত্র্যকে বিশাল এক ক্যানভাসে বিস্তৃত করেছিলেন।

৭. তাঁর গল্পের ভাষা বিষয় উপযোগী। গুরুগম্ভীর ভাষা দিয়ে জীবন ও সমাজ, মানুষ ও মানবিক সম্পর্ককে এক একটি তুলির টানে মূর্ত করে তুলেছিলেন।

তারাশঙ্কর প্রায় কয়েকশো ছোটোগল্প লিখেছেন। তাঁর গল্পগ্রন্থের সংখ্যা ৫৩টি। গল্পগ্রন্থগুলি হল নিম্নলিখিত— 'ছলনাময়ী' (১৯৩৬), 'জলসাঘর' (১৯৩৭), 'রসকলি' (১৯৩৮), 'তিনশূন্য' (১৯৪১), 'বেদেনী' (১৯৪৩) ইত্যাদি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তারাশঙ্কর বলেছেন, 'আমার নিজের সাহিত্যের মধ্যে আমি যা বলেছি তা সুস্পষ্টভাবে সেকালের সাহিত্যের বক্তব্য থেকে পৃথক।' তিনি জীবনকে দেখেছেন অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দিয়ে, তাঁর অভিজ্ঞতা বিশাল, চরিত্রগুলি নিজের চোখে দেখা। তাঁর গল্পের মূল সূত্রে রয়েছে নিজস্ব রাজনীতি চেতনাবোধ, সত্যের প্রতি অনুসন্ধান এবং মানুষের শুভ চেতনার প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস। এই বৈশিষ্ট্যই তাঁকে অন্যদের তুলনায় পৃথক করে তুলেছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যখন গল্প লিখছেন তখন পুরাতন ঐতিহ্য ভেঙে পড়ে তার স্থান দখল করছে ধনতন্ত্র। এমনি এক প্রেক্ষাপটে লেখা 'জলসাঘর' গল্পে দেখি জমিদার বিশ্বম্ভর রায় থেকে ধনী ব্যবসায়ী মহিম গাঙ্গুলী যতই সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে ততই সামন্ততন্ত্র ধনতন্ত্রের কাছে ফিকে হয়ে যাচ্ছে। জমিদারতন্ত্রের অবসান গল্পকে অন্য মাত্রায় বিশেষিত করে।'রায়বাড়ি' গল্পেও এ ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে।

তারাশঙ্করের গল্পে প্রেম ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব বিচিত্রস্বাদে আস্বাদ্য। 'তারিণী মাঝি' গল্পের তারিণী,'প্রতীক্ষা' গল্পের পরী,'নারী ও নাগিনী' গল্পের খোঁড়া সেখ এই স্বভাব প্রকৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বেঁচে থাকার তাগিদে তারিণী যখন প্রেমকে হত্যা করে তখন আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে আদিম জৈব প্রবৃত্তির নিষ্ঠুর রূপমূর্তি।তবে 'মতিলাল' গল্পে তারাশঙ্কর মানুষের দৈহিক রূপের অন্তরালে একটা মাধুর্যের প্রলেপন দিয়েছিলেন।

বাংলা ছোটোগল্পের ইতিহাসে অন্ত্যজ মানুষের জীবন চিত্রণে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের দাবিদার। 'বেদেনী' 'সাপুড়ের গল্প', 'বেদের মেয়ে', 'প্রতীক্ষা', 'যাদুকরী' প্রভৃতি গল্পে অন্ত্যজ মানুষের জীবন চিত্রণের পাশাপাশি মানুষের অন্তরগহনের আকাঙ্ক্ষা স্বমহিমায় বর্ণিত। অন্ত্যজ জীবনের কামনা-বাসনা, জটিলতা, বিদ্বেষ তাঁর গল্পকে বিশিষ্ট করেছে। কিন্তু গল্পের মধ্যে আদিম প্রবৃত্তির কথা বর্ণিত হলেও স্নিগ্ধতার আবহে মানুষদের প্রতি তার সমবেদনার দিকটিও উপেক্ষিত থাকেনি।

তারাশঙ্করের কিছু কিছু গল্পে মন্বন্তরের প্রসঙ্গ এসেছে। মন্বন্তর কীভাবে পরিবেশকে ভাঙে, মানুষকে বিধ্বস্ত

করে তাঁর ছবি এঁকেছিলেন। 'বোবা কান্না' ও 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পটিতে তিনি মৃত্যুময় জীবনের ছবি এঁকেছেন। তারাশঙ্করের গল্পে বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডলে নর-নারীর জীবন উন্মেষণা লক্ষ করা যায়। 'রসকলি' গল্পটি সার্থক উদাহরণ। এছাড়া 'ডাইনী' গল্পে কুসংস্কারাচ্ছন্নতার বিষময় দিকগুলিকে চিহ্নিত করেছিলেন।

এইভাবে বিচিত্র মানুষের জীবন যাপনের ধারা বহতা নদীর মতো প্রবাহিত তারাশঙ্করের ছোটোগল্পে। তাঁর গল্পের মহাকাব্যিকতা বিস্ময়ে অভিভূত করে। গল্পগুলিকেও যে মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত করে তোলা যায় তা তিনি একমাত্র দেখিয়েছেন। তার বেশিরভাগ গল্প আকারে দীর্ঘ ও বিবৃতিধর্মী। চলমান জীবনের কথা শোনাতে গিয়ে তাঁর নিরাসক্ত দৃষ্টিকোণ গল্পকে অন্যমাত্রা দান করেছে। গল্পের মধ্যে নাটকীয়তা, রোমান্টিক বাতাবরণ নির্মাণ ও কল্পনার সংমিশ্রণ- এই ত্রিবেণী সংগম গল্পগুলিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ব্যক্তিগত জীবন উপলব্ধি, ভাবনার যথাযথ উপস্থাপনা, দেশচেতনা ও কালচেতনার কারণেই তারাশঙ্করের গল্পবিশ্ব আজও বাংলা সাহিত্যে স্বমহিমায় বিরাজিত।

১৬.৫ সারাংশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সমাজ-সচেতন লেখক। তিনি তাঁর সাহিত্য-ভুবনে অন্ত্যজ মানুষের জীবন চিত্রণের সূত্রে সমাজ-বাস্তবতার ছবি এঁকেছেন। রাঢ় অঞ্চলের কথাকার, রুক্ষ মাটির চারণকার তারাশঙ্কর সমাজের অজস্র পরিবর্তনকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন সাহিত্যে। নবীন- প্রবীণের দ্বন্দ্ব, সামন্ততন্ত্র- ধনতন্ত্রের বিরোধ, বিলীয়মান জমিদারতন্ত্র, গ্রাম-শহরের দ্বন্দ্বে তিনি বারবার ধাক্কা খেয়েছেন। সমাজ- মানুষের পরিবর্তনের নির্ভুল বাস্তবতার ছবি আমরা পাই তাঁর রচনায়। তাঁর মধ্যে রূপ সৃষ্টির ক্ষমতা এতোটাই ছিল যে তাঁর নির্মিত সাহিত্য-ভুবন দেশ-কালের চৌকাঠ পেরিয়ে এক বৃহৎ মানবিকবোধে ও ইতিবাচক আবেদনে পাঠককে আজও আবিষ্ট করে রেখেছে।

১৬.৬ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) বাংলা উপন্যাসের ধারায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্বের বিচার করুন।

২) বাংলা ছোটোগল্পের ধারায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনবত্ব বিচার করুন।

৩) বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের ধারায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৌলিকতার পরিচয় দিন।

৪) তারাশঙ্করের প্রথম পর্বের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

৫) দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য লিখে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৬) অন্ত্যজ মানুষের জীবনের কথাকার রূপে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশিষ্টতার পরিচয় দিন।

৭) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে আধুনিকতার মাত্রা নির্ণয় করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা প্রথম সার্থক উপন্যাসটির নাম কী? এটি কত সালে প্রকাশিত হয়?

২) 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' উপন্যাসের প্রকাশসাল লিখুন। এটি কী জাতীয় উপন্যাস?

৩) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিলীয়মান জমিদার শ্রেণিকে নিয়ে লেখা একটি ছোটোগল্পের নাম লিখুন।

৪) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা মন্বন্তর বিষয়ক দুটি উপন্যাসের নাম লিখুন।

৫) প্রেম ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব নিয়ে লেখা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্পের নাম লিখুন।

৬) কোন উপন্যাসের জন্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পান? এই উপন্যাসের প্রকাশকাল উল্লেখ করুন।

১৬.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। দেবীপদ ভট্টাচার্য, উপন্যাসের কথা, দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত প্রথম দে'জ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৩।

২। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড: কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৫৭।

৩। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা (বাংলা ছোটগল্পের একশ কুড়ি বছর: ১৮৯১-২০১০), দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৪।

৪। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে বিংশ শতাব্দীর উপন্যাস, দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৪।

৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যে ছোটগল্প, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি.: কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪০৫।

৬। ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও ছোটগল্পকার, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রা.লি.: কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০০৬-২০০৭।

৭। গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন কথাসাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮০।

৮। ভূদেব চৌধুরী, ছোটগল্পের কথা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পরিমার্জিত তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০০।

৯। অলোক রায়, বাংলা উপন্যাস: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, পুস্তক বিপণি : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০০।

১০। দেবেশ রায়, উপন্যাস নিয়ে, দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ,২০০০।

১১। ক্ষেত্র গুপ্ত, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড), গ্রন্থনিলয় : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০২।

১২। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা, দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৬।

১৩। দেবেশ রায়, উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে, দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ, ২০০৫।

১৪। নিতাই বসু, তারাশঙ্করের শিল্পীমানস, দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৩।

১৫। উজ্জ্বল মজুমদার (সম্পাদনা), তারাশঙ্করঃ দেশ কাল সাহিত্য, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রা.লি.: কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৬৫।

একক-১৭ ❑ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গঠন

১৭.১ উদ্দেশ্য
১৭.২ প্রস্তাবনা
১৭.৩ ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
১৭.৪ গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
১৭.৫ সারাংশ
১৭.৬ অনুশীলনী
১৭.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১৭.১ উদ্দেশ্য

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একজন রোমান্টিকতার ভাব বিরোধী বাস্তবতার চিত্রকর ও গভীর মনের নিপুণ কারিগর। এই এককে শিক্ষার্থীরা মানিকের সময়ের কথা ও কথার সময় সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন। সমাজ ও মানুষকে তিনি যে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং তাদের মনের কূটৈষণা যে কত রহস্যময় সেই সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা বিস্তারিত জানতে পারবেন। তাঁর কথা বিশ্বের বিস্তৃত পরিধিও তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

১৭.২ প্রস্তাবনা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন-ভাবনার দিক থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন পথের নির্মাতা। ফ্রয়েড ও মার্কস দুই মহান ব্যক্তিত্বের মানব-সমাজ সংক্রান্ত তত্ত্ব তাঁকে প্রভাবিত করে, অনুপ্রাণিত করে। সময়কে, সমাজকে, মানুষকে ভেঙেচুরে দেখার প্রয়াস তাঁর সব রচনাতেই লক্ষিত হয়। বাস্তবতার অন্তর্কাঠামো উন্মোচনেও তিনি অদ্বিতীয়। মনস্তত্ত্ব, রাজনৈতিক সচেতন মন, সমাজবাস্তবতার যে বহুস্বরিক বিন্যাস তাকে আন্তরিক ভাবে ও পূর্ণায়ত রূপে প্রকাশে তিনি ছিলেন দৃঢ়বদ্ধ। ফলত চরিত্র, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের ত্রিবিধ সমন্বয়ে তাঁর কথা বিশ্বে প্রধান হয়ে উঠেছে নৈর্ব্যক্তিক যুক্তি- শৃঙ্খলায় আধারিত কথাবস্তু।

১৭.৩ ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

'ভদ্র সমাজের বিকার ও কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত চাষি-মজুর-মাঝি-মল্লা-হাড়ি-বাগদিদের রুক্ষ্ম কঠোর সংস্কারাচ্ছন্ন বিচিত্র জীবন কেন অবহেলিত হয়ে থাকে, কেন এই বিরাট মানবতা- যে একটা অকাট্য অনিয়মের প্রতীক হয়ে আছে মানুষের জগতে- সাহিত্যে স্থান পায় না?' (লেখকের কথা: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) কথাসাহিত্যে পূর্ববঙ্গের মাটি ও মানুষ, তাদের জীবন-যাপনের

অভিজ্ঞতা আশ্চর্য বাস্তবতায় ভর করে উঠে আসে। কল্লোল যুগ পরবর্তী সাহিত্যে যে নবতর দিকের উন্মোচন ঘটেছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সে উত্তরাধিকার বহন করে মনস্তত্ত্ব ও রাজনৈতিক বক্তব্যের নতুন দলিল রচনা করেছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে সমাজবাস্তবতাকে বিস্তৃত পরিসরে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি মধ্যবিত্তের রোমান্টিক ভাবালুতাকে বাদ দিয়ে সমাজবাস্তবের ছবি আঁকতে চেয়েছিলেন উপন্যাসের ক্যানভাসে। ‘কল্লোল’-এ হাত না পাকিয়ে ‘বিচিত্রা’য় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আবির্ভূত হয়ে সাহিত্য জীবনে প্রবেশ করেছিলেন। প্রচলিত জীবনের আর এক রূপের প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা ও সেই সঙ্গে নিজেকে পরিপূর্ণ করার অভিপ্রায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তার সাহিত্য ভাবনা সম্পর্কে মনে করেন মানিক ‘মনস্তত্ত্বের ল্যাবরেটরিতে এক একটি স্লাইড নিয়ে তিনি জীবনের অবক্ষয়ের ব্যাধির বীজাণু খুঁজেছেন, নিজের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সঙ্গে ন্যাচারিলিস্টের মতো ফটোগ্রাফির বাস্তবতার অনুসরণে সমস্ত ভাবালুতাকে ধিক্কার দিয়েছেন, ভদ্র ও বুদ্ধিজীবী সমাজের চালিত মূল্যবোধগুলিকে তীব্র ব্যঙ্গে আঘাত করেছেন এবং ভদ্রেতর সাধারণ মানুষ সম্পর্কে তাঁর সহমর্মিতা তুলে ধরেছেন।’ তাই তাঁর উপন্যাসে কেবল সমাজকে ভেঙেচুরে দেখার বৃহৎ ইঙ্গিত নেই, বরং মানুষের কাছে গিয়ে মানুষকে স্বস্তির দেওয়ার নির্দেশন আছে।

‘বিচিত্রা’ পত্রিকায় ১৯২৮সালে ‘অতসী মামী’ নামক গল্পের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য জগতে তাঁর প্রবেশ ঘটে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস ‘জননী’ (১৯৩৫)। এছাড়াও তিনি অসংখ্য উপন্যাস লিখেছেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘দিবারাত্রির কাব্য’ (১৯৩৫), ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ (১৯৩৬), ‘পদ্মানদীর মাঝি’ (১৯৩৬), ‘অমৃতস্য পুত্রা’ (১৯৩৮), ‘অহিংসা’ (১৯৪১) ইত্যাদি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছিলেন ‘কল্লোলের কুলবর্ধন’। ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব দর্শন ও মার্ক্সের জীবনবীক্ষাকে আশ্রয় করে তিনি উপন্যাস রচনার আসরে নেমেছিলেন। তিনি মানবমনের গভীরে ডুব দিয়ে মানব জীবনের জটিলতাকে ধরতে চেয়েছিলেন। তুলে আনতে চেয়েছিলেন তাদের মূল সংকটকে। ফলত স্বাভাবিকভাবে তাঁর সাহিত্যে স্থান করে নেয় রোমান্টিক ভাববিরোধী বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ ও বিজ্ঞানসুলভ মনোভাব।

তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘জননী’তে বিস্ময়কর উপাদান না থাকলেও ‘দিবারাত্রির কাব্য’তে ফ্রয়েডীয় নিবিড় পঠন ও মনোবিকলন তত্ত্বের প্রভাব প্রকাশিত। এই উপন্যাসে হেরম্ব-সুপ্রিয়া-মালতী-আনন্দের জীবনের মধ্য দিয়ে প্রেমের অস্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত দুইটি উপন্যাস বাংলা কথাসাহিত্যে মাইলস্টোন হিসাবে স্বীকৃত। ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ উপন্যাসে গাঁওদিয়ার শশী, গাঁওদিয়া গ্রাম ও কলকাতা শহরের টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত হওয়ার কাহিনি। উপন্যাসে প্রধান চরিত্র শশীর মধ্যে গ্রাম্য মন ও শহুরে মনের মধ্যে বিরোধ লক্ষিত হয়। শশীর এই দ্বান্দ্বিক টানাপোড়েন যখন ব্যক্তিগত মাত্রাকে ছাড়িয়ে সামাজিক মাত্রাকে স্পর্শ করে তখন সে গ্রামে থেকে যেতে বাধ্য হয়। এই উপন্যাসে শশী চরিত্রের রহস্য উন্মোচনে কুসুম চরিত্রের অবতারণা ঘটান মানিক। উপন্যাসে প্রথম থেকেই কুসুম চরিত্রের বিন্যাস পাঠকের মন আকৃষ্ট করে। কুসুমের সঙ্গে যতবার পাঠকের পরিচয় ঘটে ততবারই কুসুম ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ প্রকাশে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উপন্যাসে মানিক দেখাতে চেয়েছেন, এই সমাজে পুতুল কারা এবং কে তাদের নাচায়, কীভাবে নাচায়। সূক্ষ্ম সুতোর উপর দাঁড়িয়ে থাকা জীবনের অন্তর্বাহী নির্যাসই এর মূল সত্য। তাঁর নির্মিত প্রত্যেকটি চরিত্র নিবিড় আন্তরিক উপলব্ধির উৎসারণ। এক একটি জীবন অনুভবের এক একটি নগ্ন সত্যকে তিনি এখানে প্রকাশ করেছেন। মানুষের ব্যক্তি চৈতন্যের অভিব্যক্তির বিচিত্র প্রকাশকে মানিক যে গভীরতর স্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে নির্ভীক পদক্ষেপ।

মানিকের আর একটি উপন্যাস ‘পদ্মানদীর মাঝি’তে চিরশোষিত জেলে সমাজের আখ্যান রচিত হয়েছে।

এখানে তাঁর রচনাশক্তির গভীরতা ও সাধারণ মানুষ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনই সমাজের একটি বিশেষ দিক নয়া উপনিবেশ স্থাপনের বার্তাও উঠে এসেছে। এই উপন্যাসে পদ্মাকে আঁকড়ে ধরে থাকা জেলেদের সংগ্রামমুখর জীবনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এটি একটি জনপ্রিয় আঞ্চলিক উপন্যাস। জেলেদের জীবন সংগ্রামে, প্রতিনিয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, সমবেদনার চক্রান্তে, প্রবৃত্তিগত সংঘাতে সকরুণ আলেখ্য 'পদ্মানদীর মাঝি'। সেই আলেখ্যকে তিনি পূর্ণ করেন বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ দিয়ে। এই উপন্যাসে অন্যতম প্রধান চরিত্র কুবের। যে অত্যন্ত দরিদ্র। যার নিজের নৌকো নেই, জালও নেই। সারারাত মাছ ধরে তাকে সংসার প্রতিপালন করতে হয়। জেলে সমাজের কঠিন লড়াইয়ের প্রতিনিধি কুবের। সে জানে প্রতিনিয়ত লড়াই করে তাকে বাঁচতে হয়। তাই ছেলের জন্ম সংবাদে কুবের আনন্দ পায় না। কারণ তার আনন্দের স্বাদ ক্ষুধায় পিপাসায় মরে যায়। ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে আর একটি দিক দেখিয়েছেন। যেখানে দরিদ্র মানুষের ধনতান্ত্রিক সমাজের শোষিত হওয়ার চিত্র রয়েছে। হোসেন মিঞা সেই নয়া উপনিবেশ স্থাপনকারীদের প্রতিমূর্তি।

'চিন্তামণি' উপন্যাস অবক্ষয়ের উপন্যাস, ধ্বংসের উপন্যাস। এখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় রাঢ়বাংলার অবক্ষয়িত রূপ চিত্রিত হয়েছে। সেই সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে গ্রামভাঙা মানুষের কলকারখানার মজুরে পরিণত হওয়ার দৃশ্য। মার্ক্সীয় আদর্শে বিশ্বাসী মানিক অনুধাবন করেছিলেন, শ্রেণিসাম্য রক্ষিত না হলে মানুষ শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি পাবে না। 'শহরতলি' উপন্যাসে শ্রমিক শ্রেণির সঙ্গে পুঁজিবাদী শ্রেণির দ্বন্দ্বের চিত্র পাই। পুঁজিবাদী শ্রেণির কৌশল শ্রমিক শ্রেণিকে পরাস্ত করে। এই পরাজিত হবার সূত্রেই মানিক টেনে খুলে ফেলেন মধ্যবিত্তের ছদ্ম মুখোশকে। 'অহিংসা', 'তর্পণ' প্রভৃতি উপন্যাসেও সমাজের শ্রেণিবিদ্বেষে সামাজিক ভাঙনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'চিহ্ন' উপন্যাসটি কলকাতার গণআন্দোলন নিয়ে রচিত উপন্যাস। যুদ্ধোত্তর মানুষের যন্ত্রণাকে, একাকিত্ব হওয়ার বেদনাকে চিহ্নিত করেছেন ঔপন্যাসিক। 'জীয়ন্ত' উপন্যাস সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাসেও আছে দাঙ্গার কথা। 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসে যৌন জীবনযাপনের রহস্যসমুজ্জল নিষ্ঠুর সত্যকে উত্থাপন করেছেন। তাঁর সাম্যবাদী ভাবনার প্রকাশ প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসে মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এইভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কৌতূহলী চোখ দিয়ে যে সমাজকে দেখেছেন সেই কৌতূহলী চোখ দিয়েই নির্মোহ দৃষ্টিতে সাহিত্যে সমাজের কথা, জীবনের কথা লিখেছেন। তিনি নিজস্ব দৃষ্টি দিয়ে নিজস্ব ভুবন রচনা করেছেন। সে ভুবন গরিবের, সে ভুবন শ্রমিকের, সে ভুবন মধ্যবিত্তের আবার সে ভুবনে শশী-কুসমেরাও বসবাস করে। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'মানিকের গল্প পাঠককে কুলহারা জীবন রহস্যের দিকে ঠেলে দেয় না, সংগ্রামী সংকল্পকে কঠিন মানুষের সঙ্গে মুখোমুখি করিয়ে দেয়'। এই ইতিবাচক বোধ ও উত্তরণের দিশা দেখিয়ে মানিক আজও পাঠকের হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করে আছেন।

১৭.৪ গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ছোটোগল্পের ইতিহাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) একজন বিশেষ শক্তিমান ও ব্যতিক্রমী লেখক হিসাবে স্বীকৃত। ছাত্রজীবনে তিনি 'অতসীমামী' (১৯২৮) নামক গল্পটি রচনা করে সাহিত্য সাধনায় ধ্যানস্থ হন। দুই মহাযুদ্ধের কারণে মানুষের যে অবনমন, মূল্যবোধের সংকট, আদিম প্রবৃত্তির জাগরণ বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময় পর্বে বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে উপস্থিত হয়ে নতুনভাবে নতুন আস্বাদে গল্পভুবনকে নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর মধ্যে বাস্তববাদিতা বা রিয়ালিস্টিকের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। সমালোচক ভবতোষ দত্ত বলেন 'প্রথম পর্যায়ে কল্লোলের উত্তরাধিকার লইয়া তিনি মানব চৈতন্যের গভীর তলদেশে

বিচরণ করিয়া ফিরিয়াছেন। সমাজ ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা নাগরিক জীবনকে কতখানি নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করিয়াছে তাহারই নিপুণ চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন... ।' তাঁর গল্পের মধ্যে ফ্রয়েডীয় প্রভাবজাত জৈব প্রবৃত্তির আতিশয্য লক্ষ করা যায়। সেই সঙ্গে মার্ক্সীয় প্রভাবের ভাবদর্শন স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়। তাঁর গল্পবিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়,

১. মানিক বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তি-বুদ্ধির উপর গল্প কাঠামোকে নির্মাণ করেন।

২. তিনি রোমান্টিক ভাবালুতার বিরোধী। তাঁর গল্পে উঠে আসে মানুষের মনের বিচিত্র কুটিল-জটিল রূপ।

৩. মধ্যবিত্তীয় জীবনের ভণ্ডামি, হীনতা, স্বার্থপরতা ও বিকৃতির বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী সর্বদা উদ্দীপ্ত।

৪. মার্ক্সবাদের দীক্ষা তাঁর গল্পকে স্বতন্ত্র করেছে।

৫. তাঁর গল্প বাহুল্যবর্জিত, সংক্ষিপ্ত, সংহত। তিনি বক্তব্য বিষয়কে অসম্ভব জোরালোভাবে, দীপ্তভাবে স্থাপন করেছেন।

৬. একেবারে নিম্নশ্রেণির জীবন এবং শ্রমিক কৃষকদের সামূহিক জীবনবোধ গল্পসত্তায় প্রতিফলিত হয়েছে।

১৯২৮-১৯৫৬ এই কালপর্বে মানিক ১৬টি গল্পগ্রন্থ লিখেছিলেন। অতসীমামী (১৯৩৫), প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭), মিহি ও মোটাকাহিনি (১৯৩৮), সরীসৃপ (১৯৩৮), বৌ (১৯৪৩), সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩), ভেজাল (১৯৪৪), হলুদ পোড়া (১৯৪৫), আজ কাল পরশুর গল্প (১৯৪৬), পরিস্থিতি (১৯৪৬), ছোট বকুলপুরের যাত্রী (১৯৪৯) ইত্যাদি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, অন্তর্মুখীনতা পরবর্তীতে বহির্মুখী চেতনায় দৃপ্ত ও প্রতিবাদী শিল্পীতে পরিণত হয়েছে। 'প্রাগৈতিহাসিক' থেকে শুরু করে 'হলুদপোড়া' পর্যন্ত এবং 'কে বাঁচায়' থেকে 'আর না কান্না'র মতো গল্পগুলিতে তিনি কিভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক জগৎ থেকে বহির্মুখী সৃষ্টির জগতে যুক্ত হয়েছেন তা তাঁর গল্পপাঠে প্রমাণিত হয়।

'প্রাগৈতিহাসিক','সরীসৃপ','কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পে গল্পকার যৌন চেতনাবোধকে, মানবমনের গহন অন্ধকারকে অর্থনৈতিক চেতনার উপর দাঁড় করিয়েছেন। 'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পে মানবমনের অবচেতনের পীড়নের কারণ অনুসন্ধান লক্ষ করা যায়। 'মহাকালের জটার জট','ভূমিকম্প', 'ফাঁসি', 'টিকটিকি', 'বিপত্নীক' প্রভৃতি গল্পে নির্মম বাস্তবতার সঙ্গে অবচেতনের নগ্ন ছবিকে সহজ-সরল ভাষায় অঙ্কন করেছেন।

'কে বাঁচায় কে বাঁচে', 'যাকে ঘুষ দিতে হয়', 'দুঃশাসনীয়', 'হারানের নাতজামাই', 'শিল্পী', 'কংক্রীট' প্রভৃতি গল্পে মার্ক্সীয় শ্রেণিদ্বন্দ্বের সংঘাত ও নিম্নবিত্ত মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি গল্পের মধ্যে দিয়ে দেখাতে চেয়েছিলেন প্রত্যেকটি মানুষের বাঁচার অধিকার আছে, অধিকার আছে মূল্যবোধ নিয়ে বেঁচে থাকার। তাঁর এই বিশেষ চেতনাবোধ কোনো একটির ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে একটি শ্রেণির সামগ্রিকতায় পরিবর্তিত হয়। 'হারানের নাতজামাই','ছোট বকুলপুরের যাত্রী' প্রভৃতি গল্পের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের সংগ্রামী সত্তাকে জাগিয়ে তুলেছেন। 'শিল্পী' গল্পের মধ্য দিয়ে শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মনোভাব প্রকাশিত। মানিক বিশ্বাস করেন মানুষের মন একমাত্রিক নয়। তাই তাঁর ছোটোগল্পে ব্যক্তির মানস বিশ্লেষণের নানান স্তর প্রস্ফুটিত। তিনি বিশেষ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিমানুষের অসহায়তার কারণ অনুসন্ধান করে তাকে প্রতিবাদী সত্তারূপে গল্পে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

কল্লোলযুগের দাপটে মানিক ভেসে যাননি। কল্লোলের ঘোর বাস্তবতা, যৌনতার প্রতি অত্যধিক আগ্রহ,বিদ্রোহী মানসিকতা, রোমান্টিক ভাববিলাসিতার মধ্যে মানিক আবদ্ধ থাকেননি বরং এগুলিকে পাশ কাটিয়ে নিজস্ব দর্শনে-

সত্যবাদী বিজ্ঞানমনস্ক জীবন দর্শনের মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্র গল্পকার হয়ে উঠেছেন, বাংলা ছোটোগল্পের আধুনিকতার দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন।

১৭.৫ সারাংশ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য বিপুল পরিবর্তনের ব্যঞ্জনা নিয়ে এসেছিল। তাঁর 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'চিন্তামণি', 'চিহ্ন', 'চতুষ্কোণ', 'সর্বজনীন' প্রভৃতি সাহিত্যভাবনার মধ্যে নবতর সৃষ্টিচেতনাকে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ব্যক্তির মূল্যবোধের সংকট, নয়া উপনিবেশবাদের জন্ম, অন্ত্যজ মানুষের সংগ্রামময় জীবন, মনের গহন অভিলাষ, যুগলালিত সাহিত্য তত্ত্ব, রাজনৈতিক দর্শন, ভাষার বিনির্মাণ- মানিক সাহিত্যের মূল কথা। মানিকের সাহিত্যের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক, তাঁর যুক্তিবাদী আধুনিক মনন নারীর কামনা-বাসনাকে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষাকে মান্যতা দেওয়ার স্পর্ধা দেখায়। জীবন- অভিজ্ঞতার পূর্ণতা নিয়ে তিনি সময় থেকে অনেক এগিয়ে সমাজ-চেতনার বিবর্তনের পটচিত্র নির্মাণ করেছেন।

১৭.৬ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) বাংলা উপন্যাসের ধারায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান আলোচনা করুন।

২) বাংলা ছোটোগল্পের ধারায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনবত্ব বিচার করুন।

৩) বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের ধারায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৌলিকতার পরিচয় দিন।

৪) 'পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের বিষয়বস্তু লিখে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৫) মানবমনের নিপুণ কথাকার রূপে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশিষ্টতার পরিচয় দিন।

৬) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে আধুনিকতার মাত্রা নির্ণয় করুন।

৭) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা প্রথম সার্থক উপন্যাসটির নাম কী? এটি কত সালে প্রকাশিত হয়?

২) 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসের প্রকাশসাল লিখুন। এই উপন্যাসের প্রধান নারী ও পুরুষ চরিত্রের নাম লিখুন।

৩) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলেদের জীবন নিয়ে লেখা একটি উপন্যাসের নাম লিখুন।

৪) 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৫) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা প্রথম গল্পটির নাম কী? এটি কোন্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

৬) কে মানিককে 'কল্লোলের কুলবর্ধন' বলেছেন?

১৭.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) দেবেশ রায়, উপন্যাস নিয়ে, দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ,২০০০।

২) ক্ষেত্র গুপ্ত, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (পঞ্চম খণ্ড), গ্রন্থনিলয়: কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৫।

৩) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা, দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৬।

৪) দেবেশ রায়, উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে, দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ, ২০০৫।

৫) নিতাই বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজতত্ত্বজিজ্ঞাসা, দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১১।

৬) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা (বাংলা ছোটগল্পের একশ কুড়ি বছর: ১৮৯১-২০১০), দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৪।

৭) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে বিংশ শতাব্দীর উপন্যাস, দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৪।

৮) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা, দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৬।

৯) সমরেশ মজুমদার, বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর (১৯২৩-১৯৪৭), প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৮৬।

১০) গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি, জি.এ.ই: কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৩৮০।

১১) আশিস কুমার দে, মানিকের ছোটগল্পঃ শিল্পীর নবজন্ম, সাহিত্যপ্রকাশ: কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৩।

একক-১৮ ❑ সতীনাথ ভাদুড়ী

গঠন

১৮.১ উদ্দেশ্য
১৮.২ প্রস্তাবনা
১৮.৩ ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী
১৮.৪ গল্পকার সতীনাথ ভাদুড়ী
১৮.৫ সারাংশ
১৮.৬ অনুশীলনী
১৮.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১৮.১ উদ্দেশ্য

কথাসাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য-ভুবন নির্মিত হয় বিহারের পূর্ণিয়া জেলাকে কেন্দ্র করে। ফলত তাঁর নির্মিত চরিত্রগুলি বেড়ে উঠেছে এক বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশের নির্দিষ্ট চৌহদ্দির মধ্যে। এই এককে শিক্ষার্থীরা সতীনাথ ভাদুড়ীর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে জানতে পারবেন। তাঁর লেখা কীভাবে রাজনৈতিক আলোড়ন, সামাজিক নানা দ্বন্দ্ব, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, প্রবণতার স্বাক্ষর হয়ে উঠেছে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানলাভ করতে পারবেন। শিক্ষার্থীদের বিহারের গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা, তাদের বিশ্বাস- সংস্কার- আচার-আচরণ সম্পর্কে জানার কৌতূহল বৃদ্ধি পাবে।

১৮.২ প্রস্তাবনা

সতীনাথ ভাদুড়ী জীবনকে গভীর অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন। তিনি একজন গভীর মনের সংবেদনশীল কথাকার। ‘জাগরী’ থেকে ‘দিগভ্রান্ত’ উপন্যাসে এবং বিভিন্ন গল্পে রাজনৈতিক আন্দোলনে উত্তপ্ত পূর্ণিয়ার পরিবেশের বাস্তবতা নিখুঁত ভাবে চিত্রিত হয়েছে। তিনি ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান-উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর কথা বিশ্বে লৌকিক জীবনের রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে। এছাড়াও প্রবাসী বাঙালি মধ্যবিত্তের ঘরের ছবি চিত্রিত হয়েছে কথাবিশ্বের পাতা জুড়ে। বিষয়ে ও আঙ্গিকের যৌথ মিলনে তাঁর প্রতিভা নব নব উন্মেষশীলতার সার্থক পরিচয়বহ। তাঁর কথাবিশ্বের ভাষা ব্যক্তি-মানুষের মনোলোকের ভাষা। এক সর্বব্যাপ্ত অনুভূতিশীলতা তাঁর সাহিত্যকে স্বতন্ত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

১৮.৩ ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী

বাংলা কথাসাহিত্যে বহুতর অভিনবত্বের দিক নির্দেশকের মধ্যে সতীনাথ ভাদুড়ীর (১৯০৬-১৯৬৫) নাম

উল্লেখযোগ্য। তিনি বিহারের পূর্ণিয়ার প্রকৃতির কোলে লালিত পালিত হয়েছেন। ফলত পূর্ণিয়ার শহর ও গ্রাম, শহুরে ও গ্রামীণ মানুষ তাঁর সাহিত্যে অমরত্ব পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তারাশঙ্কর যেমন রাঢ়বাংলার কথাকার সতীনাথ ভাদুড়িও তেমনি বিহারের চিত্রকর। সতীনাথের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'গণনায়ক' প্রকাশিত হয় ১৩৫৫তে। গল্পটি প্রকাশিত হবার পর সমালোচকরা সতীনাথকে বিশেষ প্রশংসা করেন এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর স্বতন্ত্র অবস্থানকে চিহ্নিত করে দেন। সতীনাথ ভাদুড়ীর সমাজ চেতনা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। রাজনৈতিক কর্মী হওয়ার সুবাদে তিনি পূর্ণিয়ার মানুষকে খুব কাছ থেকে দেখতে পেরেছিলেন। তিনি অনুভব করতেন পূর্ণিয়ার প্রতিটি ভালো-মন্দ যেন তাঁর নিজের। এই নিজের মতো করে ভাবার অনুক্ষণ থেকেই তাঁর লেখায় গুরুত্ব পেয়েছে লোকায়ত জীবন, লোকায়ত সংস্কৃতির মানুষ।

সতীনাথ ভাদুড়ী যে সমস্ত উপন্যাস লিখেছেন সেগুলি হল- 'জাগরী' (১৯৪৫), 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' (১৯৪৯), 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' (১৯৪৯-৫১), 'অচিনরাগিনী' (১৯৫৪), 'সংকট' (১৯৫৭), 'দিগভ্রান্ত' (১৯৬৬) ইত্যাদি।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' উপন্যাসে ভিড় করে আছে পূর্ণিয়ার লোকজন। এই উপন্যাসে সতীনাথ তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বিলু-নীলুর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। উপন্যাসে যে ঘটনাগুলি আছে- বিক্ষুব্ধ জনতার কার্যকলাপ, রেললাইন খুলে ফেলা, টেলিগ্রাফের তার কাটা, পোস্ট অফিসে আগুন জ্বালানো, থানায় থানায় 'মহাত্মাজি কা ইজলাস' বসানো, পুলিশের শাস্তি বিধান, কংগ্রেসি পতাকা ওড়ানো প্রভৃতির নিখুঁত ছবি আছে 'জাগরী'তে। এই উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণি মানুষের চরিত্র। তারা কিভাবে রাজনীতির শিকার হয় তারই যন্ত্রণাদগ্ধ বিবরণ লক্ষ করা যায়। প্রত্যেকটি চরিত্র অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে নিখুঁত পুঙ্খানুপুঙ্খতার মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। সতীনাথ ভাদুড়ীর আরেকটি উপন্যাস 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' মাতৃভূমির মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে আংশিক প্রকাশের পর বসুমতীতে পাঁচটি সংখ্যায় পুরোটা প্রকাশিত হয় 'মীনাকুমারী' নামে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় লেখক শিরোনাম বদলে রাখেন 'চিত্রগুপ্তের ফাইল'। এই উপন্যাসে পরিবেশের বাস্তবতা যেখানে অনস্বীকার্য সেখানেও তিনি রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে উপন্যাসের রসদ সংগ্রহ করেছিলেন। ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার কথা প্রকাশিত হয়েছে এই উপন্যাসে। শ্রমিক ও মালিকের বিরোধ, মালিকদের ভিন্ন চক্রান্ত, শ্রমিকদের জীবন যন্ত্রণা ইত্যাদি ঘটনা উপন্যাসকে বৈচিত্র্য দান করেছেন। 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' সতীনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের জিরানিয়া হল পূর্ণিয়া-সতীনাথের নিজের জেলা। এই উপন্যাসে জাতিভেদ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, শ্রেণিস্বার্থ, রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি প্রসঙ্গ যুক্ত হয়েছে। এছাড়াও পূর্ণিয়ার লৌকিক জীবনের চলচ্ছবিও অঙ্কিত হয়েছে। 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' লেখার সময় সতীনাথের আদর্শ ছিল তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস'। ফলতঃ এই উপন্যাসে এক মহাকাব্যিক বিস্তার লক্ষ করা যায়। এই উপন্যাসে সময়ের সারণীতে উঠে এসেছে ইতিহাসের নানা বিবরণ, উঠে এসেছে তাৎমাটুলি লোকেদের ও ঢাঙ্গড়টুলির ঢাঙরদের জীবন। এই তাৎমাদের একজন হলেন ঢোঁড়াই। যাকে সতীনাথ রামচন্দ্রের আদলে নির্মাণ করে অন্ত্যজ মানুষের প্রকৃত চেহারাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। সময়ের হাত ধরে ঢোঁড়াইয়েরউপলব্ধির বদল ঘটে। একারণে ঢোঁড়াই প্রশ্ন করে গান্ধিকে নিয়ে, রাম- রামায়ণকে নিয়ে এবং তার প্রেমকে নিয়েও। উপন্যাসের শেষে আমরা লক্ষ করি ঢোঁড়াই উপলব্ধি করে দরিদ্র মানুষের জীবনে ধর্ম, কর্ম, জাত-পাত রাজনীতি বলে কিছুই থাকতে নেই।

'অচিন রাগিনী'তে পিলে -তুলসী- দিদিমার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বিহারবাসী বাঙালি পরিবারের কথা উঠে আসে। 'সংকট' উপন্যাসে বিশ্বাসজির কথা উঠে আসার সূত্রে আত্ম- অন্বেষণের প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়। সতীনাথ

সারাজীবন ধরে যে জীবন অন্বেষণ করেছেন সেই জীবন অন্বেষণের ছায়া পড়েছে বিশ্বাসজির চরিত্রের উপর। এই উপন্যাসে অন্যতম বৈশিষ্ট্য স্বগত কথন। এই উপন্যাস আত্মানুসন্ধানের আখ্যান। 'দিগভ্রান্ত' উপন্যাসে সুবোধ-অতসীর কথা আমরা পাই। এই উপন্যাস নিঃসঙ্গতার কাহিনি। সুবোধ ও অতসীর পরস্পর বিরোধী ভাবনায় উঠে আসে একদিকে বস্তুবাদী জীবনদর্শন যার প্রধান অঙ্গ মান-সম্মান-যশ-খ্যাতি, অপরদিকে উঠে আসে আত্মোন্নতি ও আত্মোপলব্ধিজাত দর্শন, যেখানে জীবনকে পাঠ করার শিক্ষা পায় মানুষ।

সময়ের বিশেষ পটভূমিতে মানুষে মানুষে সম্পর্ক যেমন উঠে আসে তেমনই চরিত্রগুলির নিরন্তর অন্বেষণ ধরা পড়ে। সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রত্যেকটি উপন্যাসের বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র, আঙ্গিক অনন্য ও অভিনব। আখ্যান ও আঙ্গিকের সার্থক মিলনে যে সৃজনক্রিয়া পূর্ণতা পায় তার সার্থক উদাহরণ সতীনাথের উপন্যাসগুলি। 'জাগরী' থেকে শুরু করে 'দিগভ্রান্ত' পর্যন্ত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন মানুষের একান্ত ব্যক্তির উপলব্ধির নিগূঢ় প্রকাশ লক্ষ করা যায়। এই প্রকাশ কখনও মহাকাব্যিক পরিসরে, কখনও আত্মকথনে পরিব্যপ্ত হয়েছে। সতীনাথ ভাষাসৃজনে রূপদক্ষ শিল্পী। প্রত্যেকটি উপন্যাসে চরিত্র অনুযায়ী ভাষা হয়ে উঠেছে যথোপযুক্ত। চেতনালোক থেকে অবচেতনের পথে যাত্রার ইঙ্গিত বহন করে তাঁর উপন্যাসের ভাষা হয়ে উঠেছে কখনও জটিল কখনও স্বচ্ছন্দ কখনও জীবনের সত্য অন্বেষণের প্রকাশক।

বিষয়ের বিন্যাসে, প্রকরণে, ভাষায় সতীনাথের মতো সচেতন পরিশীলিত কথাশিল্পী বাংলা কথাসাহিত্যে দুর্লভ।

১৮.৪ গল্পকার সতীনাথ ভাদুড়ী

ঔপন্যাসিকরূপে সতীনাথ ভাদুড়ি যতটা জনপ্রিয় বাংলা ছোটোগল্পের জগতে সমান জনপ্রিয় না হয়েও তিনি যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন কথাশিল্পী সেকথা স্বীকার করে নেওয়া যায়। উপন্যাসের মতো তিনি বাংলা ছোটোগল্পের জগতকেও বহুদূর প্রসারিত করেছেন। উপন্যাসের মতো সতীনাথের ছোটোগল্পেও বিহারের পটভূমিকা বারবার উঠে এসেছে। সতীনাথ প্রথম জীবনে উকিল ও পরে রাজনৈতিক নেতা হন। নানা প্রকৃতির লোকের সংস্পর্শ তাঁকে বাস্তববোধ সম্পন্ন করে তোলে। তিনি নিপুণ পর্যবেক্ষক, তাই তার চোখে দেখা লোকগুলি গল্পের চরিত্র হয়ে ওঠে। দুঃখ-বেদনা, শোক-ব্যর্থতা, দ্বেষ-হিংসা- নানান অনুভবের পাশাপাশি রাজনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতির মতো বিষয় তাঁর ছোটোগল্পের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়। তাঁর গল্পে আমরা লক্ষ করি তিনি স্বাধীনতার পর দেশ শাসনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে স্থান দিয়েছেন। আমলাতন্ত্রের দুর্নীতি, তাদের কাজ করার নগ্ন নিষ্ঠুর বিচিত্র পদ্ধতি, সরকারি অব্যবস্থা, সাধারণ মানুষের ভোগান্তিকে তিনি গল্পের অবয়বে নির্মাণ করেছিলেন। ফলত তাঁর প্রত্যেকটি গল্প হয়ে ওঠে নির্মম ও সংযত ভাবের প্রকাশক। তাঁর গল্পগুলি পাঠকের বিস্ময়ের বোধের থেকেও এক শৈল্পিক নিরাসক্তিতে জীবন্ত। সতীনাথের গল্পের আয়নায় আমরা সমাজকে দেখি। দেখি সমাজের দুর্নীতিতে অংশগ্রহণকারী মানুষের রাজনীতিকে, আমরা দেখি নিম্নবিত্তের মানুষ কতটা যন্ত্রণাদগ্ধ, বিপর্যস্ত হচ্ছে। আশা-নিরাশার, সুখ-দুঃখে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির দোলাচলতায় সতীনাথের গল্প মানুষের মনের ভিতরের- বাহিরের রূপকে বের করে আনে।

তাঁর 'ভূত' নামক গল্পটিতে অন্ধবিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে। এই গল্প গ্রাম্য কুসংস্কার ও লৌকিক জীবনাচারকে ধারণ করে আছে। 'ঈর্ষা' গল্পটি উত্তম পুরুষে লেখা। গল্পটি মানুষের অসূয়াবোধকে প্রকাশ করে। 'বহিরাগত' গল্পটিতে তিনি পুরুষজাতিকে নির্মাণ করেন ইন্দ্রিয়াসক্তরূপে। 'ডাকাতের মা' গল্পটিতে ডাকাত সৌখির ও তার মায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের মানবিক দিক প্রকাশিত হয়েছে। 'মুষ্টিযোগ' গল্পে চিকিৎসা শাস্ত্রের ও চিকিৎসকের

বিচ্যুতি প্রকাশিত। এই অসংগতিকে নিয়ে কৌতুক রঙ্গের আধারে নির্মাণ করেছেন।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের প্রেক্ষাপটে রচিত ‘গণনায়ক’ গল্পে সামাজিক পটভূমি, রাজনৈতিক পটভূমিকে প্রেক্ষাপট করে সমাজের নানা স্তরের অবস্থানকে রূপায়িত করা হয়েছে। দেশ বিভাগের জন্য মানুষের ছিন্নমূল একাকী জীবন কতটা ভয়ানক হতে পারে সে কথা প্রকাশ করেছেন গল্পকার সতীনাথ। এই গল্পে প্রকৃত গণনায়ক ও ছদ্মবেশী গণনায়কের পার্থক্য লেখক চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতার অপব্যবহার মানুষের মূল্যবোধের অপমৃত্যু কিংবা সুযোগ সন্ধানী মানুষের ধূর্তামিকে সতীনাথ প্রত্যক্ষ করেছেন। আর সেই রূপকে নগ্ন ভাষায় তীক্ষ্ণ ফলার মতো ধারালো কঠিন শব্দে ছুঁড়ে দিয়েছেন পাঠকের কাছে। ‘পরিচিতা’ গল্পটিও দেশভাগের কথা বলে, যে গল্পের মানুষদের চাল নেই, চুলো নেই, বাড়ি-ঘর ঠিকানাও নেই সেইসব উদ্বাস্তু আর্থ-সামাজিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত মানুষের কথা সার্থকভাবে বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষদের প্রতি আমাদের মধ্যবিত্ত মনোভাবকে লেখক নির্মোহভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। ‘চরণদাস এম.এল.এ’ গল্পটিও স্বার্থসর্বস্ব নেতাদের অসাধু চক্রান্তের কথা তুলে ধরে। ‘চকাচকি’ গল্পটিতে সতীনাথের সহজাত তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও মানবমনের অতলান্ত রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ প্রকাশিত হয়েছে। আসলে প্রত্যেকটি গল্পের পিছনে বস্তুবাদী সতীনাথের নেপথ্য উপস্থিতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাহিত্য যে কেবল কল্পনার উচ্ছ্বাসমাত্র নয় তা যে জীবনের প্রসঙ্গ অনুষঙ্গের যথাযোগ্য প্রকাশভূমি তা সতীনাথের গল্পে প্রমাণিত হয়। সতীনাথের গল্পগ্রন্থের সংখ্যা সাতটি, ১. গণনায়ক (১৯৪৮), ২. অপরিচিতা (১৯৫৪), ৩. চকাচকি (১৯৫৬), ৪. পত্রলেখার বাবা (১৯৫৯), ৫. জলভ্রমি (১৯৬২), ৬. আলোকদৃষ্টি (১৯৬৪)। তাঁর গল্পসত্তার বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে চিহ্নিত করতে পারি- ১. তিনি বিহারের প্রত্যন্ত গ্রামের অন্ত্যজ মানুষের কথাকার। ২. গল্পে তিনি উইট হিউমার স্যাটায়ার ব্যবহার করলেও তাঁর গল্প নীতিমূলক বা উপদেশাত্মক হয়ে ওঠে না। তাঁর গল্প রোমান্স বিবর্জিত বাস্তবতার আখ্যান। ৩. মধ্যবিত্তের সংকট অপেক্ষা তাঁর গল্পে সবথেকে বেশি উঠে এসেছে নিম্নবর্গের জীবন, শ্রমিক জীবন- কখনও তা এসেছে মূল ক্ষেত্র হিসাবে আবার কখনও মানুষের নানান সম্পর্কের সূত্র ধরে।

সৃষ্টির সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক পথে সতীনাথের যাত্রা নানা ধারায় অগ্রসরমান। লেখক হিসাবে দায়িত্ববোধ পালন করতে গিয়ে তিনি গল্পভুবনের ক্ষেত্রকে নিজের মতো করে বদলে দিয়েছেন, সময়ের চালচিত্রে অন্ত্যজ মানুষের মৌলিক অবস্থানকে পাঠকের সামনে এনে দিয়েছেন। আর এইভাবেই ধ্রুব বাস্তবতার ধারাবাহিক প্রেক্ষিতকে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতরভাবে উপস্থাপনায় প্রকাশ করেছেন মানুষের জীবন অন্বেষণের নতুনতর রূপকে।

১৮.৫ সারাংশ

বাংলা কথাসাহিত্যে সতীনাথ ভাদুড়ীর মতো সচেতন শিল্পী দুর্লভ। তাঁর সার্থকতা এখানেই যে, তিনি সমাজ ও জীবনের মর্মসত্যকে আত্মীকরণ করে তাকে সাহিত্যবিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। চরিত্রগুলিও নানা বিন্যাসে উঠে এসে তাঁর বাস্তবচেতনার ভিত্তিমূলকে দৃঢ় করে তুলেছিল। তাঁর অভিপ্রেত ছিল, আঙ্গিকে মহাকাব্যের বিশালতা এনে জনজীবনের দ্বান্দ্বিকতাকে নির্মাণ ও সেই সঙ্গে দিনবদলের রূপচিত্র অঙ্কন। দেশ-কাল-মানুষকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা তাঁর সাহিত্যবিশ্ব প্রকৃতই জীবন-অন্বেষণের কথকতা।

১৮.৬ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) বাংলা উপন্যাসের ধারায় সতীনাথ ভাদুড়ীর অবদান আলোচনা করুন।

২) বাংলা ছোটগল্পের ধারায় সতীনাথ ভাদুড়ীর অভিনবত্ব বিচার করুন।

৩) বাংলা মহাকাব্যিক উপন্যাসের ধারায় সতীনাথ ভাদুড়ীর মৌলিকতার পরিচয় দিন।

৪) 'জাগরী'উপন্যাসের বিষয়বস্তু লিখে সতীনাথ ভাদুড়ীর কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৫) আঙ্গিক গঠনে সতীনাথ ভাদুড়ীর বিশিষ্টতার পরিচয় দিন।

৬) সতীনাথ ভাদুড়ীর গল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রথম সার্থক উপন্যাসটির নাম কী? এটি কত সালে প্রকাশিত হয়?

২) 'জাগরী' উপন্যাসের প্রকাশসাল লিখুন। এটি কী জাতীয় উপন্যাস?

৩) সতীনাথ ভাদুড়ীর লোকায়ত জীবন নিয়ে লেখা একটি উপন্যাসের নাম লিখুন।

৪) 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৫) সতীনাথ ভাদুড়ীর লেখা কয়েকটি গল্পের নাম লিখুন।

৬) কোন অঞ্চলকে কেন্দ্র করে সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্যজীবন গড়ে উঠেছে?

৭) সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটোগল্পে আধুনিকতার মাত্রা নির্ণয় করুন।

১৮.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) দেবেশ রায়, উপন্যাস নিয়ে, দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০০।

২) ক্ষেত্র গুপ্ত, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (পঞ্চম খণ্ড), গ্রন্থনিলয় : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৫।

৩) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা, দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৬।

৪) দেবেশ রায়, উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে, দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ, ২০০৫।

৫) গোপাল হালদার, সতীনাথ ভাদুড়ী সাহিত্য ও সাধনা, অয়ন, ১৯৭৮।

৬) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা (বাংলা ছোটগল্পের একশ কুড়ি বছর: ১৮৯১-২০১০), দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৪।

৭) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে বিংশ শতাব্দীর উপন্যাস, দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৪।

৮) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা, দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৬।

৯) সমরেশ মজুমদার, বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর(১৯২৩-১৯৪৭), প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৮৬।

১০) সতীনাথ ভাদুড়ীঃ স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান, জলার্ক, ১৩৯৪।

একক-১৯ ❑ জগদীশ গুপ্ত, পরশুরাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবোধ ঘোষ

গঠন

১৯.১ উদ্দেশ্য

১৯.২ প্রস্তাবনা

১৯.৩ গল্পকার জগদীশ গুপ্ত

১৯.৪ গল্পকার পরশুরাম

১৯.৫ গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র

১৯.৬ গল্পকার সুবোধ ঘোষ

১৯.৭ সারাংশ

১৯.৮ অনুশীলনী

১৯.৯ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১৯.১ উদ্দেশ্য

বাংলা কথাসাহিত্যজগতে কথাকারের তালিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তিন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও যাঁদের নাম স্বতঃস্ফূর্তভাবে উঠে আসে তাঁরা হলেন জগদীশ গুপ্ত, পরশুরাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবোধ ঘোষ। এঁদেরই প্রত্যেকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার পথ ধরে বাংলা ছোটোগল্প সময়ের জটিল প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে পাঠকবর্গের প্রত্যাশা জাগিয়ে রাখে। এই একক পাঠে শিক্ষার্থীরা তাঁদের গল্পবিশ্বের বিষয়- বৈচিত্র্য ও গভীরতার সন্ধান করতে পারবেন। এই অসামান্য স্রষ্টাদের সৃষ্টিসম্ভারকে শিক্ষার্থীরা যতবার পড়বেন, তাঁদের শিল্পকৃতি সম্পর্কে যতটা জানবেন ততবারই নতুন নতুন অর্থ খুঁজে পাবেন, ভিন্ন ভিন্ন বিশ্লেষণের দ্বার উন্মুক্ত হবে।

১৯.২ প্রস্তাবনা

বাচনভিত্তিক শিল্পমাধ্যমগুলির মধ্যে ছোটোগল্পের গতির দ্যোতনা সবথেকে বেশি অস্থির ও গতিময়। ছোটোগল্প কেবল নান্দনিক প্রক্রিয়া নয়, তা অবশ্য সময়লালিত জীবনের দর্পণ। এই দর্পণে জগদীশ গুপ্ত, পরশুরাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ কথাশিল্পী দহনময় সময়ের বাস্তব প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন। কোথাও আত্মঘাতী একাকীত্ব, উদাসীনতা, সামাজিক অবক্ষয়, জীবনজিজ্ঞাসার জটিল গ্রন্থনা, যৌনতার সংশ্লেষণ আবার কোথাও আবেগের আতিশয্য, রোমান্টিকতার অতিরেক তাঁদের ছোটোগল্পের আধেয় হয়ে উঠেছে। এঁরা যেমন গল্পের ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা করেছেন, তেমনি গল্পতত্ত্বের নির্মাণ-বিনির্মাণ করেছেন। এঁরা প্রত্যেকেই জীববিশ্বের পর্যবেক্ষক, দার্শনিক। কত পৃথকভাবে এঁরা জীবন ও জগতকে দেখেছেন, কত বিভিন্নতায় তাকে প্রায়োগিক রূপ দিয়ে শিল্পের অবয়ব নির্মাণ করেছেন, কত পরিচিত বিষয়কে বাস্তব ও কল্পনার মিশেলে অপরিচিত করে তোলেন- সেইসব রসদ শিক্ষার্থীরা তাঁদের গল্পবিশ্বে খুঁজে পাবেন। উক্ত এককে গল্পকারদের নানা বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

১৯.৩ গল্পকার জগদীশ গুপ্ত

বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রীয় বিষয়-রূপ-রীতি ও বিশ্বাসকে অস্বীকার করে বাংলা কথাসাহিত্যের নান্দনিক প্রকরণে যে পালাবদল শুরু হয়েছিল জগদীশ গুপ্ত(১৮৮৬-১৯৫৭) ছিলেন তার প্রধান ঋত্বিক। শিশির কুমার দাশ তাঁর 'বাংলা ছোটোগল্প' গ্রন্থে লেখেন, ''বাংলা সাহিত্যে ইনি অবচেতন মনের গতির প্রথম শক্তিমান শিল্পী ও সেই হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্রসূরী। তাঁর লেখার প্রধান গুণ নির্মম নিরাসক্তি। কাহিনির নায়কেরা সাধারণ। ... সমস্ত কাহিনির মধ্যে একটি প্রধান সুর, তা হল এক দুর্বার, অনিবার্য নিয়তিবাদ। মানুষ যেন অন্ধশক্তির খেলার পুতুল।'' অর্থাৎ কীটদষ্ট সময়ের কালগর্ভে নিমজ্জিত মানুষের মনের গহন প্রদেশে প্রবেশ করে জগদীশ গুপ্ত তুলে আনেন চরিত্রের 'আঁতের কথা'। সেইসঙ্গে জীবনের অন্ধকার চোরাগলি পথে সমাজ-বাস্তবতার যে ভূমি নগ্ন তাকেও নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত ভাবে প্রকাশ করেন বিচিত্র ব্যঞ্জনার আভাসে। তাঁর কথাবিশ্ব মানুষের জীবনের অনালোকিত অধ্যায়ে আলো নিক্ষেপ করে শিল্পসমন্বিত আখ্যানকে পৃথক ভাবে চিনিয়ে দেয়। দুই বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে নারী-পুরুষের জীবন নিতান্ত জৈবিক তাড়নায় যে অসুস্থ চেতনাকে লালন করে তাকে যৌক্তিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন গল্পকার জগদীশ গুপ্ত। সত্য-শিব-সুন্দরের পথে না গিয়ে অপচিত জীবনের সংকটময় মুহূর্তকে তিনি দেখেছেন গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ও তীব্র পর্যবেক্ষণ শক্তির মাধ্যমে। তিনি গল্পের প্রচলিত ছক ভেঙে বক্তব্যকে নিজের মতো সাজিয়ে নিয়েছেন, প্লটকে গুরুত্ব দেন নি। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ণয়, চরিত্রের সরল পাটিগণিতের রূপান্তর, সময়ের ভিতরকার অস্থিরতা তাঁর গল্পের নিজস্ব ধরনে ব্যক্ত হয়েছে।

জগদীশ গুপ্তের অনেক রচনা প্রকাশিত হয় কল্লোল, কালিকলম, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায়। তাঁর লেখা ছোটোগল্পের সংখ্যা প্রায় একশো পঁচিশ। তাঁর প্রকাশিত গল্পসঙ্কলনগ্রন্থগুলি হল, 'বিনোদিনী'(১৯২৭), 'রূপের বাহিরে' (১৯২৯), 'শ্রীমতী' (১৯৩১), 'উদয়লেখা' (১৯৩৩), 'তৃষিতা সৃক্কণী' (১৯৩৩), 'উপায়ন' (১৯৩৫), 'পাইক শ্রীমিহির প্রামাণিক', 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী' (১৯৩৬), 'মেঘাবৃত' (১৯৪৮)। দিবসের শেষে, চন্দ্রসূর্য যতদিন, আদি কথার একটি, শঙ্কিত অভয়া, রসাভাস, অরূপের রাস, পয়োমুখম, হাড়, লোকনাথের তামসিকতা প্রভৃতি গল্পের বয়ানে এমন কিছু সংকেত তিনি দিয়েছেন যেখান থেকে পাঠকবর্গ সময়-সমাজ-পরিসর ও মানুষের গভীর চোরাস্রোতকে সহজেই শনাক্ত করতে পারেন। জগদীশ গুপ্ত উপলব্ধি করেছিলেন, প্রত্যেকেই ব্যবহারিক জীবনে আত্মপ্রতারক মুখোশে আবৃত। তিনি এই মেকি মুখোশকে ছিঁড়ে ফেলার পক্ষপাতী ছিলেন। সমাজ-বাস্তবতা যতই বদলে যাক, সম্পর্কের বৃত্তে যতই ভাঙনের আভাস তৈরি হোক অন্ধশক্তির চিরাচরিত তাড়নাই তাঁর গল্পবিশ্বের প্রধান উপজীব্য। আদিম রিপুর কিংবা বিকৃত ক্ষুধার দাপট কীভাবে মননের গহীনে , সম্পর্কের বিন্যাসে প্রগাঢ় ছায়া ফেলেছিল তা তাঁর গল্পপাঠে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'বিনোদিনী' প্রকাশিত হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি চিঠিতে জগদীশ গুপ্তকে লিখেছিলেন, 'ছোটোগল্পের বিশেষ রূপ ও রস তোমার লেখায় পরিস্ফুট দেখিয়া সুখী হইলাম।' গল্পের প্রচলিত প্লট ভেঙে তাঁর গল্প-বয়ানের সূক্ষ্ম স্বরন্যাসে উচ্চারিত হয় সমকালের মানুষের অন্দরের বিভিন্ন কূটাভাস। আবার আখ্যানের সূক্ষ্ম ছদ্মবেশে গল্পকার নিজস্ব ঢঙে নিভৃত প্রতিবাদের যাত্রাপথকেও নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। সংকেত- গূঢ় বাচনে জীবনের বিকৃতি ও অসঙ্গতিকে প্রতিস্পর্ধা জানিয়েছিলেন গল্পকার। আর এইভাবেই সময়ের-সম্পর্কের মিথ্যা ও বিভ্রমের সর্বাত্মক আয়োজনকে একপ্রকার নস্যাৎ করে শরৎচন্দ্রের 'মানসপুত্র' জগদীশ গুপ্ত অন্যতর শিল্পবাস্তবের ভিন্ন জগত নির্মাণ করেছিলেন।

১৯.৪ গল্পকার পরশুরাম

বাংলা সাহিত্যের রঙ্গ- ব্যঙ্গ ধারায় পরশুরামের(১৮৮০-১৯৬০) আবির্ভাব। তিনি হাসির গল্পের স্রষ্টা। পরশুরামের অন্তরালে আছে মনীষী রাজশেখর বসু। জগৎ ও জীবনের অসঙ্গতি সম্পর্কে অতি সচেতন এই মানুষটি তাঁর বক্তব্য প্রকাশে উপায় হিসাবে রঙ্গ-ব্যঙ্গ গল্পের জনপ্রিয় মাধ্যমকে বেছে নিয়েছিলেন। প্রমথ চৌধুরী, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গ-ব্যঙ্গ গল্পে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তারই মধ্যে অতি অল্প সময়ে পরশুরাম নিজের স্থান তৈরি করে নিলেন নিজস্ব পদ্ধতিতে। তিনি ত্রৈলোক্যনাথের যথার্থ উত্তরসূরি। প্রাচীন সাহিত্য, বিজ্ঞান, আইন ও মনোবিজ্ঞানে অপরিসীম জ্ঞান, মানব চরিত্র সম্পর্কে বিশ্লেষণের অভিজ্ঞতা তাঁকে রঙ্গ-ব্যঙ্গের ধারায় জনপ্রিয়তা এনে দেয়। তাঁর বিভিন্ন গল্প বিশ্লেষণ করলে আমরা তাঁর গল্পবিষয়ের স্বরূপটিকে নিম্নলিখিতভাবে চিহ্নিত করতে পারি,

১. পরশুরামের গল্প স্বভাবের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল হাস্যরস পরিবেশন। গল্পের ক্ষেত্রে তিনি মুখ্যত ব্যঙ্গশিল্পী যদিও তাঁর এই ব্যঙ্গ মানুষকে আঘাত করে না বরং হাস্যরসের অবগাহনে পাঠক তৃপ্ত হন।

২. পরশুরামের গল্পে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। সামাজিক বা চারিত্রিক অসঙ্গতির গভীরতম কারণটিকে ব্যঙ্গ করাই তাঁর অন্যতম লক্ষ্য ছিল।

৩. পরশুরামের গল্পাঙ্গন মানবজীবনলীলায় মুখর। সমাজের বহু মানুষের চরিত্র উদ্ঘাটনে তাঁর লেখনী তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। বহিরঙ্গ হাসির আবরণের মধ্যে যে জীবনবোধ লুকিয়ে আছে তাকেই তিনি গল্প-প্রতিবেদনে খুঁজে এনেছেন।

৪. পরশুরাম বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাজজীবনের সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন।

৫. রঙ্গব্যঙ্গের বিষয়কে পরিস্ফুট করার জন্য বাহুল্যবর্জিত ভাষাকে ব্যবহার করেছেন। বিষয় উপস্থাপন, চরিত্র চিত্রণ, পরিবেশ- পরিস্থিতির বিন্যাস ও নানা ভাবের প্রকাশে তাঁর সুপ্রযুক্ত শব্দচয়ন বাংলা ভাষাভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে।

গল্পের বিষয়ের নানা বৈচিত্র্য অনুযায়ী আমরা তাঁর গল্পকে নিম্নলিখিত ধারায় বিভক্ত করতে পারি।

(ক) পৌরাণিক গল্প - 'জাবালি', 'তৃতীয় দ্যূতসভা', 'রামরাজ্য', 'হরণের ঝুমঝুমি', 'গন্ধমাদন', 'যযাতির কথা', 'ভীমগীতা' ইত্যাদি। ধর্মের নামে ভণ্ডামির দৃষ্টান্ত তাঁর 'সত্যবতী ভৈরবী', 'বিরিঞ্চিবাবা', 'যশোমতী', 'পরশপাথর' ইত্যাদি গল্পগুলি।

(খ) প্রেমের গল্প — 'আনন্দীবাঈ', 'চিঠিবাজি', 'নীলতারা' ইত্যাদি।

(গ) হৃদয়বেদনার গল্প — 'ভূষণপাল', 'দাঁড়কাক', 'কৃষ্ণকলি' ইত্যাদি।

(ঘ) তত্ত্বপ্রধান গল্প — 'ভীমগীতা', 'কাশীনাথের জন্মান্তর', 'সত্যসন্ধ বিনায়ক' ইত্যাদি।

(ঙ) বিশুদ্ধ কৌতুকহাসির গল্প - 'জটাধর বকশীর তিনটি গল্প', 'গুপী সাহেব', 'উপেক্ষিতা' ইত্যাদি।

পরশুরাম বেশি বয়সে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সাহিত্যিক প্রায় আটত্রিশ বছর বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তার গল্পের সংখ্যা নিরানব্বই এবং একটি অসমাপ্ত গল্প আছে। তাঁর গল্প গ্রন্থের সংখ্যা মোট নটি। যথা- ১.গড্ডলিকা (১৩৩১ বঙ্গাব্দ) ২. কজ্জলী (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) ৩. হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প

(প্রথম সংস্করণ ১৩৪৪, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫০) ৪. গল্পকল্প (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ) ৫. ধুস্তরী মায়া ইত্যাদি গল্প (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) ৬. কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প (১৩৬০ বঙ্গাব্দ) ৭. নীলতারা ইত্যাদি গল্প (১৩৬৩ জ্যৈষ্ঠ) ৮. আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প (১৩৬৪ পৌষ) ৯. চমতুমারী ইত্যাদি গল্প (১৩৬৬ বঙ্গাব্দ)।

পরশুরাম লক্ষ করেছিলেন ভারতজুড়ে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন। ব্রিটিশের অত্যাচার, কংগ্রেসের আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দেশজুড়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব তাঁর চোখের সামনে ঘটেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পটভূমিতেই তাঁর গল্প লেখা শুরু হয়। তাঁর গল্প সম্পর্কে অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন 'পরশুরামের ব্যাপক জনপ্রিয়তার আর একটি কারণ হইল তাঁহার অদলীয় অপক্ষপাতী দৃষ্টিভঙ্গী।...... কোথাও শ্লেষের দুএকটি কাঁটা এবং কোথাও বা ব্যঙ্গের ঈষৎ জ্বালাই রহিয়াছে মাত্র, কিন্তু সেগুলির লক্ষ্য বহুবিচিত্র ও পরস্পর বিরোধী সমাজ চরিত্র।' আসলে পরোক্ষভাবে হাসির লক্ষ্য ছিল সমাজমানসের ও সমাজের অসঙ্গতি। তিনি ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে আজীবন লড়াই করেছেন।

১৯২২ সালে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পে তিনি অসাধু ব্যবসায়ীদের তিরস্কার করেছেন। শ্যামানন্দ ও তার দলের মানুষগুলির অসাধু ব্যবসাচক্রকে তিনি আঘাত করতে চেয়েছেন। এই গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য উপযুক্ত ভাষা প্রয়োগ, পরিবেশ ও চরিত্র অনুযায়ী সংলাপ সংযোজন ও শিল্পকৌশলের অসামান্য সাফল্য।

তাঁর 'লম্বকর্ণ' গল্পটি মনে রাখার মতো। রায়বংশলোচন ব্যানার্জী বাহাদুর, তার পত্নী মানিনী দেবী, কন্যা টেপী ইত্যাদি চরিত্র গল্পে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। 'ভূশণ্ডীর মাঠে' গল্পে ভূতের রাজ্যে ভূতেরাও যে প্রেমে হাবুডুবু খায় তার নিখুঁত হাস্যরসাত্মক বিবরণ আমাদের মনকে ছুঁয়ে যায়। 'জাবালী' গল্পটি পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত গল্পগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই গল্পে তিনি মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে চিহ্নিত করেছেন। তত্ত্বধর্মী গল্পের মধ্যে 'তিলোত্তমা' গল্পটি বর্ণনা গুণে ও পরিবেশন নৈপুণ্যে অসামান্য। রচনার সূক্ষ্মতায়, ভাষার সুপ্রযুক্ত প্রয়োগে, বুদ্ধির প্রাখর্যে এই গল্প অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প।

পরশুরামের হাস্যরস তীক্ষ্ণ। কারণ তাঁর হাস্যরসের অন্তরালে লুকিয়ে থাকে গভীর জীবন জিজ্ঞাসা ও সমাজ জিজ্ঞাসা। অতি জনপ্রিয় দুটি গল্প 'গড্ডলিকা' ও 'কজ্জলী'তে হাস্যরসের নিখুঁত প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। 'চিকিৎসা সংকট' গল্পে চিকিৎসকদের প্রতি লেখকের বিদ্রূপ মনে রাখার মতো। আবার 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পে তিনি গুরুবাদদের তীক্ষ্ণভাবে নিন্দা করেছেন। ধর্ম নিয়ে ভণ্ডামী, ধর্মব্যবসা ও অর্থলোলুপতাকে তিনি তীক্ষ্ণবাক্য বাণে বিদ্ধ করেছেন। ধর্মীয় ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ প্রকাশিত 'লক্ষ্মীর বাহন' গল্পটিতে। এই গল্পের নায়ক অসৎ ব্যবসায়ী মুচকুন্দের ধর্মীয় অসততা ও বুজরুকিকে পরশুরাম ঘৃণা করেন , শাস্তি দেন। 'দক্ষিণ রায়' গল্পটিও শুরু হয়েছে সংসারক্লিষ্ট মানুষের ধর্মীয় প্রার্থনার কৌতুককর রূপ বর্ণনার মধ্য দিয়ে। সমাজ ও জীবনের যা গভীরতর অসুখ তা পরশুরামের গল্পে সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের আধারে পরিবেশিত হয়েছে। জীবনের লঘু অসঙ্গতি যা রঙ্গব্যঙ্গের প্রতিষেধকে সারতে পারে তেমন বিষয়ে পরশুরাম অনেক স্বচ্ছন্দ। 'দীনেশের ভাগ্য', 'জয়রাম জয়ন্তী', 'যশোমতী', 'পরশপাথর', 'রামধনের বৈরাগ্য', 'ভরতের ঝুমঝুমি', 'রামরাজ্য' প্রভৃতি গল্পে তিনি ধর্ম সম্পর্কে একটি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করেছেন। সমাজে দেখেছেন ধর্মের নামে মনুষ্যত্বের অবমাননা, অন্ধবিশ্বাস আর ভণ্ডামীর রাজত্ব। তাই তাঁর গল্পে একদিকে যেমন হাস্যরসের আবরণে ধর্মীয় ভণ্ডামীকে আঘাত করেছেন অন্যদিকে ধর্মবোধের সত্য রূপটি অঙ্কন করেছেন।

পরশুরাম কখনও বিষয় পরিস্ফুটনের ক্ষেত্রে আপোষ করেননি। তাঁর কলমে প্রেম ও দাম্পত্য জীবনের

অমলিন কৌতুকস্নিগ্ধ রূপ যেমন আছে তেমনই আছে সমস্যাসঙ্কুল দাম্পত্য সম্পর্ক। প্রেমও তাঁর গল্পে রঙ্গ-ব্যঙ্গের বিষয়ের আশ্রয়ে পরিবেশিত হয়েছে। তিনি আধুনিক নরনারীর অগভীর প্রেমের ভণ্ডামীকে বিদ্রূপের দৃষ্টিতেই দেখেছেন। 'প্রেমচক্র', 'চিকিৎসাসংকট', 'বিরিঞ্চিবাবা', 'কৃষ্ণকলি', 'স্বয়ম্বরা','পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী','যযাতির জরা', 'হনুমানের স্বপ্ন','আনন্দমিস্ত্রি' প্রভৃতি গল্পে কৌতুকজনক সুস্থ দাম্পত্যের সমান্তরালে অসুস্থ দাম্পত্যকেও চিত্রিত করেছেন। আসলে তাঁর গল্পে ব্যঙ্গের বিষয় প্রেম নয়, প্রেমে ভণ্ডামী, নানা বিকৃতি, লোভ,স্বার্থপরতা। অনেক সময় তাঁর গল্পে স্বাভাবিকভাবেই আদিরসের প্রসঙ্গ এসেছে কিন্তু পরশুরামের শ্রেষ্ঠত্ব এইখানেই যে তিনি তাঁর গল্পে আদিরসের পরিমিত, সুচিন্তিত ও শিল্পীত প্রয়োগ করেছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময় থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন সময়ের সমাজ, তার বাস্তবতা, তার অসঙ্গতি দিয়েই গড়ে উঠেছে বেশ কিছু গল্পের বিষয়।'দক্ষিণ রায়', 'কচি সংসদ', 'লম্বকর্ণ' প্রভৃতি গল্পে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির হীনমন্যতা ও পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তাকে তিনি রূপকের আকারে বিদ্রূপ করেছেন। আবার অন্যদিকে 'ধুস্তুরী মায়া','উপেক্ষিতা', 'প্রেমচক্র', 'নীলকণ্ঠ', 'গগনচটি', 'দুই সিংহ', 'উৎকোচতত্ত্ব' প্রভৃতি গল্পে মানবতার অন্তরায় সমাজকে ব্যঙ্গ করেছেন। এই সমস্ত গল্পে সামাজিক ব্যাধি, সামাজিক প্রসঙ্গের চিত্র এঁকেছেন। কোথাও তা সুন্দর সমাজচিত্র আকারে কোথাও বা বর্ণময় আবার কোথাও সমাজ বাস্তবতার নৈতিক মানদণ্ড প্রকাশ করেছেন।

পরশুরামের গল্পের ভাষা সম্পর্কে কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'তাঁর ভাষাও যেমন সংযত তেমনই সরল। তার মধ্যে পারিপাট্য আছে, কিন্তু অনাড়ম্বর চাকচিক্য বা অলঙ্কারের গুরুভার নেই। ... শব্দসম্পদের মায়াজাল সৃষ্টি করা কোথাও তাঁর প্রধান লক্ষ্য হয়নি। তাঁর শব্দ ব্যবহারের মধ্যে আছে সহজ অকৃত্রিম সংযম এবং অপরিমেয় সংকেতময়তা।' পরশুরাম বাক্যের-শব্দের বিচিত্র ব্যবহারে, অলঙ্কার ও উপমা প্রয়োগের নতুনত্বে, রঙ্গব্যঙ্গাত্মক নতুন শব্দ সৃষ্টিতে, সংলাপের ভাষায় চরিত্র পরিস্ফুটনে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ভাষাগত প্রয়োগ কৌশল পরশুরামের গল্পকে বাংলা সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদে পরিণত করেছে। চরিত্রের অসঙ্গতি নির্মাণের সঙ্গে নারী চরিত্রের মিশ্রণে তিনি আধুনিকমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন মনুষ্যেতর প্রাণিও কত সহজেই রঙ্গব্যঙ্গের উপাদান হতে পারে।

মানবতাবাদী কথাকার পরশুরামের গভীর মানবদরদীসত্তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে তাঁর জীবনে ও গল্পে। দেশ ও কালের বিচিত্র ব্যাপক পটভূমিকে ব্যবহার করে তিনি মানবতাবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। গল্পের সৃষ্টিকৌশল, চরিত্র চিত্রণ এবং ভাষার অনন্যতায় পরশুরাম বাংলা সাহিত্যে রঙ্গব্যঙ্গ ধারায় যে অদ্বিতীয় শিল্পী তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

১৯.৫ গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র

বাংলা ছোটোগল্পের জগতে প্রেমেন্দ্র মিত্র সংবেদনশীল লেখক(১৯০৩-১৯৮৮)। দুই মহাযুদ্ধের কারণে সৃষ্ট হওয়া বিশ্বব্যাপী অর্থসংকট, সোভিয়েত দেশের সাম্যবাদ, আমাদের দেশের দারিদ্র্য ও জীবনমুক্তির লড়াই, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনবাদ অনুযায়ী মানবমনের গহনতার আবিষ্কার বিংশ শতাব্দীর গল্পকারদের গল্প বিষয় হয়ে উঠেছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্র ব্যতিক্রমী নন। তিনি কল্লোলীয় বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত স্বতন্ত্র সাহিত্যধারা সৃজনে ব্রতী হয়েছিলেন। 'সংহতি' ও 'কল্লোল' দুই আদর্শ তাঁকে প্রাণিত করে। প্রেমেন্দ্র মিত্র কীটদষ্ট সময়ের বিধ্বস্ত সমাজের ও অবক্ষয়ী মূল্যবোধের চিত্রকে বাংলা ছোটোগল্পের বিষয়ীভূত করেছিলেন। তাঁর গল্পের অন্যতম

বৈশিষ্ট্য ছিল সময়-সমাজের নিরিখে মানবমনের চেতন-অবচেতনের দ্বন্দ্বকে মূর্ত করা। তিনি জীবনভর গোটা মানুষের মানে খুঁজতে চেয়েছিলেন। মানব চরিত্র তাঁর ছোটোগল্পের প্রধান বিষয়। তিনি মানুষের রূপকার- তিনি হিউম্যানিস্ট- রিয়েলিস্ট বা ন্যাচারালিস্ট নন। মানুষকে মানুষ বলেই চিহ্নিত করেন তিনি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার হয়েও তাঁর গল্পে তিনি সর্বহারার হতাশার কথা, দারিদ্র্যের কথা, নিম্নবিত্তের বেদনার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি মধ্যবিত্তের নানান স্তরক্রমকে উল্লেখ করে তাদের দ্বন্দ্ব সংশয় ও মূল্যবোধ বিসর্জনের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র জীবনসত্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্য একদিকে ব্যবহার করেছেন প্রতীকধর্মিতা অন্যদিকে কবিত্ব। এই শিল্পরীতির প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি বঞ্চিত জীবনের প্রতি যেমন সহানুভূতিশীল হয়েছেন তেমনই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন।

কল্লোলীয় অস্থিরতাময় জীবন সন্ধানের মাঝেই ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'শুধু কেরানী'ও 'গোপনচারিণী' গল্প প্রকাশের মাধ্যমেই ছোটোগল্পকার হিসাবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের আত্মপ্রকাশ। তিনি 'গল্পলেখার গল্প'তে বলেছিলেন 'কিছু যাদের নেই- যারা কেউ নয়, তাদের সেই শূন্য একরঙা ফ্যাকাশে জীবনের কোনো গল্প কি হতে পারে না? হোক বা না হোক তাদের কথা লিখব বলে কাগজ কলম নিয়ে বসলাম।' সেইসঙ্গে সুসভ্য মানুষের অন্তরে আদিম পাশব বৃত্তি, ক্ষুধা, হিংসা, বিষ, অসূয়ার নানা বীভৎস রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। সময়ের অসহনীয় অবস্থার বিরূপতা ও বিরুদ্ধতা বর্ণনে তিনি ছোটোগল্পকার হিসাবে প্রথম থেকেই সমাদৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

তিনি 'হয়তো', 'দেয়াল', 'মন্দির', 'কুয়াশা', 'শুধু কেরানী', 'পুন্নাম', 'ভবিষ্যতের ভার', 'সাগরসংগমে', 'মহানগর', 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার', 'লেবেল ক্রসিং', 'চোখ' প্রভৃতি গল্প লিখেছিলেন। তাঁর গল্পসংকলন গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ১৬টি। পঞ্চশর ১৯২৯, বেনামী বন্দর ১৯৩০, পুতুল ও প্রতিমা ১৯৩২, মৃত্তিকা ১৯৩৫, অফুরন্ত ১৯৩৬, মহানগর ১৯৩৭, নিশীথ নগরী ১৯৩৮, ধূলি ধূসর ১৯৩৮, কুড়িয়ে ছড়িয়ে ১৯৪৬, সামনে চড়াই ১৯৪৭, সপ্তপদী ১৯৫৫, জলপায়রা ১৯৫৮ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ্য। গল্পের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়, সমাজ, বাস্তব- অতিবাস্তব জগৎ, মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি, সামাজিক পট পরিবর্তন, মানবিক চেতনা ও মূল্যবোধ প্রভৃতির বিচিত্র প্রকাশ তাঁর গল্প-বিশ্বের অন্বিষ্ট। 'শুধু কেরানী', 'সাগরসংগমে', 'পুন্নাম', 'মোট বারো' প্রভৃতি অসংখ্য গল্পে 'সমকাল', 'মূল্যবোধ', 'নৈতিক চেতনা', সাম্যবাদী মনোভাবের প্রসঙ্গ উঠে আসতে দেখা যায়। আবার 'মেয়েটি', 'বিপরীত', 'দর্পণ', 'সখীর দলের মেয়ে' প্রভৃতি গল্প হতাশা, নৈতিক অধঃপতন, অবক্ষয়, দ্বন্দ্বের বৃত্তান্ত। হয়তো, 'কুয়াশা' গল্পে নৈতিক দ্বন্দ্ব কিংবা 'ভিড়', 'লাল তারিখ', 'অরণ্য স্বপ্ন', 'যাত্রাপথ' গল্পে মিলন ও মিলনানুভূতির বৈপরীত্য রিক্ত সময়কে প্রতীকায়িত করে।

'হয়তো' গল্পে গল্পকার দেখান পূর্ব পুরুষের ভোগের অন্ধকার নিশ্ছিদ্র। যা ক্রমশ সঞ্চারিত হয় বর্তমান পুরুষের মনে।পাপের সংস্কার বিপর্যস্ত করে জীবনকে। গল্পে কোথাও আড়ষ্টতা নেই, নেই কৃত্রিমতা। সুনিপুণতায় সময়ের প্রেক্ষাপটে মানবিক পরিস্থিতির বিবরণ সার্থক হয়ে ওঠে।'সাগরসংগমে' গল্পে দাক্ষায়নীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে বল্গাহীন মনের জটিল ও রহস্যময়তার চিত্র অঙ্কন করেছেন। তিনি দাক্ষায়নীর নির্জ্ঞান মনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে তার বিবর্তনকে প্রকটিত করেছেন। 'স্টোভ' গল্পে স্টোভকে প্রতীক রূপে ব্যবহার করে মানব মনের দ্বন্দ্বকে নিরূপণ করেছেন। বাসন্তী স্টোভকে নেভাতে চায়, পারে না। একটা অস্বস্তি বাসন্তির সত্তা জুড়ে থেকে যায়। প্রতীকী ব্যঞ্জনায় গল্পটি অসামান্য শিল্পিত রূপ। আবার 'সংসার সীমান্তে' গল্পে দুই বঞ্চিত মানুষ সংসারের সীমারেখায় দাঁড়িয়ে জীবন-সংসারের ভূমিতে ফিরতে চায়। 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' কিংবা 'আয়না' গল্পে বর্ণিত বঞ্চিত জীবন

লেখকের সহানুভূতির রসে জারিত হয়েছে। 'হয়তো', 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার', 'পুন্নাম' গল্পে কবিত্ব ও মনস্তত্ত্বের যুগলবন্দিতে লাগে ব্যঞ্জনার দোলা। পৃথিবীর সরলতম মাছকে বঁড়শিতে গাঁথা যায় না- মনোবিকলনের কূটাভাস 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পে নিঃসময়ের নিজস্ব আদল গড়ে দেয়।

প্রেমেন্দ্র মিত্র গল্প রচনার ক্ষেত্রে আর্টের সততা রক্ষায় বদ্ধপরিকর ছিলেন। আর্ট ও ফর্ম নিয়ে তিনি অসংখ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। কখনো আত্মকথন রীতিতে, কখনো চিত্রনাট্যের আদলে আবার কখনো সাংবাদিকতার ধরনে তিনি গল্প লিখেছেন। অনেক সময় প্রাদেশিক উপভাষা তাঁর গল্পের সংলাপে লক্ষিত হয়। আবার কখনো মিশ্র বিদেশি ভাষাতেও তাঁর গল্পের চরিত্ররা কথা বলে।

যুগসত্তা উন্মোচনের সূত্রে মানবিক পরিসর ও সামাজিক অবস্থানের এমন সার্থক সেতু রচনার আয়োজন বাংলা সাহিত্যে সত্যি দুর্লভ। এভাবেই প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর সমকালের অন্যান্যদের তুলনায় নিজস্ব ভাবনার স্বাতন্ত্র্যে অনন্য হয়ে ওঠেন।

১৯.৬ গল্পকার সুবোধ ঘোষ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন সময়ে কথাসাহিত্য রচনায় নিয়োজিত করেই যেসমস্ত কথাসাহিত্যিক দৃষ্টান্তযোগ্য উত্তরাধিকার রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০) অন্যতম। দীর্ঘ ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে সুবোধ ঘোষ সাহিত্যসাধনায় মগ্ন থেকে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। উপন্যাসের পাশাপাশি ছোটোগল্প ধারায় তার প্রতিভা শতদল পদ্মের মতোই বিকশিত। নিজস্ব উন্নত জীবনবোধ, কাহিনি গ্রন্থনে মুন্সিয়ানা, অনুপম ভাষার শৈলী, বিষয়ে বৈচিত্র্য এবং আঙ্গিকের নিত্যনতুন নিরীক্ষায় তিনি নিজেকে শক্তিশালী গল্পকাররূপে স্থাপন করেছেন। প্রথম থেকেই ছোটোগল্পের নিখুঁত শিল্পরূপ তাঁর করায়ত্ত। তিনি জানেন কিভাবে চমকের মধ্যে দিয়েই দৃঢ়বদ্ধ কাহিনিকে পরিণামের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। গল্পের সমাপ্তিতে চমক পাঠককে মোহিত করে, পাঠকের মন জগৎ ও জীবনের গভীরতম সত্যের সন্ধান পেয়ে আলোড়িত হয়।

গল্পকারের বিষয়-বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা লক্ষ করি জগত ও জীবনের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর অনায়াস যাতায়াত। সহানুভূতিশীল হৃদয়, পর্যবেক্ষণ শক্তি, নিখুঁত বাস্তবদৃষ্টি, ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞতা, জীবন সম্পর্কে নিরাসক্ত মন- নানান বৈশিষ্ট্যে জারিত হয়েছে সুবোধ ঘোষের গল্পভুবন। তাঁর গল্প অনুযায়ী যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তা হল,

১. সুবোধ ঘোষ উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানসিকতার কৃত্রিম মুখোশকে তীব্র কটাক্ষের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত করেছেন।
২. তিনি রিয়ালিজমের নতুন রূপ নিয়ে এসেছেন গল্প ক্ষেত্রে।
৩. তাঁর গল্পে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের নিখুঁত শিল্পরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়।
৪. ভারতবর্ষীয় নীতিতন্ত্রের শিল্পরূপ সুবোধ ঘোষের বিভিন্ন গল্পে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।
৫. প্রাদেশিক বিভিন্ন শব্দ ও পরিভাষার প্রয়োগ লক্ষিত হয় গল্প-অবয়বে।
৬. সুবোধ ঘোষ ছিলেন জীবন রসরসিক শিল্পী। তাই কৃত্রিমতার অন্তরালে তিনি অন্বেষণ করেছেন জীবনবোধকে, যা গল্পের মধ্যে পরিবেশিত হয়েছে।

সমাজ ও জীবনচিত্র অঙ্কনের তাগিদে সুবোধ ঘোষের ছোটোগল্পের জগৎ হয়েছে বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। যার বীজ নিহিত ছিল গল্পকারের নিজস্ব জীবনচর্যায়। তাঁর নিজের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা— বাসের কণ্ডাক্টারি, ট্রাকের

চালক হিসাবে কাজ করা, কুলি-বস্তিতে ইঞ্জেকশান দেওয়ার চাকরি, কুলিগিরি কিংবা মহানগরের রাস্তায় ফেরিওয়ালা বৃত্তি, ছায়াপথ তাঁর সাহিত্যে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলি হল নিম্নলিখিত— ফসিল (১৯৪০), পরশুরামের কুঠার (১৯৪০), কুসুমেষু (১৯৫৬), পলাশের নেশা (১৯৫৭), মনোবাসিত (১৯৫৭), নিত্যসুন্দর (১৯৫৮), জতুগৃহ (১৯৬২), নিকষিত হেম (১৯৬৩), শ্রেষ্ঠগল্প (১৯৪৯), রূপনগর (১৯৬৪) ইত্যাদি।

মধ্যবিত্ত মানসিকতার অবনমন, মূল্যবোধের ভাঙন ও পুনর্বাসনের তাৎপর্য নির্মাণে সুবোধ ঘোষ নিরলস কথাশিল্পী। 'গোত্রান্তর', 'তিন অধ্যায়', 'সুন্দরম, 'হৃদ ঘনশ্যাম', 'স্নানযাত্রা', 'পরশুরামের কুঠার' প্রভৃতি গল্পে আত্মপ্রতারক মধ্যবিত্তের স্বরূপ উন্মোচিত করেছেন। তীব্র তিক্ততা ও নির্মমতায় তিনি উচ্চবিত্ত মানসিকতার ব্যবচ্ছেদ ঘটিয়েছেন। 'সুন্দরম' গল্পের মধ্য দিয়ে উচ্চবিত্ত সমাজে সৌন্দর্যবোধ, দেহলালসা, অর্থলোভ তীক্ষ্ণতর বিদ্রূপে প্রকাশিত করেছেন। 'পরশুরামের কুঠার' গল্পেও উচ্চবিত্ত মানুষের হাতে মানুষের অসম্মানের শোভনীয় পরিণাম কতটা অমানুষিক হতে পারে তার চিত্র বিদ্রূপে জর্জরিত করে এঁকেছেন। মধ্যবিত্তের কপটতাকে নির্মমভাবে তুলে ধরেছেন 'গোত্রান্তর' গল্পে। 'তিন অধ্যায়' গল্পতেও উচ্চমধ্যবিত্তের ক্রমাবনতি এবং তাদের ভাবভঙ্গির কৃত্রিমতাকে গভীর শিল্পরসে জারিত করে প্রকাশ করেছেন। 'বারবধূ' গল্পেও মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে, তার স্ববিরোধিতাকে নিপুণ হাতে এঁকেছেন।

১৯৪০এ রচিত সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পে পরাধীন ভারতবর্ষের উপর ঔপনিবেশিক শাসন ও তার ফলে সৃষ্ট তিনটি শ্রেণির সংঘর্ষের আখ্যান রচিত হয়েছে। 'শক্তিমান কলমের অধিকারী' সুবোধ ঘোষ এই গল্পের মাধ্যমে মানব ইতিহাসের রাজনৈতিক বিবর্তনের প্রেক্ষাপট ও সেই সঙ্গে তার পরিণামকে সাংকেতিক ভাষায় চিহ্নিত করেছেন। তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গল্প 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' বিশেষ রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে। আদিবাসী সমাজের এক শিক্ষার্থীর প্রতিবাদ সত্তার প্রকাশ এই গল্প, এক ব্যক্তির আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার গল্পও। এছাড়াও সুবোধ ঘোষ দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, মন্বন্তর দেশ বিভাজনের প্রেক্ষাপটে বাঙালি মধ্যবিত্তের সামাজিক ইতিহাসকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। 'স্বর্গ হতে বিদায়', 'কৌন্তেয়' প্রভৃতি গল্প তার প্রমাণ। আবার 'অযান্ত্রিক' গল্পে যন্ত্রের(জগদ্দল) সঙ্গে মানুষের (বিমল) অযান্ত্রিক সম্পর্কের বন্ধন রচিত হয়েছে। এক অন্যতম মৌলিক প্রত্যয়ে 'অযান্ত্রিক'এর কথাবস্তু নির্মিত হয়েছে।

সুবোধ ঘোষের গল্পে প্রেম আসে নিঃশব্দতার সঙ্গে যে প্রেমে ভালোবাসা আছে, ভালোবাসার অন্তরালে আছে বিচিত্র চোরাপথ, আছে অন্ধকার, কুটিলতা ও জটিলতা- তার বিচিত্র রূপ দেখিয়েছেন সুবোধ ঘোষ। 'শুক্লাভিসার', 'গরল অমিয় ভেল' ইত্যাদি এ ধারার গল্প।

সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে যে তিনি বিষয়ের সঙ্গে আঙ্গিকের মেলবন্ধন ঘটাতে অবিস্মরণীয় ভাষার ব্যবহার করেছেন। ভাষার মধ্যে তীর্যক ইঙ্গিতময়তার চকিত ঝলকানি ছোটোগল্পের মধ্যে এনে দিয়েছে এক অনুপম বৈচিত্র্যের স্বাদ। নিসর্গ প্রকৃতি উপস্থাপনে, নর-নারীর পারস্পরিক সম্বন্ধের ক্রুরতা নির্মাণে সামাজিক মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের সম্পর্কের নির্ধারণে সুবোধ ঘোষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা ছোটোগল্প ধারায় সুবোধ ঘোষ মধ্যবিত্ত সমাজের নিপুণ কথাকার। ছোটোগল্প যে আজ বাংলা কথাসাহিত্যিকদের কাছে আত্মপ্রকাশের তীব্র মাধ্যম রূপে দেখা দিয়েছে তার মূলেও সুবোধ ঘোষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আলো দেখিয়েছেন উত্তর প্রজন্মের কথাসাহিত্যিকদের, তিনি দৃঢ় করেছেন কথাসাহিত্যের শিল্পশাখার ভিত্তিতে।

১৯.৭ সারাংশ

জগদীশ গুপ্ত, পরশুরাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ গল্পকার সময়-জিজ্ঞাসু জীবনপথিকের মতো চলমান পথের প্রতিবেদন রচনা করেছেন। বিংশ শতাব্দীর পৃথক সময়পর্বে এঁদের স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি বাংলা ছোটোগল্পের ভাণ্ডারকে ঋদ্ধ করে। সময় গ্রন্থনার নিজস্ব পরম্পরায় তাঁরা গল্পকার সত্তার নিভৃত উপলব্ধিকে ব্যক্ত করেন। তাঁদের প্রতিবেদন পাঠ করলে সময় ও পরিসরের গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। একারণে গল্পকথার আধেয় হিসাবে তাঁদের জীবনবোধের সামগ্রিকতাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

১৯.৮ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) বাংলা ছোটগল্পের ধারায় জগদীশ গুপ্তের লিখনশৈলীর অভিনবত্ব বিচার করুন।

২) 'পরশুরামের গল্প নিছক রসালো বস্তু নয়, সারালো বস্তু'- মন্তব্যটির নিরিখে পরশুরামের সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৩) মধ্যবিত্ত জীবন সম্পর্কে গল্পকার সুবোধ ঘোষের গল্প-ভাবনার বিস্তৃত পরিচয় দিন।

৪) বাংলা ছোটোগল্পের ধারায় গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

৫) জগদীশ গুপ্তের গল্পে যে নিয়তি আক্রান্ত জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় তার বিবরণ দিন।

৬) সুবোধ ঘোষের গল্পস্বভাবের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

৭) পরশুরাম রচিত ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) প্রেমেন্দ্র মিত্রের মনস্তত্ত্বধর্মী কয়েকটি গল্পের নাম লিখুন।

২) জগদীশ গুপ্তের প্রকাশিত গল্পসঙ্কলনগুলি (প্রকাশসালসহ) উল্লেখ করুন।

৩) পরশুরামের কোন কোন গল্পে আর্থিক দুর্নীতির পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে?

৪) প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম প্রকাশিত গল্পের নাম কী? এটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

৫) সুবোধ ঘোষের কোন গল্পে যন্ত্র ও মানুষের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে? চরিত্র দুটির নাম লিখুন।

৬) প্রেমেন্দ্র মিত্রের কয়েকটি গল্পসঙ্কলন গ্রন্থের নাম লিখুন।

৭) পরশুরামের লেখা দুটি প্রেমের গল্পের নাম উল্লেখ করুন।

৮) 'পয়োমুখম' গল্প কার লেখা? এই গল্পের মূল বর্ণিত বিষয়টি কী?

১৯.৯ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। শিশির কুমার দাশ, বাংলা ছোটগল্প, দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, দে'জ চতুর্থ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০২।

২। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড: কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৫৭।

৩। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা (বাংলা ছোটগল্পের একশ কুড়ি বছর : ১৮৯১-২০১০), দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৪।

৪। সুমিতা চক্রবর্তী, ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, পুস্তক বিপণি : কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০১২।

৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যে ছোটগল্প, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. : কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ১৪০৫।

৬। ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও ছোটগল্পকার, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রা.লি. : কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০০৬-২০০৭।

৭। গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন কথাসাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮০।

৮। ভূদেব চৌধুরী, ছোটগল্পের কথা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পরিমার্জিত তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০০।

৯। সমরেশ মজুমদার(সম্পাদনা), জগদীশ গুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য, পুস্তক বিপণি : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৯৩।

১০। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প, প্রকাশ ভবন : কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৬১।

১১। তপোধীর ভট্টাচার্য, ছোটগল্পের প্রতিবেদন, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০১১।

১২। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা, দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৪।

১৩। উজ্জ্বল গঙ্গোপাধ্যায়, পরশুরামের গল্প : দ্বন্দ্ব ও সময়, পুস্তক বিপণি : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১১।

১৪। সুমিতা চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮।

১৫। সৌরীন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০০৪।

একক-২০ ❑ নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, আশাপূর্ণা দেবী

গঠন

২০.১ উদ্দেশ্য

২০.২ প্রস্তাবনা

২০.৩ গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র

২০.৪ গল্পকার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

২০.৫ গল্পকার সমরেশ বসু

২০.৬ গল্পকার আশাপূর্ণা দেবী

২০.৭ সারাংশ

২০.৮ অনুশীলনী

২০.৯ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

২০.১ উদ্দেশ্য

নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, আশাপূর্ণা দেবী সমাজসচেতন অন্তর্দৃষ্টির জাগৃতিতে মধ্যবিত্ত জীবনকথার পাশাপাশি মানবজীবনের গূঢ় সত্যটিকে উপস্থাপন করেছেন। এই এককে তাঁদের বিচিত্র দ্যোতনা সম্পন্ন বয়ান সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান লাভ করতে পারবেন। তীক্ষ্ণ মননশীলতায়, স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁরা কীভাবে স্বকীয়তায় ভাস্বর হয়ে উঠেছেন তার পরিচয় লাভ করবেন শিক্ষার্থীরা। মধ্যবিত্তের কোলাহলপূর্ণ সাহিত্যবিশ্বে নারীর স্বতন্ত্র পরিসর নির্মাণে আশাপূর্ণা দেবী যে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবগত হবেন।

২০.২ প্রস্তাবনা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, আশাপূর্ণা দেবীর কথা বিশ্বের বিস্তৃত পরিসরে কথাবস্তুর ভাবনাবলয় বহুমাত্রিক বিশ্লেষণের দাবিদার। বাঙালি মধ্যবিত্তের অবনমন, বিশ্ব যুদ্ধোত্তর সামাজিক-অর্থনৈতিক -রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত, আন্তর্জাতিক জীবনবোধ, অর্থনৈতিক সংকট, ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন, যৌথ পরিবারে ভাঙন-বিশ শতকের প্রত্যেক দশক জুড়ে এই ঘটনার ঘনঘটা গল্পকারদের ভাবনাবিশ্বকে আলোড়িত করে। ভারতবর্ষ জুড়ে স্বাধীনতার আন্দোলন, দেশভাগ, উদ্বাস্তু স্রোত, মহামারী, মন্বন্তর ইত্যাদি জীবন কেন্দ্রিক রাজনৈতিক প্রক্ষেপণে সমাজের ভিত্তিমূলটি যেন নড়ে ওঠে। ফলত স্বাভাবিক ভাবেই যুগাগ্নির উত্তাপকে বহন করে এঁরা যে ব্যতিক্রমী শিল্প সংরূপকে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন তাতে তাঁদের জীবন-অভিজ্ঞতার সুরই শোনা যায়। সমকালীন মানুষের

জীবনবৃত্তের পরিধির যে অভূতপূর্ব রূপায়ণ তা এই পর্বের গল্পকারদের নিখুঁত কারিগর করে তুলেছিল। সমান্তরালে অন্তঃপুরচারিকাদের বৈপ্লবিক কথকতার দলিল সর্বসমক্ষে তুলে ধরার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন গল্পকাররা। সমাজের অব্যক্ত যন্ত্রণার ইতিহাস মনস্তত্ত্ব অন্বেষণের পথে স্পষ্ট ভাবে রচনা করেন তাঁরা।

২০.৩ গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র

বাংলা ছোটোগল্পের জগতে নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫) মধ্যবিত্তের জীবনশিল্পী। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন পৃথিবীতে আবির্ভূত হন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে বাংলা সাহিত্য জগতে তাঁর আবির্ভাব ঘটে। তাঁর প্রথম রচিত গল্প 'মৃত্যু ও জীবন' প্রকাশিত হয় দেশ পত্রিকায়, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে। এই বছর 'মূক' নামে নরেন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অসমতল' প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ বছরে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে। একই সঙ্গে প্রকাশিত হয় 'হলদে বাড়ি' গল্পগ্রন্থ। ফলত এই গল্পগুলিতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার ছবি প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমান্তরালে পঞ্চাশের মন্বন্তর ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রভাবও তাঁর সাহিত্য জগৎকে প্রভাবিত করে। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি তার নিজের লেখা সম্পর্কে বলেছেন 'সমাজে শঠতা আছে, ক্রূরতা আছে, তা আমি জানি। হিংসা, বিদ্বেষেরও অভাব নেই। কিন্তু সমাজ জীবনের এই অন্ধকার দিকের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় কম। ... শান্ত মধুর ভাবই আমার রচনায় বেশি।' তাঁর রচনায় আবেগসমৃদ্ধ মূল্যবোধসম্পন্ন শুভ বিশ্বাসের কথা ফুটে উঠেছে। শুধু দুঃখ, যন্ত্রণা, হতাশা, কাঠিন্যের কথা তিনি লেখেননি। তিনি লিখেছেন ভালোবাসার কথা, প্রেম-প্রীতির কথা। তাঁর গল্প বিশ্বের মধ্যে প্রবেশ করলে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে ধরা পড়ে,

১. নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পবিশ্ব মূলত জীবনের বহু বর্ণ চিত্রমালা। একদিকে দুঃখ দারিদ্র্যময় জীবন অপরদিকে দুঃখ- দারিদ্র্য অতিক্রান্ত জীবনকথা স্পষ্ট নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প-শরীরে।
২. নরেন্দ্রনাথের গল্পের প্রধান আকর্ষণ হল মানব সম্পর্কের বহু বিচিত্র রূপচিত্রণ। মানুষের বিভিন্ন গুণাবলী, ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভ নানাদিকের টুকরো টুকরো সাদামাটা ছবি নরেন্দ্রনাথ মন্থন করে তুলে এনেছেন তাঁর গল্পে।
৩. মধ্যবিত্ত মানসিকতা ও অবক্ষয়ী মননের রূপায়ণ তাঁর গল্পে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তিনি গল্পকে শেষ করেন মমত্ববোধে, মানবিকতার প্রতি শুভেচ্ছায় এবং উত্তরণের মাধ্যমে।
৪. নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পের ভাষা কঠিন ও কোমল। যুগ বৈশিষ্ট্যের নিরিখে সময়োচিত ভাষা প্রয়োগে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

নরেন্দ্রনাথ যেন পর্যবেক্ষক। তিনি সম্পর্কের টানাপোড়েন, ভাঙন ক্রমাগত দেখে গেছেন, দেখে গেছেন মূল্যবোধের বিনষ্টি, শুদ্ধ জীবনবোধের অবসান। এই দেখার চোখ নিয়েই এক একটি গল্প রচনা করেছেন। তাঁর 'অবতরণিকা', 'অভিনেত্রী', 'সেতার', 'মহাশ্বেতা', 'রস', 'চড়াই-উতরাই' প্রভৃতি গল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের সনাতন মূল্যবোধের পরিবর্তনের, ভাঙনের কথা প্রকাশিত হয়েছে 'অবতরণিকা'তে। 'অভিনেত্রী' গল্পেও নরেন্দ্রনাথ মিত্র সামাজিক মূল্যবোধ নিয়ে বেঁচে থাকা, পুনরুজ্জীবিত হতে চাওয়ার চিত্র মমতার সঙ্গে এঁকেছেন। 'সেতার' গল্পেও দেখা যায় অর্থ চিন্তায় নীলিমাকে বাইরে জীবিকার জন্য বেরোতে হয়েছে। কিন্তু স্বামী সুবিমল ও শ্বশুর শাশুড়ির অনিচ্ছা

থাকা সত্ত্বেও নীলিমা জীবনের সেতারে সুর তুলেছে। এ গল্পের নীলিমা চরিত্রের মধ্য দিয়ে গল্পকার দেখিয়েছেন মূল্যবোধ বিনষ্টির ছবি। 'মহাশ্বেতা' গল্পে পরিবর্তনশীল সমাজের সুন্দর রূপচিত্র আছে। 'রস' গল্পে মানুষের চিরন্তন বৃত্তির কথা ধ্বনিত হয়েছে। এই গল্পে তিনি প্রেম মনস্তত্ত্বকে দুভাবে নির্মাণ করেছেন- নিছক রূপাসক্তিজনিত প্রেম ও জীবন জড়ানো প্রেম। যদিও গল্পটি তাঁর অসামান্য লেখনীর গুণে বিশ্বজনীন মানবমনের বিশুদ্ধ প্রেমের গভীর ব্যঞ্জনা নিয়ে অন্যতম সম্পদ হয়ে উঠেছে। 'চড়াই-উতরাই' গল্পটি মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের অবক্ষয়ের জীবন্ত দলিল। 'চোর' গল্পটিতেও জীর্ণ মধ্যবিত্ত বাঙালি মানসের মূল্যবোধের সঙ্কটকে তুলে ধরেন।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প মধ্যবিত্ত মননের অবক্ষয় ও তার মূল্যবোধের পরিবর্তন নিয়েই উপস্থিত। পরিবর্তমান সমাজ ও সময়কে পটভূমি করে গল্পবিশ্বকে নির্মাণ করেছেন এবং তাকে শিল্পসৌরভমণ্ডিত রূপ দিয়েছেন। 'বিশ শতকের চল্লিশের দশক ধরে নরেন্দ্রনাথ মিত্র যতগুলি গল্প লিখেছেন, দেশকালের দাবিকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। তাঁর গল্পকার-ব্যক্তিত্ব এমন সময়ের কালো ছায়া নিয়েই ছোটোগল্পগুলিতে ধরা পড়ে।'মানবতার রসে জারিত তাঁর গল্পের আখ্যানে সমাজ-বাস্তবতার সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে। তাই একথা নিসন্দেহে বলা যায় গল্পকার হিসাবে নরেন্দ্রনাথের মুন্সিয়ানা ও দূরদর্শিতা বাংলা গল্প সাহিত্যে দুর্লভ।

২০.৪ গল্পকার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের ছোটোগল্পের ধারায় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের(১৮৯৯-১৯৭০) অনবদ্য রচনাবলীর সরস ভঙ্গী অপরূপ বৈশিষ্ট্যময়। নানা বিষয়, নানা পটভূমি নিয়ে গল্প রচনার তাগিদ শরদিন্দু তাঁর সম্পূর্ণ জীবন ধরে লালন করেছিলেন। তিনি বাস্তবকে কল্পনারসে জারিত করে গল্পবিষয়কে পরিবেশন করেছিলেন। গল্পস্বভাবের প্রতি তীব্রভাবে পাঠককে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা ছিল তাঁর। মোহিতলাল মজুমদার তাঁর লেখনী সম্পর্কে বলেছেন, 'আপনি বাস্তবের বাস্তবতা খুঁড়িয়া দেখিতে চান না, জীবনের কোনো ব্যাখ্যা বা philosophy আপনার মনকে চাপিয়া ধরে না— সে পিপাসা আপনার নাই;... আপনি passion ও emotion গুলিকে নিজের মতো পাক করিয়া একটু রস তৈয়ার করিয়া দেন এবং ইহার জন্য situation– incident ও character নিজের মতো করিয়া গড়িয়া লন।... ইহাই আপনার বাহাদুরি। 'ফলত বিষয়-বৈচিত্র্য, প্রকরণ কৌশল, চরিত্র নির্বাচন ও সতেজ সাবলীল ভাষাপ্রবাহের সুনিপুণ সঙ্গমে গঠিত তাঁর গল্পভুবন অন্যান্য শ্রেষ্ঠগল্পের সঙ্গে একই পঙক্তিতে স্থান করে নেয়।

শরদিন্দুর ইতিহাস আশ্রিত গল্পগুলি সুদূর অতীতকে প্রেক্ষাপট করে লেখা, কখনো বা বর্তমানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে সৃষ্ট। তাঁর গল্পের মধ্যে বিভিন্ন আকারের গল্প মিশে এক দৃঢ়বদ্ধ রূপ দান করেছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃজনী শক্তির অন্তর্লীন বৈভব ছোটোগল্পের পরিসরে সঞ্চারিত হয়ে আছে। তাঁর গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, তিনি একমুখী কাহিনির মাধ্যমে রুদ্ধশ্বাস আবহে পাঠককে সহজে অন্তিমে পৌঁছে দিতে পারেন। হিংসা-প্রতিহিংসা, যুদ্ধ, হত্যা ষড়যন্ত্রের কাহিনিতে রয়েছে প্রেম-প্রীতির অপূর্ব মায়ালোকের নিবিড়তর সংযোগ। ইতিহাস আশ্রিত গল্পগুলিতে একদিকে যেমন রাজরাজড়ার জীবনকথা আছে তেমনই আছে সমকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আবহকে ধরার অনবদ্য প্রয়াস। এর মধ্যেও তিনি জীবনের প্রতি তীব্র সংরাগকে মিশিয়ে দিয়েছেন। ফলত তাঁর গল্পের ধারায় দুই জীবনের প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। মানব জীবনের উপর ইতিহাসের অমোঘ শক্তি নিয়তির মতো প্রভাব ফেলে কীভাবে জীবন নিয়ন্ত্রণ করে তার ছবি তিনি যেমন এঁকেছেন অন্যদিকে ইতিহাসের ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে বহমান সাধারণ মানবজীবন কথাকেও লিপিবদ্ধ করেছেন। সুকুমার সেন বলেছেন, 'দূরের দৃশ্যপটকে নিকটে এনে দূরের মানুষকে কাছের মানুষ করতে পেরেছিলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। এইখানেই ঐতিহাসিক গল্প লেখক

রূপে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব।'

তাঁর ইতিহাস আশ্রিত গল্পগুলিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—

১. ইতিহাসাশ্রিত গল্পধারা

২. জাতিস্মর-বিষয়াশ্রিত গল্পধারা।

'শঙ্খ-কঙ্কণ', 'বেরা রোধসি', 'বাঘের বাচ্চা', 'ইন্দ্রতুলক', 'প্রাগ জ্যোতিষ', 'আদিম', 'অষ্টম সর্গ', 'মরু ও শঙ্খ', 'তক্ত মোবারক', 'চন্দন মূর্তি' প্রভৃতি গল্পে ইতিহাসের অনুষঙ্গ ব্যবহার করে বর্তমান ও অতীতের সম্মিলিত আলেখ্য রচনা করেছিলেন। বাঙালির ইতিহাস রচনার জন্য তিনি প্রাচীন ভারতীয় সমাজের সঙ্গে বাঙালির জাতীয় জীবনের ঐতিহ্যকে রূপ দিয়েছিলেন। তাঁকে অতীতের জীবন নানা ভাবে আকৃষ্ট করতো। রোমান্সের প্রতি তীব্র আকর্ষণের কারণে তিনি অতীতকে বর্তমান জীবনের আবিলতা থেকে মুক্ত করে কল্পলোকের সামগ্রীতে পরিণত করতে পেরেছিলেন। তাঁর ইতিহাসাশ্রিত গল্প রচনার মূল অন্বিষ্ট ছিল স্বাজাত্যবোধের স্ফূরণ নয়, বরং কল্পনামূলক অতীতের পুনর্নির্মাণ।

জন্মান্তরের স্মৃতিসূত্রে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পটভূমিতে ইতিহাসকে বিনির্মাণে তাঁর মৌলিকত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। 'জাতিস্মর' (১৩৩৯) প্রথম গল্পগ্রন্থ তাঁর। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে পূর্বজন্মের কাহিনি নিয়ে তিনি লিখেছেন 'অমিতাভ', 'মৃৎ প্রদীপ' ও 'রুমাহরণ' গল্প। 'চুয়াচন্দন' (১৩৪২) 'রক্ত-সন্ধ্যা', 'বিষকন্যা' (১৩৪৭) গ্রন্থের সেতু ও বিষকন্যায় ধূসর অতীতের মোহময় ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে। কোনো কোনো গল্প আত্মকথন রীতিতে রচিত, আবার কোনো কোনো গল্পের নেপথ্যে রয়েছে হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগের প্রাচীন ইতিহাস। তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি গল্প পাঠকের অনন্ত বিস্ময়কে জাগিয়ে তোলে। আসলে শরদিন্দুর কল্পনাশক্তি মানবেতিহাসের অতীত খনন করে চরিত্রকে উদ্ধার করেন। কল্পনার ইন্দ্রজাল প্রসারিত করে অতীতকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য তিনি ভাষাকে সৌন্দর্যের বাহক করে তোলেন। ভাষা সম্পর্কে তাঁর অভিমত ছিল, 'ভাষা হবে আরবি ঘোড়ার মতন- বেতো ঘোড়ার মতন নয়। শুধু গতিবেগ নয়- ছোটার মধ্যেও সৌন্দর্য যেন ছুটে বেরোয়-মন যেন ভরে যায়।'— তাঁর গল্পে আকর্ষণকারী ও গতিশীল শব্দের ব্যবহার অতীতের যবনিকা উন্মোচনের অনবদ্য তাৎপর্যে মণ্ডিত।

ইতিহাস আশ্রয়ী গল্প ছাড়াও তার বেশ কিছু অলৌকিক অতিপ্রাকৃত গল্প আছে। এই গল্প সৃষ্টিতে তিনি একধরনের গা ছমছমে ভয়াবহ অসম্ভব পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। এই ধরনের গল্প যোগান দিতে পারে অতিপ্রাকৃত আস্বাদ, অলৌকিত্বের সুরমাধুর্য, জীবনের গতি ও জীবন অভিজ্ঞতার নিবিড়তা। শরদিন্দুর ভৌতিক গল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হল পাঠককে ভিন্ন স্বাদের অলৌকিকতার বিন্যাসে পৌঁছে দেওয়া। সহজ স্বাভাবিক অনায়াস গতির মধ্যে রোমাঞ্চকর শব্দের সংযোজন তাঁর গল্পগুলিকে অন্য মাত্রা দান করেছে। অলৌকিকতার সঙ্গে জীবনের নিবিড়তর সংযোগে নতুন ধরন প্রয়োগ তাঁর গল্পকে নতুন করে তুলেছে।

সামাজিক ও রোমান্টিক গল্পগুলির ক্ষেত্রে তিনি অতি সাধারণ জীবনযাত্রাকে বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তবে সেখানেও মনস্তত্ত্ব বড় কথা হয়ে উঠেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি সামান্য ইঙ্গিতে গূঢ়তর বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন আবার কোনো সময় তাঁর গল্পে গভীর জীবনবোধকে উপলব্ধি করার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাববোধ করেছেন পাঠক। তবু যুগজীবনের চাহিদাকে স্বীকরণ করে অতি সাধারণ ভাষায় লিখে গল্পগুলির শিল্পস্বরূপ প্রকাশের অনিবার্য উপাদান হয়ে উঠেছে। রাজশেখর বসু মন্তব্য করেছেন, 'সংস্কৃত শব্দ, বিশেষত সেকেলে শব্দ দেখলে আধুনিক পাঠক ভড়কে যায়। আশ্চর্য এই- আপনার লেখায় এ রকম শব্দ প্রচুর থাকলেও পাঠক ভড়কায় না। বোধহয় তাঁর কারণ আপনার প্লটের বা বর্ণনার দুনির্বার আকর্ষণ।' তাঁর গল্পের প্রাণকেন্দ্রই

সুললিত ভাব ও ভাষা।

শরদিন্দুর হাস্যরসের গল্পগুলিতে হাসি কখনও মৌন, কখনও মুখর। এই ধরনের গল্পের প্রধান গুণ হল সরসতা। শরদিন্দুর ব্যক্তমনের প্রসন্নতা তাঁর গল্পের প্রাণশক্তি। হাসির গল্পে এক মিষ্টি মধুর আমেজ পাঠকের মনকে মায়াময়তায় আবিষ্ট করে রাখে। এইসব গল্প পড়ে পাঠক খুব সহজেই তাঁর মনের প্রগাঢ় অনুভূতিকে উপলব্ধি করতে পারেন। গল্পবিষয়ের ঐতিহ্য ও রচনাশৈলীর স্বতস্ফূর্ত অভিনবত্ব আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত করে। গল্পগুলিকে আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা যেভাবেই ভাগ করি না কেন শরদিন্দুর স্বকীয়প্রতিভা ও চিন্তাদর্শন প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যে মিলেমিশে গেছে। ফলত তাঁর গল্পগুলি যেমন সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে অন্যদিকে তেমনই সময়ের-সমাজের- জীবনের দর্পণরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

২০.৫ গল্পকার সমরেশ বসু

সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) বাংলা কথাসাহিত্যে এক অতিপরিচিত নাম। ঔপন্যাসিক রূপেই তিনি ছিলেন সমধিক পরিচিত, তথাপি তিনি ছোটোগল্পকার রূপে ছিলেন এক অনন্য জীবনশিল্পী। পঞ্চাশের দশকে 'আদাব'এর মতো ছোটোগল্পের রচনা দিয়েই তাঁর সাহিত্য-জীবনের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৪৬-১৯৮৮ এই বিয়াল্লিশ বছর তিনি সাহিত্যসৃষ্টির নিরলস সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। চারপাশের বাস্তব ও অতিবাস্তব জগতকে তিনি মেধা ও হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। ভাষা-শব্দের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিন্যাসে, বাস্তব-কল্পনার আলোছায়ায় তাঁর কথাবিশ্ব মননদীপ্ত প্রতিবেদন রচনা করে। সমরেশ-কালকূট- ভ্রমরের তিনটি পৃথক সত্তা পরস্পরের সম্পৃক্ত হয়ে তাঁর লেখক সত্তার পূর্ণ বৃত্ত নির্মাণ করে দেয়। 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' (১৯৫৪) লিখে কালকূট রূপে তাঁর অনন্য আবির্ভাব ঘোষণা করেছিলেন। জীবনের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রামে বিপর্যস্ত সমরেশ কালকূটেই পেয়েছিলেন পরম সিদ্ধি। এক সমরেশের মধ্যে বহু সমরেশের উপস্থিতি, স্ববিরোধিতা, আত্মদ্বন্দ্ব নিয়েই গড়ে ওঠে তাঁর কথনবিশ্ব। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, কারাবাস,পরবর্তীতে মতবিরোধ,একাকীত্ব — দুঃখ ও যন্ত্রণার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ তাঁকে অবিরত খনন করে গেছে। এছাড়া এইসঙ্গে যুক্ত হয় দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, যুদ্ধোত্তর সংকট, দেশবিভাগের মতো বিষয়গুলি। অনর্গল আত্মমন্থন ও 'মানুষকে জানার' অদম্য কৌতূহলে তিনি নিজস্ব নন্দনবোধ গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর গল্পে একমুখী বক্তব্যের তাগিদ লক্ষ্য করা যায়। তিনি বক্তব্য-বিষয়কে কোলাজের মতো ছোটো ছোটো ফ্রেমে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর গল্পস্বভাবের প্রধান গুণ, গল্পের ভিতরকার অতৃপ্তির অস্থিরতা এক কাহিনি থেকে আর এক কাহিনির সদরে টেনে নিয়ে যায় পাঠককে। আর এই সূত্রেই স্তরে স্তরে উন্মোচিত হয় মানুষের ভিতর ও বাইরের নানান রূপ।

সমরেশ ও কালকূটের যুগলবন্দীতে, উপস্থাপিত বিষয়ের অন্তর্দীপ্তিতে গল্পবিশ্ব উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিনি মাটি ও মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে বিচিত্র স্তরের মানুষকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। মধ্যবিত্ত জীবনের নানা সমস্যায়, আশা-আশাভঙ্গের যন্ত্রণায়, সম্পর্কের রিক্ততায় পুঞ্জীভূত অন্ধকারের যে মেঘ জমেছিল সমকালের আকাশে সেখানে তিনি আলোর দীপ্তি লক্ষ করেন। তাঁর 'বিনিময়', 'বিকেলে শোনা', 'উত্তাপ', 'পাহাড়ি ঢল', 'যৌবন' ইত্যাদি গল্পে মধ্যবিত্তের অস্তিত্বসংকট, প্রেম-প্রেমহীনতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র অঙ্কিত। আবার 'আবর্ত', 'রঙ', 'আসামী', 'প্রত্যাবর্তন', 'উজান', 'সহযাত্রী', 'লড়াই', 'পয়স্বিনী'র মতো গল্পে শ্রমজীবী মানুষের নিরন্তর লড়াইয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। এই গল্পের কথাবস্তুকে ঘিরে রয়েছে যেমন জীবনযন্ত্রণার ছবি তেমনি মানবিক চেতনার নান্দনিক পরিধিও। 'ফকির', 'আটাত্তর দিন পরে', 'শুভ বিবাহ', 'দুলে বাড়ির ভাত', 'উৎপাত',

'প্রাণ- পিপাসা', 'মানুষ রতন', 'আলোর বৃত্তে' প্রভৃতি গল্পে অর্থনীতিলাঞ্ছিত বৈষম্য, পেটের জ্বালায় বিপথগামী হওয়া, মনুষ্যত্ব বোধকে বিক্রি করে দেওয়ার মতো ঘটনাকে একরৈখিক চিত্রে উপস্থাপিত করেছেন।

শৈশব-কৈশোরের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা-স্মৃতি তাঁকে চালিত করেছে জীবনের গল্প রচনায়। তাই তাঁর প্রতিটি বয়ানে পরস্পরের সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে সংযুক্ত হয়েছে জীবনানুভব, সহজ-সরল ভাষার গাঢ় উপলব্ধি, মানবিকচৈতন্যের ক্রমিক বিস্তার ও দীর্ঘ সংগ্রামের সুনিশ্চিত প্রমাণ। তাই 'আদাব'এর ভাবনাকে অনুসরণ করে আমরা বুঝে নিই, আমরা এখনো সাম্প্রদায়িকতার ধ্বংসস্তূপে নিমজ্জিত হয়ে আছি। ভ্রাতৃহত্যার সন্ত্রাস আজও প্রতিদিন আচ্ছন্ন করছে আমাদের। তাই একথা স্বীকার করে নিয়ে বলতে হয়, সমরেশ বসুর কথনবিশ্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষের পৃথিবীকে, তার যুদ্ধক্ষেত্রকে, প্রত্যাঘাতের আয়ুধকে ,জীবনের সত্যদর্শনকে নতুন করে পুনরাবিষ্কার করা সম্ভব।

২০.৬ গল্পকার আশাপূর্ণা দেবী

'বিচিত্র চরিত্র এই মানুষ জাতটাকে কে কবে চিনেছে? এ কতো উলটো পাল্টা উপাদান দিয়েই তৈরি। এর মধ্যে কত রং, কত লীলা, কত বিস্ময়। সে নিজেই জানে না কি জন্য কী করে বসে। জানে না তার চেতনে অবচেতনে কোথায় কী আছে, তার 'মন' নামক বস্তুটা কী জটিলতার জাল আবদ্ধ।'

(আশাপূর্ণা দেবী, আর এক আশাপূর্ণা)

বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের মরমী শিল্পী আশাপূর্ণাদেবী (১৯০৯-১৯৯৫)। তিনি অসামান্য প্রবলতায় এবং সৃষ্টির মহৎ গুণে ভাষার সীমানা পেরিয়ে বহুদূর পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যসাম্রাজ্য বিস্তার করতে পেরেছেন। তিনি এক অসামান্য চিত্রকর। দৈনন্দিনতার জলচ্ছবি এঁকেছেন কথা দিয়ে। তথাকথিত কোনো ডিগ্রিধারী তিনি ছিলেন না, বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও তিনি পাননি। কিন্তু গভীর অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে নির্মাণ করেছেন। সজাগ, সপ্রতিভ ও কৌতূহলী মন নিয়ে যা কিছু দেখেছেন তাকেই সাহিত্য মাধ্যমে প্রতিফলিত করেছেন। তিনি তাঁর দীর্ঘজীবনে রচনা করে গেছেন অজস্র সাহিত্য কর্ম। একশো ছিয়াত্তরটি উপন্যাস, ১৫০০ ছোটোগল্প, ছোটোদের জন্য সাতচল্লিশটি বই এবং অন্যান্য সংকলন গ্রন্থের সংখ্যা সাতচল্লিশটি- অসংখ্য সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি বাঙালি জীবনের প্রতিচ্ছবিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন 'আশাপূর্ণা তুমি সম্পূর্ণা'। আমাদের দেশে অধিকাংশ নারী যখন রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নাগপাশে বন্দি, সামাজিক রীতি-নীতি-প্রথার অচলায়তনে অবরুদ্ধ সেই যুগে আশাপূর্ণা দেবী অন্তঃপুরের জীবনকথায় মুখরিত করে তোলেন তাঁর সাহিত্যবিশ্বকে। তাঁর সাহিত্যে কোনো কৃত্রিমতা নেই। নেই কোনো গুরুগম্ভীর তত্ত্বকথা, আছে শুধু সহজ অকপট ভাষায় জীবনের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। তাঁর গল্পকারসত্তার স্বভাব স্বরূপ নিদর্শন করলে আমরা যে যে বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই তাকে সূত্রাকারে এইভাবে চিহ্নিত করতে পারি। যথা

১. আশাপূর্ণা দেবী বাঙালি নারী জীবনের নিপুণ কথাকার। তিনি নারীর মনস্তত্ত্বকে নৈপুণ্যতার সঙ্গে উদ্ঘাটিত করেছেন। স্ত্রীরূপে, মাতৃরূপে, শাশুড়িরূপে, বৌমারূপে, বিধবা রূপে নারীকে নিজস্ব স্বরূপ ব্যক্তিত্বে পরিপূর্ণ নারী করে তুলেছেন। নারীর একাধিক রূপের নির্মাণে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

২. আশাপূর্ণা দেবী বাঙালি জীবনের হাসিকান্না, দুঃখ-আনন্দ নিয়ে গড়ে ওঠা জগৎকে সহজ-সরল ভাষায় সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন।

৩. তাঁর সাহিত্যের প্রধান গুণ মমত্ব ও নিস্পৃহতা। মমত্ব ও মমত্বহীনতার দ্বিরালাপে জারিত হয়েছে তাঁর সাহিত্য। সমাজতত্ত্ব ও জীবনতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি মাঝে মাঝে তির্যকতার আশ্রয় নিয়েছেন।

৪. তিনি চরিত্রগুলিকে বাস্তব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করে এঁকে তাদের চোখ দিয়ে দিন বদলের ছবি দেখিয়েছেন।

১৯৪০ সালে তার প্রথম ছোটোগল্প সংকলন ‘জল আর আগুন’ প্রকাশিত হয়। তিনি অসংখ্য গল্প লিখেছেন। তার মধ্যে ‘ভয়’, ‘ছিন্নমস্তা’, ‘স্বর্গের টিকিট’, ‘ছুটিনাকচ’, ‘একটি মৃত্যু ও আর একটি’, ‘পরাজিত হৃদয়’, ‘কার্বন কপি’, ‘হাতিয়ার’, ‘বঞ্চক’, ‘যোগময়ীর মৃত্যুভয়’ প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য। ‘ভয়’ গল্পে প্রকৃতির কাছে মানুষের পরাজয়ের কাহিনি চিত্রিত হয়েছে। ‘ছিন্নমস্তা’ গল্পে একটি পুরুষকে ঘিরে দুই নারীর অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ব্যক্ত হয়েছে। গল্পটি পুত্রশোকে নয়, নিষ্ঠুর এক ভয়াবহতায় শেষ হয়। তাঁর গল্পে নারীরা যে সংস্কারের কাছে হার মানে সেই সংস্কারের অনর্থক অত্যাচারী দিকটি প্রতিফলিত হয় ‘পরাজিত হৃদয়’, ‘কার্বন কপি’, ‘একটি মৃত্যু ও আরেকটি গল্পে’। নগর জীবনের নাগরিক জীবনযাত্রা প্রকাশিত হয় ‘স্বর্গের টিকিট’, ‘বেআব্রু’, ‘আয়োজন’, ‘ঘূর্ণমান পৃথিবী’ প্রভৃতি গল্পে। ‘ছুটি নাকচ’ গল্পটিতে আশাপূর্ণা দেবী প্রকাশ করেন বিধিবদ্ধ সামাজিকতায় জীবন ফুরিয়ে যায় না বরং এক গভীরতর মানবকিতার আশ্রয়ে নতুন পথে জীবনের নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করে। আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে নারী চরিত্রগুলিও অত্যন্ত স্মরণীয়। তাঁর গল্পগুলির (ছিন্নমস্তা,ছায়াসূর্য, বৈরাগ্যের রং, প্রলাপ, মৃত্যুবাণ, গুণ্ঠনবতী ইত্যাদি) মধ্য দিয়ে নারীরা তাদের স্বতন্ত্র পরিসরকে খুঁজে পায়। তাঁর মতো অন্তঃপুরের অন্তঃপুরিকাদের অন্তর গহনে কেউ প্রবেশ করতে পারেনি। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ‘জীবন পর্যালোচনার বিশিষ্টতায় আশাপূর্ণা দেবীই অগ্রবর্তিনি। ....লেখিকার জীবন নিরীক্ষার সত্যসার এই গৃহজীবনের মধ্যে লুকিয়ে আছে।’ আজও যে স্বপ্রতিষ্ঠার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন নারীরা সে কথা ধ্বনিত হয় আশাপূর্ণাদেবীর গল্পবিশ্বে। তাঁর গল্প থেকেই আমরা চোখ মেলে দেখতে পাই নারীসত্তার উন্মোচনের অরুণোদয়কে।

আশাপূর্ণা দেবীর ছোটোগল্পগুলি সংলাপধর্মী। প্রয়োজন মতো তিনি বাহুল্যহীনভাবে বক্তব্যকে উপস্থাপন করেছেন। আবার কোথাও তাঁর বক্তব্য হয়েছে তির্যক আশ্রয়ী। স্বচ্ছ ভাবনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে তাঁর গল্প বিষয়ানুগ হয়ে ওঠে। সাহিত্যবিশ্ব যখন আঙ্গিক নিয়ে চিন্তিত তখন তিনি সহজতায় ও অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনায় গল্পের প্লট নির্মাণ করেছেন। লিঙ্গ অনুযায়ী শব্দের যথোপযুক্ত প্রয়োগে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তিনি যেমন পাণ্ডিত্যোচিত মনোভাব প্রকাশ না করে সহজ কথায় সহজ ভাবে পাঠককে আপন করে নিয়েছিলেন তেমনি পাঠকও ভাবনার সহমর্মিতায় তাঁকে প্রাণের মানুষ, আপনার জন রূপে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে।

বিশ্লেষণের নানান শৈল্পিক দিক উন্মোচনের মধ্য দিয়ে আশাপূর্ণা দেবী আজও পারিবারিক জীবন ও সম্পর্কের রূপকার হিসাবে বাংলা সাহিত্যে চিরবন্দিত, চিরস্মরণীয়।

২০.৭ সারাংশ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, আশাপূর্ণা দেবী বাংলা ছোটোগল্পের জগতের চিরন্তন স্রষ্টা। তাঁদের লেখনীর জাদুতে সৃষ্টি হয়েছে অসাধারণ গল্পমালা। চলমান জীবনের বিচিত্র রূপ, রস, ছোট ছোট দুঃখ কথা, আনন্দের নানা মুহূর্ত, সময়ের আলো-অন্ধকার, মানুষের মনের অন্ধবিবর তাঁদের গল্পে উঠে এসেছে। তাঁদের লেখনী সত্তার পেছনে ছিল সহৃদয় মন ও বুদ্ধির সমান সক্রিয়তা। সময়ের, সমাজের, মানুষের নতুন পথের দিশারী হয়ে তাঁদের গল্পসাম্রাজ্য মৌলিক ও পৃথক ক্ষেত্রটিকে চিহ্নিত করে।

২০.৮ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মানবমনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণমূলক গল্পগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

২) গল্পকার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পবিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৩) গল্পকার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলি উল্লেখ করুন।

৪) যুগধর্মের নিরিখে গল্পকার সমরেশ বসুর গল্পের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করুন।

৫) নারীচরিত্র নির্মাণে গল্পকার আশাপূর্ণা দেবীর মৌলিকতা বিচার করুন।

৬) নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পগুলিতে পরিবর্তনশীল সমাজের রূপায়ণ কীভাবে চিত্রিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করুন।

৭) বাংলা ছোটোগল্পের জগতে গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের স্থান নির্ণয় করুন।

৮) ইতিহাসাশ্রিত গল্প রচনায় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৯) বাংলা সাহিত্যে আশাপূর্ণা দেবীর স্থান নির্ণয় করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) সমরেশ বসুর শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে রচিত কয়েকটি গল্পের উল্লেখ করুন।

২) নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচিত প্রথম গল্পটির নাম কী? এটি কতসালে কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

৩) নরেন্দ্রনাথ মিত্রের দুটি গল্পসংকলন গ্রন্থের নাম লিখুন।

৪) আশাপূর্ণা দেবীর প্রথম বড়দের জন্য রচিত ছোটোগল্প সংকলনের নাম কী? প্রকাশকাল উল্লেখ করুন।

২০.৯ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) শিশির কুমার দাশ, বাংলা ছোটগল্প, দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, দে'জ চতুর্থ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০২।

২) অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড: কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৫৭।

৩) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা (বাংলা ছোটগল্পের একশ কুড়ি বছর: ১৮৯১-২০১০), দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৪।

৪) সুমিতা চক্রবর্তী, ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, পুস্তক বিপণি: কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০১২।

৫) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যে ছোটগল্প, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি.: কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪০৫।

৬) ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও ছোটগল্পকার, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রা.লি.: কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০০৬-২০০৭।

৭) গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন কথাসাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮০।

৮) ভূদেব চৌধুরী, ছোটগল্পের কথা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পরিমার্জিত তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০০।

৯) অঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ মিত্র : জীবন ও সাহিত্য, পুস্তক বিপণি : কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৪।

১০) তপোধীর ভট্টাচার্য, ছোটগল্পের প্রতিবেদন, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০১১।

১১) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা, দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৬।

১২) মঞ্জুরী চৌধুরী, ছোটোগল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র, দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৬।

১৩) আশাপূর্ণা দেবী, আর এক আশাপূর্ণা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪০১।

মডিউল-৪
প্রবন্ধ ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা

একক-২১ ❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

গঠন

২১.১. উদ্দেশ্য
২১.২ প্রস্তাবনা
২১.৩ প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২১.৪ প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
২১.৫ সারাংশ
২১.৬ অনুশীলনী
২১.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

২১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে শিক্ষার্থীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সৃজনশীল সাহিত্য প্রতিভার নানাদিক সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ও প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দরের মননশীলতা কতখানি বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে। চিন্তাশীল রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ রচনার সাফল্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতি-বিশ্বভাবনা সম্পর্কে তাঁর মনন সমৃদ্ধ ভাবনা প্রকাশিত হবে এখানে। মেধার সঙ্গে মননের মেলবন্ধন ঘটানোই এখানকার উদ্দেশ্য। পাশাপাশি রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন জ্ঞানের আধার। বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর ধারণা; সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি নিয়ে লেখা রামেন্দ্রসুন্দরের বিভিন্ন প্রবন্ধ ভাবনা নির্দেশ করাই এই এককের উদ্দেশ্য।

২১.২ প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রপূর্ব যুগে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ভিন্নধারা প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সেই ধারাকে বজায় রেখে তাঁর সৃজনশীল প্রবন্ধ প্রতিভাকে সৃষ্টির উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন। বাস্তব এবং কল্পনার মিশেলে রবীন্দ্র প্রবন্ধ সাহিত্য বাংলা সাহিত্যকে যেভাবে বিকশিত করেছে তা অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্যের লেখকদের মধ্যে কম দেখা যায়। চিন্তাশীল এই লেখক বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ রচনায় অত্যন্ত মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। সে সময়ের বাংলা তথা ভারতবর্ষের শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতি-সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর গভীর ভাবনা প্রস্ফুটিত হয়েছে এই জাতীয় রচনায়। রবীন্দ্রনাথের মতো এ যুগের প্রবন্ধ রচনায় বাংলা সাহিত্যে নিজের আসন নিশ্চিতভাবেই স্থায়ী করে নিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও দর্শন ও সাহিত্যেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। সমকালীন বিষয়বস্তু ছাড়াও স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত থাকা, বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করা, সমাজসংস্কার করা, জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণের ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর লেখায়। রবীন্দ্র ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। মূলত বিজ্ঞান ও দর্শনের বিভিন্ন দিক ছিল তাঁর প্রবন্ধের বিষয়। প্রবন্ধ রচনায় তাঁর জ্ঞানের যথার্থতা প্রকাশ পেয়েছে।

২১.৩ প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের প্রধান পরিচয় তিনি কবি। কিন্তু তিনি শুধু কবি নন, বহুমুখী প্রতিভা তাঁর। তিনি ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্পকার, নাট্যকার, অভিনেতা, প্রাবন্ধিক, চিত্রকর, পত্রলেখক, লোকসংস্কৃতিবিদ,সাহিত্যসমালোচক, শিক্ষাবিদ, সমাজচিন্তক এবং সকল সংকীর্ণতামুক্ত মানবধর্মের প্রচারক। এখানে আমরা প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের পরিচয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করব।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম প্রবন্ধ রচনা করেন পনেরো বছর বয়সে আর তাঁর শেষ প্রবন্ধ রচিত হয় আশি বছর বয়সে। রবীন্দ্র সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'বাংলা সাহিত্যে লেখকরূপে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবেশ কাঁচা কবি ও পাকা প্রবন্ধকার হিসেবে,দুবছর আগে পরে।' ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব'পত্রিকায় প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ। নাম 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী'। এটি আসলে তিনটি কাব্য নিয়ে লেখা সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। কাব্যগুলি হল নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা', রাজকৃষ্ণ রায়ের 'অবসর সরোজিনী' এবং হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর 'দুঃখসঙ্গিনী'। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় প্রবন্ধও সাহিত্য সমালোচনামূলক রচনা। 'ভারতী'পত্রিকায় প্রকাশিত হয় মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য সমালোচনা 'মেঘনাদবধ কাব্য'। 'ভারতী'তে প্রকাশিত হতে থাকে রবীন্দ্রনাথের একের পর এক প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথের প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ 'জুতাব্যবস্থা' 'ভারতী'র পাতাতেই ছাপা হয়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকাতেও রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। পত্রিকা দুটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রাবন্ধিক সত্তার স্ফুরণ ঘটে।

১৮৭৬ থেকে ১৮৯০ কালপর্বকে রবীন্দ্রনাথের প্রাবন্ধিক সত্তার প্রথম যুগ বা প্রথম পর্ব বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' প্রকাশিত হয় ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে। এই পর্বে প্রকাশিত অন্যান্য প্রবন্ধগুলি হল 'বিবিধ প্রসঙ্গ' (১৮৮৩), 'আলোচনা' (১৮৮৫), 'সমালোচনা' (১৮৮৮) ইত্যাদি। উনিশ শতকের শেষ দশকে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি হল 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি' (১ম খণ্ড), 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি' (২য় খণ্ড) এবং 'পঞ্চভূত' (১৮৯৭)। এদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হল 'পঞ্চভূত'। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে এর রচনাগুলি 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ''পঞ্চভূতের ডায়েরি' নামে। আমাদের শাস্ত্রমতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুত্ ও ব্যোম হল পঞ্চভূত। এদের কথোপকথনে গড়ে উঠেছে গ্রন্থটি। এখানে এক একটি ভূত আসলে এক একটি জীবনদৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধি। এই গ্রন্থে একসঙ্গে মিলেছে চিন্তার বৈচিত্র্য, জীবনের সমস্যা-সম্ভাবনার রূপায়ণ এবং ভাষাভঙ্গির মাধুর্য। বলা যায়, বিষয়ের অভিনবত্বে ও গদ্যরীতির অসাধারণত্বে এই বই বাংলা সাহিত্যে অনন্য সৃষ্টি। উনিশ শতকের শেষ দশককে রবীন্দ্র প্রবন্ধসাহিত্যের দ্বিতীয় পর্ব বলা যেতে পারে। তৃতীয় পর্ব শুরু হয় বিশ শতকের গোড়ার দিকে। প্রকাশিত হয় 'আত্মশক্তি' (১৯০৫), 'ভারতবর্ষ' (১৯০৬)। ১৯০৭খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় সাত সাতটি প্রবন্ধগ্রন্থ। গ্রন্থগুলি হল 'বিচিত্রপ্রবন্ধ', 'চারিত্রপূজা', 'প্রাচীনসাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'সাহিত্য', 'ব্যঙ্গকৌতুক'এবং 'আধুনিক সাহিত্য'। 'বিচিত্রপ্রবন্ধ' গ্রন্থের রচনাগুলি ব্যক্তিগত প্রবন্ধের অসামান্য নিদর্শন। এর ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, ''...ইহার যদি কোনো মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্তু গৌরবে নয়, রচনা রস সম্ভোগে।'' জীবনী প্রবন্ধের ধারায় 'চারিত্রপূজা' উল্লেখযোগ্য রচনা। 'প্রাচীনসাহিত্য' সমালোচনা ধারায় গুরুত্বপূর্ণ বই। লোকায়ত সংস্কৃতির রাবীন্দ্রিক মূল্যায়ন রয়েছে 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে। 'সাহিত্য' গ্রন্থে রয়েছে সাহিত্যের তত্ত্বমূলক আলোচনা। আর 'আধুনিক সাহিত্য' বইতে পাই সমকালীন লেখকদের সাহিত্যকর্মের সমালোচনা। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগ্রন্থ গুলি হল 'রাজাপ্রজা', 'স্বদেশ', 'সমাজ', 'শিক্ষা'। 'শব্দতত্ত্ব', 'ধর্ম' প্রকাশিত হয় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের দুটি অসামান্য গদ্যগ্রন্থ 'জীবনস্মৃতি' এবং 'ছিন্নপত্র'। এগুলির বেশ ব্যবধানে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণাত্মক গদ্যরচনা 'যাত্রী' (১৯২৯)। এটি আসলে 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরি' ও 'জাভাযাত্রীর পত্র' এর একত্র সংকলন। 'রাশিয়ার চিঠি' প্রকাশিত হয় ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে। বিপ্লব পরবর্তী নবজাগ্রত রাশিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শিক্ষানীতি বিষয়ক দলিল বলা যেতে পারে 'রাশিয়ার চিঠি' কে। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' পদ গ্রহণ করেছিলেন। সেই সুবাদে যে 'কমলা বক্তৃতামালা' দিয়েছিলেন, তাই প্রকাশিত হয় 'মানুষের ধর্ম' নামে। এর উৎস হল তিন বছর আগে অক্সফোর্ডে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা 'Religion of Man'. 'মানুষের ধর্ম' তারই বাংলা রূপান্তর। 'ছন্দ' (১৯৩৬) গ্রন্থে পাই ছান্দসিক রবীন্দ্রনাথের পরিচয়। এতে রয়েছে বাংলা ছন্দের মূলসূত্র, তত্ত্ব ও স্বরূপালোচনা। সাহিত্যের বিচিত্র তত্ত্ব ও জিজ্ঞাসার আলোচনা হল 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬)। রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ রাজনৈতিক প্রবন্ধ সংকলন 'কালান্তর' প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ বলা যেতে পারে এই 'কালান্তর'কে। 'কালান্তর' প্রকাশের বছরেই প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞানসচেতন চিন্তার অনবদ্য প্রকাশ 'বিশ্বপরিচয়'। ১৯৩৮ তে প্রকাশিত 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থে পাই ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথকে। 'ছেলেবেলা' (১৯৪০) স্মৃতিমেদুর আত্মকথন। 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা' বাংলা আত্মকথন ধারায় অনবদ্য যুগলবন্দী। প্রথমটি লেখা সাধুগদ্যে আর অন্যটি চলিতরীতিতে। 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১) আসলে কবির আশিবছরের জন্মদিনের সভায় পঠিত অভিভাষণ। মানবসভ্যতার ক্রান্তিকাল তথা সভ্যতার সংকটকে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই ভাষণে। তবে নৈরাশ্যে নয়, মানবতার প্রতি বিশ্বাস ও প্রত্যয়ে শেষ হয়েছে কবির বক্তব্য। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ প্রবন্ধগ্রন্থ হল 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' (১৯৪১)। এর পরেও প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের একাধিক প্রবন্ধগ্রন্থ; যেমন — 'আত্মপরিচয়', 'সাহিত্যের স্বরূপ' ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের সংখ্যা অল্প নয়। এই বিশাল সংখ্যক প্রবন্ধকে কালানুক্রমিক আলোচনা করা সহজ কাজ নয়; বরং বিষয়ভিত্তিক ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমেই এর দুটি প্রধান ভাগের কথা বলা যায়। যথা— আত্মগত রচনা এবং নৈর্ব্যক্তিক রচনা। রবীন্দ্রনাথের নৈর্ব্যক্তিক প্রবন্ধকে আবার যে সকল ধারায় বিন্যস্ত করা যায়, সেগুলি হল শিক্ষা, ধর্ম ও দর্শন, সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য সমালোচনা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি ও স্বদেশচিন্তা, পল্লীসমাজ ইত্যাদি। কোনো কোনো সাহিত্যের ঐতিহাসিক আবার রবীন্দ্র প্রবন্ধসাহিত্যকে এরকমভাবেও সাজিয়েছেন। যথা— ১.ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ ২. স্বদেশ,সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ ৩. শিক্ষা, ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ ৪.বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ ৫. আত্মপরিচয় ও জীবনীমূলক প্রবন্ধ ৬.ডায়েরি ও ভ্রমণমূলক প্রবন্ধ ৭ .ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র। বলাবাহুল্য এধরনের ভাগগুলি কোনোটিই চূড়ান্ত নয়, আপেক্ষিক।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের' রচিত হয় তাঁর একত্রিশ বছর বয়সে। তাঁর জীবনে তখনো শান্তিনিকেতন পর্ব শুরু হয়নি। এই সময়কালের রচনাগুলিতে শিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মৌল অভিমুখের পরিচয় আমরা পাই। তাঁর বিরূপতা আমরা লক্ষ করি প্রাচীন টোল-চতুষ্পাঠী নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা এবং ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতি— দুয়ের প্রতি। পাশাপাশি তিনি নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করেন জাতীয় জীবনের সব সংকটের মূলে যে অশিক্ষা, তার কথা। 'শিক্ষার হেরফের' এই পর্বের উল্লেখযোগ্য রচনা। প্রাক্-বিশ্বভারতী পর্বে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সমকালে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার আদর্শ ছিল প্রাচীন তপোবন। আসলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ মানসিকভাবে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি অনুসারী হয়ে উঠেছিলেন বলা যায়। এই সময়ের প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা 'তপোবন' প্রবন্ধ। কিছুপরে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর তপোবনকেন্দ্রিক শিক্ষাচিন্তার সংকীর্ণতা

বুঝতে পারেন। উত্তরণ ঘটে তাঁর বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। তাঁর শিক্ষাচিন্তার মূল ভিত্তি হয়ে ওঠে বিদ্যার সার্বভৌমত্ব, শিক্ষার সার্বজনীনতা এবং শিক্ষায় আন্তর্জাতিকতা। এই পর্বের বিশিষ্ট রচনা হল 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে তাঁর শিক্ষাচিন্তার বহুমাত্রিকতার প্রকাশ আমরা পাই। জনশিক্ষার বিস্তারের কথা বললেন। ব্যাখ্যা করলেন শিক্ষাবিস্তারে মাতৃভাষার অপরিহার্যতার কথা। নারী ও পুরুষের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে কোনো পার্থক্যে বিশ্বাসী ছিলেন না তিনি। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধের কথা বলা যায়। শিক্ষার বিষয়বস্তুতে তিনি জোর দিয়েছেন অসাম্প্রদায়িক মনোভাব রক্ষার ওপর। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় তাঁর 'মুসলমান ছাত্রের বাঙ্গালাশিক্ষা' প্রবন্ধটি।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-দর্শন বিষয়ক রচনাগুলির মধ্যে আকর হল 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থটি। এই রচনায় তিনি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বা ঈশ্বরের কথা বলেননি, বলেছেন মানুষের মধ্যে থাকা শুদ্ধতম অন্তরসত্তার কথা। তাঁর ধর্ম-দর্শন কখনো মনে হয় খ্রিস্টধর্মজাত, কখনো সুফীমরমিয়াবাদ আবার কখনো মনে হয় বাউল ধর্মের 'মনের মানুষ' তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত। রবীন্দ্রনাথের এই অধ্যাত্মভাবনারই আরেক অভিমুখ হল তাঁর সৌন্দর্যভাবনা এবং সত্যদর্শন। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে সৌন্দর্য ও সত্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যে কথোপকথন হয়, তারই লিখিত রূপ 'The Nature of Reality'। যেখানে রবীন্দ্রনাথের উচ্চকণ্ঠ ঘোষণা, মানুষ ছাড়া সত্যের অস্তিত্ব নেই।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ,সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মূল বক্তব্য জাতির কল্যাণের সঙ্গে দেশবাসীর সার্বিক উন্নতি। এবিষয়ে প্রাসঙ্গিক রচনাগুলি হল 'ভারতবর্ষ' (১৯০৬), 'স্বদেশ' (১৯০৮), 'সমাজ' (১৯০৮), 'পল্লীপ্রকৃতি' (১৯৩৪), 'কালান্তর'(১৯৩৭), 'সভ্যতার সংকট' (১৮৪১) ইত্যাদি। প্রবন্ধগুলিতে দেশ ও জাতির বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। প্রকাশ পেয়েছে দেশের শিক্ষা, সমাজ,রাজনীতি, নারীদের সমস্যা, পল্লীসংগঠন, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের গভীর ভাবনা। 'রাজাপ্রজা'(১৯০৮) গ্রন্থটিতে রাজনৈতিক সমস্যার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। 'সাধনা' পত্রিকার যুগ থেকেই রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক অভিমত সত্যবোধের ওপর সুপ্রতিষ্ঠ হতে শুরু করে। এই গ্রন্থের 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ রাজত্বের যে ভবিষ্যতের ছবি এঁকেছেন,তা তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক অভিমত প্রকাশের নিরিখে 'কালান্তর'(১৯৩৭) এর গুরুত্বের কথা আগেই বলা হয়েছে। রাষ্ট্রচিন্তার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই শোষিতের পক্ষে, সর্বহারা সাধারণের পাশে, যাঁরা তাঁর ভাষায় 'সভ্যতার পিলসুজ'। নকল জাতীয়তাবাদকে তিনি সঠিকভাবে চিনতে পেরেছিলেন,তাই তাকে অতিক্রম করে তিনি শেষপর্যন্ত মানবাত্মার বিকাশ ও জাতীয় জীবনের সমৃদ্ধির কথা বলেছেন দৃঢ়ভাবে। দূরদর্শী রাজনীতি সচেতন প্রাবন্ধিক তাঁর জীবনসায়াহ্নে সমকালীন পৃথিবীর ভয়াল পরিস্থির কথা মনে রেখেও মনুষ্যত্বের ওপর আস্থা হারাননি। জোর গলায় বলেছেনঃ ''মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থ হল 'বিশ্বপরিচয়' (১৯৩৭)। পরিণত রবীন্দ্রনাথ ছোটোদের উপযোগী করে এই বই লেখেন। তিনি নিজে শিশু বয়সে পৃথিবী ও মহাকাশের রহস্য নিয়ে ছিলেন প্রবল কৌতূহলী। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিশুশিক্ষার্থীদের কথা ভেবে তিনি এই ধরনের বই লেখেন। বইটিতে রয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞান, পরমাণুতত্ত্ব,ভূলোক,গ্রহ-নক্ষত্রাদির বিচিত্র সংবাদ। সমকালীন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্পর্কেও তিনি চরম সজাগ। তার পরিচয় আমরা পাই 'বিশ্বপরিচয়'এর একাধিক সংস্করণে। প্রাণ ও অপ্রাণের ঐক্যসূত্র ব্যাখ্যায় তিনি কোনো মরমী দর্শনের সাহায্য গ্রহণ করেননি, বৈজ্ঞানিকভাবে যা ব্যাখ্যাযোগ্য তাকেই তুলে ধরেছেন। এপ্রসঙ্গে আমরা

বলতেই পারি, বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, আইনস্টাইন, হাইজেনবার্গ প্রমুখদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও মতামত বিনিময় তাঁর বিজ্ঞানচেতনাকে সম্বৃদ্ধ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচেতনার প্রকাশের নিরিখে 'বিশ্বপরিচয়' এক এবং অদ্বিতীয় রচনা নিঃসন্দেহে; কিন্তু তাঁর কবিতা বা চিঠিপত্রেও বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় সুমুদ্রিত। এ প্রসঙ্গে 'নবজাতক'(১৯৩৮) এর কবিতার কথা বলা যায়।

সাহিত্য বিষয়ক গদ্য রচনার মধ্য দিয়েই রবীন্দ্র প্রবন্ধসাহিত্যের সূচনা, একথা আমরা আগেই বলেছি। রবীন্দ্র প্রবন্ধসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল 'সাহিত্য' (১৯০৭), 'আধুনিক সাহিত্য' (১৯০৭), 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭), 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৮), 'শব্দতত্ত্ব' (১৯০৯), 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬), 'ছন্দ' (১৯৩৬), 'বাংলাভাষা পরিচয়' (১৯৩৮)এবং 'সাহিত্যের স্বরূপ' (মৃত্যুর পর প্রকাশিত)। সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রোমান্টিক ভাববাদী আস্বাদনপন্থী। সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্র মতাদর্শকে কতকগুলি সূত্রে চিহ্নিত করেছেন প্রাবন্ধিক তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রগুলি হল এইরকমঃ ১. সমালোচনার ক্ষেত্রে 'বাঁধা ওজন' ও 'বাঁধি বোল' থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। ২. কোনোরকম শ্রেণিবিচার বা পূর্বপ্রত্যাশা না রেখে লেখক যা দিতে চেয়েছেন, সমালোচকের তাই গ্রহণ করা কর্তব্য। ৩. পাঠকের ভালো লাগা, মন্দ লাগাই সমালোচনা হিসেবে গৃহীত হওয়া উচিত। ৪. শ্রেষ্ঠ সমালোচনা কেবল সাহিত্যের বহিরঙ্গ বিশ্লেষণ নয় ৫. সাহিত্যের বিচার মানে সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়, ব্যাখ্যা মাত্র। ৬. কাব্য বিচারে কবির ব্যবহারিক জীবন কোনো কাজে লাগে না।

সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের মতামত সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়; কিন্তু তা একান্তভাবে রাবীন্দ্রিক। আর এই দৃষ্টিভঙ্গির মূলে রয়েছে এক অখণ্ড জীবনদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনীমূলক রচনার দুটি ভাগ রয়েছে— আত্মজীবনীমূলক ও জীবনীমূলক। 'জীবনস্মৃতি'(১৯১২), 'ছেলেবেলা'(১৯৪০) এবং 'আত্মপরিচয়' (১৯৪০) গ্রন্থগুলি আত্মজীবনীমূলক। 'জীবনস্মৃতি'কে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য আত্মজীবনীমূলক রচনা বলতে চাননি কোনোভাবেই। তাঁর মতে 'জীবনস্মৃতি' হল স্মৃতির পটে আঁকা জীবনের ছবি। 'ছেলেবেলা'ও অনবদ্য স্মৃতিচিত্রণ। 'আত্মপরিচয়' ততটা সহজ ও সুখপাঠ্য নয়, কিছুটা তত্ত্বঘেঁষা। 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখছেনঃ ''আমার মধ্যে অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে। সেই আনন্দ সেই প্রেম আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ,আমার বুদ্ধি মন, আমার নিকট প্রত্যক্ষ এই বিশ্বজগত,আমার অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যত পরিপ্লুত করিয়া আছে।''

এইভাবে রবীন্দ্রনাথের পার্থিব জীবনেতিহাস,পুরোনো দিনের কথা আর কবির অন্তরজীবনের অনন্ত উপলব্ধির কথা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে আত্মজীবনীমূলক রচনাগুলিতে। রবীন্দ্রনাথের লেখা জীবনীমূলক গ্রন্থগুলি আসলে মহাজীবনের ভাষ্য। উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল 'চারিত্রপূজা' (১৯০৭), 'ভারতপথিক রামমোহন রায়' (১৯৩৩), 'মহাত্মা গান্ধি', 'বুদ্ধদেব' ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের ডায়েরি ও ভ্রমণমূলক রচনা হিসেবে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১), 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী' (১৮৯৬) 'জাপানযাত্রী' (১৯১৯), 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী (১৯২৯), 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩১), 'পথে ও পথের প্রান্তে' (১৯৩২), 'পথের সঞ্চয়' (১৯৩৯) উল্লেখযোগ্য। 'রাশিয়ার চিঠি' চিঠির আকারে রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ। রাশিয়ার বিপ্লবোত্তর জীবনের পরিপূর্ণতা রবীন্দ্রনাথকে যেমন— বিস্মিত করেছিল, তেমনই এর কিছু গলদ তাঁর অন্তরদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল নির্ভুলভাবে। সারাজীবনে রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখেছেন অসংখ্য। বক্তব্যের গভীরতায় ও প্রকাশের সাবলীলতায় তা হয়ে উঠেছে সাহিত্য পদবাচ্য। রবীন্দ্রনাথ সর্বার্থে ছিলেন বিশ্বপথিক। মহাপৃথিবীর আমন্ত্রণে তিনি

বিভিন্ন প্রান্তে গেছেন আর অভিজ্ঞতার বিবরণকে করে তুলেছেন কালজয়ী সাহিত্য।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ধারায় রবীন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠ লেখক বলা যায়। এপ্রসঙ্গে তাঁর তিনটি গ্রন্থের কথা না বললেই নয়। গ্রন্থগুলি হল 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'পঞ্চভূত' এবং 'ছিন্নপত্রাবলী'। 'বিচিত্র প্রবন্ধ'র বিভিন্ন রচনায় বক্তব্যে আছে কবিত্ব,ভাষায় আছে ব্যঞ্জনা প্রকাশে আছে লাবণ্য। 'পঞ্চভূত'এর অভিনবত্বের কথা আগেই বলা হয়েছে। আর 'ছিন্নপত্রাবলী'তে পাই কবিচেতনার রসনিবিড় প্রকাশ। সন্ধ্যার বর্ণনায় কবি লিখছেনঃ ''কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী এবং তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা— মনে হয় যেন একটি সোনার-চেলি পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একেলা চলেছে।''

প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব প্রবন্ধই তথ্যনিষ্ঠ ও তাত্ত্বিক হয়েও লেখকের হৃদয়ের স্পর্শে অন্য মাত্রা পেয়েই যায়।প্রকাশভঙ্গির আন্তরিকতায় এবং বক্তব্যের গভীরতায় আজও রবীন্দ্রপ্রবন্ধের প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য।

২১.৪ প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর (১৮৬৪-১৯১৯) একটি স্বতন্ত্র স্থান রয়েছে। আদতে তিনি ছিলেন রসায়নের মেধাবী অধ্যাপক। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য তাঁর মতো মানুষ নিছক বিজ্ঞানের চৌহদ্দির মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে প্রবল উৎসাহী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক এই মানুষটি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছের মানুষ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো প্রাজ্ঞজনের কাছে ছিলেন 'বিদ্যার একটি বড়ো জাহাজ'।

রামেন্দ্রসুন্দর জন্মেছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার টেঁয়া-বৈদ্যপুর গ্রামের সাহিত্যানুরাগী পরিবারে। মেধাবী ছাত্র রামেন্দ্রসুন্দর ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্য রচনায় পারদর্শী ছিলেন। কর্মজীবনে ছিলেন বিজ্ঞানের অধ্যাপক। কিন্তু 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' এর মতো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন। রিপন কলেজের অধ্যক্ষতা করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। বলা যায় তিনি ছিলেন তাঁর সময়কালের অগ্রণী শিক্ষাবিদ। অন্তরের দিক থেকে ছিলেন বাংলা সাহিত্যে নিবেদিতপ্রাণ সেবক। এপ্রসঙ্গে তিনি নিজে জানিয়েছেনঃ '' যথাশক্তি বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবা করিব,এই আকাঙ্ক্ষা বাল্যকাল হইতেই পোষণ করিয়াছিলাম। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তদর্থেই আমার প্রায় সকল শক্তি নিযুক্ত করিয়াছি।''

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম রচনা 'মহাশক্তি' নামক প্রবন্ধ। প্রকাশিত হয় ১২৯১ বঙ্গাব্দের পৌষ-সংখ্যার 'নবজীবন' পত্রিকায়। সুশিক্ষিত বঙ্গসন্তানদের বাংলা সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করার যে আহ্বান বঙ্কিমচন্দ্র করেছিলেন, সেই ডাকে সাড়া দিয়ে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর তাঁদের অন্যতম। বিজ্ঞানের স্কলার হয়েও তিনি সাহিত্যচর্চা করেছিলেন বাংলায়। তাঁর লেখালেখির সংখ্যা খুব কম নয়। তাঁর প্রথম বই হল 'প্রকৃতি' (১৮৯৬)। রামেন্দ্রসুন্দরের জীবিতকালে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দশ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৪), 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (১৯০৬), 'কর্মকথা' (১৯১৩), 'চরিতকথা' (১৯১৩), 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' (১৯১৪) এবং 'শব্দকথা' (১৯১৭)। মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 'বিচিত্র জগত' (১৯২০), 'নানাকথা' (১৯২৪), 'জগত-কথা' (১৯২৬) ইত্যাদি। রামেন্দ্রসুন্দর কতকগুলি পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেছিলেন। যেমন 'পদার্থবিদ্যা (সচিত্র)', 'ভূগোল', 'বিজ্ঞানকথা' ইত্যাদি। 'জন্মভূমি', 'সাহিত্য', 'বঙ্গদর্শন', 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', 'প্রদীপ', 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'ভাণ্ডার' ইত্যাদি পত্রিকায় বহু বিষয়ের বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; এগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে পারেননি প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দর।

রামেন্দ্রসুন্দরের 'প্রকৃতি' গ্রন্থে রয়েছে বিজ্ঞানের কথাকে বাংলা ভাষার সাধারণ পাঠকের উপযোগী করে পরিবেশনের প্রয়াস। আলোচনা করেছেন সৌরজগতের উৎপত্তি, পৃথিবীর বয়স, আকাশ-তরঙ্গ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। বিজ্ঞানের দর্শন নিয়ে সত্য, জগতের অস্তিত্ব, আত্মার অবিনাশিতা, অমঙ্গলের উৎপত্তি, নিয়মের রাজত্ব বিষয়গুলি আলোচনা করেছেন 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে। 'কর্মকথা'ও দার্শনিক প্রবন্ধগ্রন্থ। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব ও পরিভাষা নিয়ে 'শব্দকথা' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন রসায়নের অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, ম্যাক্সমূলার প্রমুখ আটজন মনীষীর জীবনী নিয়ে লেখা 'চরিতকথা'। প্রাবন্ধিকের সুগভীর স্বাদেশিকতাবোধের পরিচয় পাই তাঁর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'তে। প্রকাশভঙ্গিতে এসেছে কবিত্ব। তার ফলে এর ভাষা হয়ে উঠেছে ভক্তির আবেগে নমনীয়। প্রাবন্ধিক লিখছেনঃ ''মা লক্ষ্মী কৃপা কর। কাঞ্চন দিয়ে কাচ নেব না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পরবো না। ঘরের থাকতে পরের নেব না।''

খুব প্রত্যাশিতভাবেই রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা বেশি নয়। কিন্তু যেটুকু আছে তার মধ্যে প্রাবন্ধিকের রসবোধের গভীরতা ও চিন্তার মৌলিকতা বেশ বুঝতে পারা যায়। অন্যদিকে তাঁর দার্শনিক প্রবন্ধগুলিতে পাই চিন্তার গভীরতা, যুক্তিবোধ, সিদ্ধান্তের মৌলিকতা এবং এক গাম্ভীর্যময় সরলতা। অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত রামেন্দ্রসুন্দরের উপস্থাপনভঙ্গির কৌশলের কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেনঃ ''রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায় যেমন গাম্ভীর্যের সঙ্গে সাবলীলতার সমন্বয় ঘটেছে তেমনি কৌতুক হাস্যের স্মিতস্পর্শ তাকে বিস্ময়কর সৌন্দর্য দান করেছে। দুরূহ গাম্ভীর্যপূর্ণ বিষয়ে ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গিতে আদ্যন্ত কৌতুকের সুর রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষার উপর পরিপূর্ণ অধিকার এবং প্রজ্ঞাবান কিন্তু প্রসন্ন ও সরস চিত্ত এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে।'' রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল দৃষ্টান্তপ্রবণতা। আসলে বক্তব্যকে সাবলীলতা দান করার জন্যই তিনি এদিকে ঝুঁকেছেন। আবার তথকথিত দর্শনের অধ্যাপক না হয়েও তাঁর গদ্যে পাই নৈয়ায়িক রীতি। 'অমঙ্গলের উৎপত্তি' রচনা থেকে উদ্ধৃতিঃ ''এক বল, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান; তাহা হইলে তিনি দয়াময় নহেন। অথবা বল, তিনি দয়াময়; তাহা হইলে তিনি পূর্ণশক্তি নহেন।'' যুক্তিবাদী এই গদ্যকারের লেখাতেই আবার পাই উচ্চাঙ্গের হাস্যরসের ছোঁয়া ; তিনি লেখেনঃ ''যদি কোন প্রকাশ্য বৈজ্ঞানিক আসিয়া হঠাৎ প্রতিপন্ন করিয়া দেন যে, ভূত আছে ও তাহার পা বাঁকা, তাহা হইলে মন যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে।'' এই গাম্ভীর্য ও কমনীয়তার গুণেই রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ সাহিত্যের জগতে উত্তীর্ণ।

২১.৫ সারাংশ

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ রচনার হাতেখড়ি খুব কম বয়সেই। শুরুতেই 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, দুঃখ সঙ্গিনী ও অবসর সরোজিনী'-র সমালোচনা, পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের নিয়ে প্রবন্ধ রচনা, 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর সমালোচনা —এ সবের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথের চিন্তার জগৎ প্রসারিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, স্বদেশ ও সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধ, শিক্ষা-ধর্ম-দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ, সৃজনশীল প্রবন্ধ, আত্মজীবনীমূলক প্রবন্ধ, ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থ ও পত্রাবলি — এ জাতীয় নানা বিষয়ের প্রবন্ধ রচনা করে তিনি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই সমস্ত রচনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ, কৌতূহল, বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা, মননশীলতা ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। এর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বস্তুনিষ্ঠ রচনারীতির পরিচয় পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে এ জাতীয় রচনার মধ্য দিয়ে তিনি সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করেছেন।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে সৃজনশীল ও মননশীল সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে যারা যুক্তি শৃঙ্খলিত বক্তব্যকে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেছেন, তাদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অন্যতম। বিজ্ঞান বিষয়ে মেধাবী এই প্রাবন্ধিক দর্শন ও সাহিত্যে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর যে সমস্ত লেখা প্রকাশিত হত তার মধ্য দিয়েই প্রাবন্ধিকের মননশীলতার যথার্থতা ফুটে উঠেছে।

২১.৬ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনায় রবীন্দ্রনাথের অবদান আলোচনা করুন।

২) রবীন্দ্রনাথের প্রাবন্ধিক সত্তার তৃতীয় পর্বের বিস্তৃত পরিচয় দিন।

৩) সাহিত্য-সমালোচক রবীন্দ্রনাথের পরিচয়টি পরিস্ফুট করুন।

৪) শিক্ষা-সমাজ-রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের পরিচয় দিন।

৫) বাংলা সাহিত্যে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের অবস্থানটি ব্যাখ্যা করুন।

৬) বাংলা আত্মকথন ধারায় 'জীবনস্মৃতি', 'ছেলেবেলা' এবং 'আত্ম-পরিচয়' রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য সৃষ্টি—আলোচনা করুন।

৭) রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বিষয়ক গদ্য রচনাগুলির পরিচয় দিন।

৮) শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তার বহুমাত্রিকতা প্রকাশ পেয়েছে— আলোচনা করুন।

৯) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রবন্ধের বিষয় ও প্রকরণ কৌশল আলোচনা করুন।

১০) রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধে তাঁর রসবোধের গভীরতা ও চিন্তার মৌলিকতা প্রকাশ পেয়েছে—আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বলতে কী বোঝায়? রবীন্দ্রনাথের দুটি এ ধরনের রচনার উদাহরণ দিন।

২) রবীন্দ্রনাথের তিনটি সাহিত্য-সমালোচনামূলক গ্রন্থের নামোল্লেখ করুন।

৩) রবীন্দ্রনাথের প্রাবন্ধিক সত্তার প্রথম পর্বের প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির নাম লিখুন।

৪) 'পঞ্চভূত'-এর পরিচয় দিন।

৫) 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কী বোঝাতে চেয়েছেন?

৬) রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণমূলক কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম লিখুন।

৭) 'সভ্যতার সংকট'-এ রবীন্দ্রনাথ কী বলতে চেয়েছেন?

৮) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কোন ধরনের প্রবন্ধ রচনায় সাফল্য দেখিয়েছেন?

৯) 'মহাশক্তি' প্রবন্ধের বিষয়বস্তু রামেন্দ্রসুন্দরের অনুসরণে লিখুন।

১০) রামেন্দ্রসুন্দরের 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের পরিচয় দিন।

২১.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (৫ম খণ্ড)—সুকুমার সেন।

২) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস — সজনীকান্ত দাস।

৩) বাংলা সাহিত্যে গদ্য — সুকুমার সেন।

৪) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৬-৮) — অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫) বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (৩-৪) — ভূদেব চৌধুরী।

৬) বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস — ক্ষেত্র গুপ্ত।

একক-২২ ❑ প্রমথ চৌধুরী, গোপাল হালদার, সৈয়দ মুজতবা আলী, বুদ্ধদেব বসু

গঠন

২২.১. উদ্দেশ্য
২২.২ প্রস্তাবনা
২২.৩ প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী
২২.৪ প্রাবন্ধিক গোপাল হালদার
২২.৫ প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতবা আলী
২২.৬ প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু
২২.৭ সারাংশ
২২.৮ অনুশীলনী
২২.৯ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

২২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটির মাধ্যমে শিক্ষার্থী বিশ শতকের নির্বাচিত চারজন বাঙালি সাহিত্যিকের মননশীলতার পরিচয় জানতে পারবেন। লেখকদের প্রাবন্ধিক সত্তার পরিচয় থাকবে এখানে। প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতি সম্পর্কে জানতে পারবেন। কীভাবে বীরবল বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ রীতির প্রবর্তন করেন সেটাও। গোপাল হালদারের রাজনৈতিক মতাদর্শ, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হওয়া, বিভিন্ন গ্রন্থের লেখক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করা কিম্বা পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুসরণ ইত্যাদি বিষয়ে জানা যাবে। বহুভাষাবিদ সৈয়দ মুজতবা আলীর সাহিত্য চর্চার বিষয় বৈচিত্র্য সম্পর্কে জানা যাবে। তাঁর বহুদেশ ভ্রমণের ভাবনার কথা কীভাবে সাহিত্যের পাতায় উঠে এসেছে সে সম্পর্কেও নানা তথ্য জানা যাবে। বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসু আধুনিক যুগের প্রবক্তা। পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থেকে কীভাবে তিনি সেটা করলেন তাও শিক্ষার্থীরা এই একক থেকে জানতে পারবেন। কীভাবে তাঁর রচিত প্রবন্ধ তাঁর প্রতিভার দীপ্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে সে সম্পর্কেও একটা ধারণা পাওয়া যাবে এখান থেকে।

২২.২ প্রস্তাবনা

প্রমথ চৌধুরীর অধিকাংশ রচনা ‘সবুজপত্র’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সাহিত্য ধারায় তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুবর্তী ছিলেন না। তিনি বীরবলী রীতির প্রবর্তক। রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর ভাষা ও বাগ্‌রীতির প্রশংসা করেছিলেন। গোপাল হালদার পূর্ববঙ্গের ভাষা বিষয়ে গবেষণা করেন। অনেকগুলো সমালোচনামূলক গ্রন্থ রচনা করে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। দেশ পত্রিকায় ‘দেশে-বিদেশে’ ভ্রমণ কাহিনি লিখে সৈয়দ মুজতবা আলী খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর লেখায় বৈচিত্র্য আছে। রম্যরচনা জাতীয় রচনায় বিচিত্র বিষয় বিচিত্র ভঙ্গিতে প্রকাশ

করেছেন। তাঁর পাণ্ডিত্য স্মরণ করার মতো। বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ বুদ্ধিদীপ্ত ও মননশীল। তাঁর সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি লেখকের নিজস্ব ভাবনায় সমৃদ্ধ। তাঁর রচিত 'কালের পুতুল' বাংলা সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিচিত্র বিষয়কে অবলম্বন করে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসু আজও চির ভাস্বর।

২২.৩ প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮ - ১৯৪৬) এক স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য এই মানুষটি কবিতা লিখেছেন। 'সনেট পঞ্চাশত্' তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা-সংকলন। একাধিক গল্পগ্রন্থের রচয়িতা প্রমথ চৌধুরী। 'চার ইয়ারী কথা' তাঁর সুপরিচিত গল্পগ্রন্থ। 'সবুজপত্র'এর মতো পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। রচনা করেছেন অনেকগুলি প্রবন্ধগ্রন্থ। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী নিছক কবি বা গল্পকার বা পত্রিকা-সম্পাদক বা প্রবন্ধকার ছিলেন না; শাণিত বক্তব্যে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিশশতকীয় নাগরিকতার ভাষ্যকার। 'বীরবল' ছদ্মনামে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অমোঘ। 'বীরবলী-স্টাইল' হয়ে ওঠে তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্য নাম।

প্রমথ চৌধুরী জন্মেছিলেন অবিভক্ত বাংলার পাবনার এক প্রসিদ্ধ জমিদার পরিবারে। পড়াশোনা করেছেন কলকাতার হেয়ার স্কুলে, প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। দর্শন ও ইংরেজি সাহিত্যে উচ্চশিক্ষার পর বিলেত থেকে পাশ করে এলেন ব্যারিস্টারি। কলকাতা হাইকোর্টে কিছুদিন প্র্যাকটিস করেছিলেন। আইন বিষয়ে অল্পকাল অধ্যাপনাও করেছিলেন। ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যে সুপণ্ডিত মানুষটি শেষপর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন সাহিত্যচর্চায়। ইতিমধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কে যুক্ত হয়ে পড়েন উনিশ শতকের বঙ্গসংস্কৃতির পাদপীঠ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে; হলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা, ইন্দিরা দেবীর স্বামী। এলেন রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে।

প্রমথ চৌধুরীর প্রথম প্রবন্ধ 'জয়দেব' প্রকাশিত হয় ১২৯৭ সালের 'ভারতী' পত্রিকায়। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি হল 'তেল-নুন-লকড়ি' (১৯০৬), 'বীরবলের হালখাতা' (১৯১৭), 'নানাকথা' (১৯১৯) 'বীরবলের টিপ্পনী' (১৯২১), 'নানা চর্চা' (১৯৩২), 'বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়' (১৯৩৪), 'প্রাচীন হিন্দুস্থান' (১৯৪০) ইত্যাদি। দর্শন, ইতিহাস, ভাষা-সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন প্রমথ চৌধুরী। তাঁর সব রচনাতেই রয়েছে তীক্ষ্ণ মৌলিকতার চিহ্ন। বিষয়ের ভেতরে বিতর্কের ভঙ্গিতে ঢুকে তার প্রাণকেন্দ্রটিকে আবিষ্কার করার ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরী অদ্বিতীয়। অধ্যয়নের প্রাচুর্য এবং জ্ঞানের গভীরতা প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করার কথা ছিল, তা করেনি,বরং ধারালো করে তুলেছে। অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরীর মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছেনঃ ''প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের মূল্য তাঁর সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের গ্রহণযোগ্যতার উপরে নয়। তিনি তাঁর মতামতকে বটিকার আকারে পরিবেশন করতে চান না। জ্ঞানদান তাঁর লক্ষ্য নয়,ভাবনা জাগিয়ে তোলায় তাঁর কৃতিত্ব। এই কারণেই অধিকাংশ প্রবন্ধের বক্তব্য বিতর্কমূলক।'' তবে তাঁর বক্তব্য-বিষয় নয়, 'যা প্রথম থেকে পাঠকের মনকে সজাগ মুগ্ধ রাখে তা হল বিচার ও আলোচনার প্রকাশের ভঙ্গি। আর এই ভঙ্গির অন্যতম হাতিয়ার হল শাণিত দীপ্তির গদ্য। এই গদ্যের বিশেষ রীতিই তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। সঙ্গতভাবেই তিনি বলেনঃ ''আমি রূপায়িত করি শুধু নিজেকে, আমার রচনার বিষয় আমি নিজে।'' তাঁর গদ্যরীতির একটি নমুনাঃ ''মন্ত্র সাপকে মুগ্ধ করতে পারে কি না জানি নে, কিন্তু মানুষকে যে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ গোটা ভারতবর্ষ।'' কিংবা 'বইপড়া' প্রবন্ধ থেকেঃ ''জ্ঞানের ভাণ্ডার যে ধনের ভাণ্ডার নয়, এ সত্য তো প্রত্যক্ষ, কিন্তু সমান প্রত্যক্ষ না হলেও এও সমান সত্য যে এ যুগে যে জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য, সে জাতির ধনের ভাঁড়েও ভবানী।'' প্রমথ চৌধুরীর গদ্যে আমরা পাই

প্রগতিশীল যুক্তিবাদিতা, মননশীলতা, তির্যক বাচনভঙ্গি বা উজ্জ্বল ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরস এবং এক নাগরিক বৈদগ্ধতা। বীরবল — অতীতকালের এই বিশিষ্ট মানুষটি কৌতুক-ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে জীবন ও সমাজের কঠিন সত্যকে ব্যক্ত করেছিলেন। বীরবলের অনুরাগী প্রমথ চৌধুরী 'বীরবল' নাম নিয়ে সেই কাজটি করতে চেয়েছিলেন। নিজেই জানিয়েছেন, বীরবলের নাম গ্রহণ করে... আমি বাঙালি জাতির বিদূষক মাত্র।

সাহিত্য সমালোচক হিসেবে প্রমথ চৌধুরীর একটি স্বতন্ত্র স্থান রয়েছে। তিনি মনে করতেন ভাবের প্রাধান্য নয়, তার রূপনির্মিতিই সাহিত্যিকের মূল লক্ষ্য এবং সাহিত্যিকের প্রখর বস্তুজ্ঞানের উপরেই সাহিত্যের রূপনির্মাণ নির্ভর করে। শেষ পর্যন্ত তিনি এবিষয়ে চেয়েছেন লেখকের একনিষ্ঠ সাধনা। সাহিত্য সমালোচক হিসেবে তাঁকে রূপবাদী বলা যেতে পারে। তিনি কখনোই প্রচারমুখী নন, তাঁর সাহিত্য 'কস্মিনকালেও স্কুলমাস্টারির ভার নেয়নি'। রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য প্রমথ চৌধুরী এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মতোই কলাকৈবল্যবাদী। তিনি স্পষ্টতই বলেনঃ ''সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া,কারো মনোরঞ্জন করা নয়।''

বাংলা গদ্যের বিবর্তনে প্রমথ চৌধুরীর ঐতিহাসিক ভূমিকা অনস্বীকার্য। 'সবুজপত্র'(১৯১৪) সম্পাদনাকে সামনে তিনি একাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। বলাবাহুল্য তার পিছনে ছিল রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ অনুপ্রেরণা। সাহিত্যে সবরকমের ভাবপ্রকাশে চলিতভাষা প্রবর্তনের পক্ষে জোরদার সওয়াল করল 'সবুজপত্র'। আসলে ভাষাকে গুরুগম্ভীর শব্দ, অলংকৃত বাগ্‌বাহুল্য এবং সাধুক্রিয়াপদের প্রাচীনত্বের মধ্যে আটকে রাখলে আধুনিক যুগচিন্তা যে যথার্থভাবে প্রকাশ করা যাবে না, তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন নির্ভুলভাবে। প্রমথ চৌধুরীও প্রথম দিকে সাধুগদ্যে লিখতেন। ১৩০৯ থেকে তিনি চলিত ভাষায় লিখতে শুরু করেন। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় চলিতভাষার সমর্থনে দুটি প্রবন্ধ লেখেন প্রমথ চৌধুরী। প্রবন্ধ দুটি হল 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা' এবং 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা'। প্রমথ চৌধুরীর এই 'চলিত ভাষা আন্দোলন' বঙ্গসংস্কৃতিতে মান্যতা পেল বলা যায়। রবীন্দ্রসাহিত্যেও ভাষারীতিগত পরিবর্তন এল। সাহিত্যের মাধ্যম হিসেবে তিনিও গ্রহণ করলেন চলিতরীতির গদ্যকে। চলিতরীতির গদ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬), 'যোগাযোগ' (১৯২৯) এর মতো উপন্যাস। নিছক গদ্যরীতিগত পরিবর্তন নয়, 'সবুজপত্র' ছিল জীবনদৃষ্টি পরিবর্তনের প্রবক্তা— বিদ্রোহচেতনার উজ্জ্বল প্রকাশ। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এক বিদগ্ধ সাহিত্যিক গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীতে ছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, অমিয় চক্রবর্তী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁরা সংখ্যায় কম ছিলেন নিঃসন্দেহে; কিন্তু প্রমথ চৌধুরী ও তাঁর ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিতদের আন্তরিক উদ্যোগে বাংলাসাহিত্য থেকে ক্রমশ বিদায় নিল এতদিনকার অলঙ্কারবহুল, জাঁকজমকপূর্ণ গদ্যরীতি ; এল তির্যক, সরস, বুদ্ধিমার্জিত, শাণিত গদ্য। বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর এটা একটা বড়ো দান বলা যায়।

২২.৪ প্রাবন্ধিক গোপাল হালদার

গোপাল হালদার (১৯০২ - ১৯৯৩) বিশ শতকের একজন মননশীল সাহিত্যিক। তাঁর লেখা ত্রয়ী উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং একসময় তা আলোড়ন তুলেছিল। উপন্যাসগুলি হল 'একদা'(১৯৩৯), 'অন্যদিন'(১৯৫০) এবং 'আর একদিন'(১৯৫১)। গোপাল হালদারের আর একটি ট্রিলজি বা এই ধরনের ত্রয়ী উপন্যাস রয়েছে।উপন্যাস তিনটি হল 'পঞ্চাশের পর' 'ঊনপঞ্চাশী' ও 'তেরশ পঞ্চাশ'। বলাবাহুল্য গোপাল হালদার কোনো জনপ্রিয় সাহিত্যিক ছিলেন না। পেশাগত জীবনে অধ্যাপনা করেছেন,সাংবাদিকতা করেছেন। কিন্তু মন ও

মননের দিক থেকে ছিলেন একজন সময়সচেতন, সমাজমনস্ক রাজনৈতিক কর্মী। সাম্যবাদী দর্শনে ছিল তাঁর প্রগাঢ় আস্থা। এই জায়গা থেকে তিনি প্রবন্ধ রচনায় হাত দিয়েছেন এবং বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন, বলা যায়।

গোপাল হালদার জন্মেছিলেন তখনকার পূর্ববঙ্গের ঢাকা-বিক্রমপুরের একগ্রামে। ছাত্রজীবনের শুরু হয় আইনজীবী পিতার কর্মস্থল নোয়াখালিতে। উচ্চশিক্ষা কলকাতায়। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ইংরাজিতে অনার্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজিতে স্নাতকোত্তর পাশ করেন। আইন পরীক্ষাতেও পাশ করেন কৃতিত্বের সঙ্গে। বি.সি.এসও পাশ করেছিলেন ; যদিও স্বাস্থ্যের কারণে আর অগ্রসর হতে পারেননি। পিতার মতোই ওকালতি দিয়ে শুরু করেছিলেন কর্মজীবন। পরে ওকালতি ছেড়ে দিয়ে কলকাতার ইংরাজি সাপ্তাহিক 'ওয়েলফেয়ার'এর সহসম্পাদকের পদে যোগদান করেন। কলেজ অধ্যাপনায় যুক্ত হয়েছেন ১৯২৯ নাগাদ। জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে নোয়াখালির উপভাষা নিয়ে কাজ শুরু করেন। ১৯৩৮ নাগাদ 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে কাজ নিয়েছেন। ক্রমশ জড়িয়ে পড়েন বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে। তাঁর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে বলিষ্ঠভাবে।এর জন্য তাঁকে জেলও খাটতে হয়েছে। সুভাষচন্দ্র বসুর 'ফরোয়ার্ড ব্লক' এবং 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার সহসম্পাদক পদেও কাজ করেছেন। 'পরিচয়' পত্রিকা প্রথমে সহসম্পাদনা ও পরে সম্পাদনার দায়িত্ব সামলেছেন। জীবনের বেশ কিছুটা অংশ জেলের মধ্যে কাটালেও তাঁর লেখালেখি থামেনি বা এই কারণে তাঁর লেখালেখির পরিমাণ কমে যায়নি। তিনি নিয়মিত লিখতেন তখনকার 'প্রবাসী', 'শনিবারের চিঠি' বা 'প্রগতি'র মতো পত্রিকায়। তাঁর সৃজনশীল সাহিত্যের আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক নয় ,তাই তা উল্লেখ করছি না। গোপাল হালদারের প্রবন্ধগ্রন্থের সংখ্যা কমপক্ষে বাইশ। এর বাইরে আছে দুখণ্ডে লেখা আত্মকথা 'রূপনারাণের কূলে' এবং ইংরেজিতে লেখা গবেষণা-নিবন্ধ।

গোপাল হালদারের লেখা বাইশটি প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক বই, সাহিত্যিকদের নিয়ে লেখা বই আর ভাষা-সংস্কৃতি-সমাজ-রাজনীতি সম্বন্ধীয় কতকগুলি বই। তিনটি ভাষার সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন গোপাল হালদার। বইগুলি হল 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা' (দুখণ্ড ১৯৫৩ ও ১৯৫৮),' ইংরেজি সাহিত্যের রূপরেখা'(১৯৬১), 'রুশ সাহিত্যের রূপরেখা'(১৯৬৬)। লিখেছেন 'বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা'(১৯৬১)। গোপাল হালদারের সাহিত্যের ইতিহাস রচনা পদ্ধতি স্বতন্ত্র ; যার মূলে রয়েছে রচয়িতার বস্তুবাদী-যুক্তিবাদী মন-মনন। সাধারণত সাহিত্যের ইতিহাস মানে সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্মের খতিয়ান ও বিশ্লেষণ। কিন্তু গোপাল হালদারের সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাধান্য পেয়েছে আর্থ-সামাজিক পটভূমি। এই পটভূমির সঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতির সম্পর্ক নির্ণয়ে জোর দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি তিনি ভুলে যান না সাহিত্য মূলত ব্যক্তির সৃষ্টি। আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রাঞ্জল। এর দরুন সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ইতিহাসে একটি ব্যতিক্রমী স্থান রয়েছে গোপাল হালদারের। বাংলা সাহিত্যের তিন প্রখ্যাত সাহিত্যিককে নিয়ে তিনটি সমালোচনা গ্রন্থ রয়েছে তাঁর। যথা — 'কাজী নজরুল ইসলাম'(১৯৬২), 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত'(১৯৬২) এবং 'সতীনাথ ভাদুড়ীঃ সাহিত্য ও সাধনা'। যুগন্ধর ব্যক্তিত্ব বিদ্যাসাগরকে নিয়ে গোপাল হালদারের দুটি বই রয়েছে ; একটি ইংরেজিতে আর একটি বাংলায়, নাম 'প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর'।

সংস্কৃতির নানাদিক নিয়ে অনেকগুলি বই লিখেছিলেন গোপাল হালদার। যেমন — 'সংস্কৃতির রূপান্তর' (১৯৪১), 'সংস্কৃতির বিশ্বরূপ', 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ' (১৯৪৭), 'বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ' (১৯৫৬), 'ভারতের ভাষা' (১৯৬৭), 'বাঙালীর আশা বাঙালীর ভাষা' (১৯৭২), 'জাতীয় সংহতি ও ভারতের ভাষাসমস্যা' ইত্যাদি। আসলে

সংস্কৃতির যে কোনো একটি দিককে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস এমন কী ভূ-প্রকৃতি ও নৃতাত্ত্বিক প্রবণতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার প্রয়াস থেকেই সংস্কৃতি বিষয়ক লেখালেখিতে এতটা মনোযোগী হতে পেরেছিলেন গোপাল হালদার। তবে তাঁর লেখায় ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বিশ্বাস বা তাত্ত্বিক অবস্থান একেবারে স্পষ্ট ; কোনো আড়ালের আশ্রয় তিনি নেননি। সাম্যবাদের আদর্শ তাঁর লেখায় অকপটে প্রকাশ পেয়েছে। 'সংস্কৃতির বিশ্বরূপ' গ্রন্থে তিনি লিখেছেনঃ '' কমিউনিজম এ যুগের মানবতার নাম।''সংস্কৃতির রূপান্তর'গ্রন্থে তিনি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন সংস্কৃতির রূপান্তরের বিষয়টি। তাঁর মতে,সংস্কৃতি হল শিল্প সাহিত্য সংগীত ইত্যাদির সঙ্গে মানবজীবনের সম্পর্ক। এর থেকে মনে হতেই পারে গোপাল হালদারের সব বই-ই প্রায় মার্কস্‌বাদের শিল্পভাষ্য।

'রূপনারানের কূলে'(দুখণ্ড —১৯৬৯ ও ১৯৭৯) গোপাল হালদারের আত্মজীবনীমূলক রচনা। রচনাটিকে প্রবন্ধ-সাহিত্যের মধ্যে ধরা যায়। মূলত এতে ধরা পড়েছে রচয়িতার রাজনৈতিক জীবন এবং সেই সূত্রে স্বাধীনতার সমকালে ভারতীয় রাজনীতির প্রায় সম্পূর্ণ চালচিত্র। এই রচনার পিছনে লেখকের নিরাসক্ত দৃষ্টি যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে একটি স্বচ্ছ ঐতিহাসিক বোধ। বিশেষত দ্বিতীয় খণ্ডে আত্মকথার তুলনায় মূল্যবান হয়ে উঠেছে বিশ শতকের শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতি-সমাজনীতি সম্পর্কে নানা প্রামাণ্য তথ্য ; যার এই অংশে বইটি জীবনীগ্রন্থের তুলনায় ঢের বেশি হয়ে উঠেছে সেই সময়ের সমাজেতিহাসের দলিল।

২২.৫ প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতবা আলী

বাংলা ভাষার চিন্তনমূলক সাহিত্য ও কথাসাহিত্যের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪) এক স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি যেমন একদিকে ছোটোগল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনি, রম্যরচনা, প্রবন্ধ রচয়িতা, অন্যদিকে তিনি প্রখ্যাত ভাষাবিদ। গবেষণা করেছেন তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব নিয়ে। অধ্যাপনা করেছেন, অধ্যক্ষতা করেছেন। ভ্রমণ করেছেন বহু দেশ। বহু বিচিত্র মানুষের সান্নিধ্যে এসেছেন। লাভ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহ-সান্নিধ্য ও আশীর্বাদ। সবমিলে সৈয়দ মুজতবা আলীর জীবন অভিজ্ঞতা অনন্য বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ; যার রসময় প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কলমে। এখানে আমরা প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতবা আলীর পরিচয় প্রসঙ্গে আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

সৈয়দ মুজতবা আলী জন্মেছিলেন অবিভক্ত বাংলার সিলেটের করিমগঞ্জে। বাবা ছিলেন সিলেটের হবিগঞ্জের সাব-রেজিস্ট্রার। বাবার কর্মস্থল পরিবর্তনের কারণে তাঁকেও পড়তে হয়েছে নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। শেষপর্যন্ত এলেন রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে। ১৯২১—১৯২৬ এই পাঁচ বছর পড়েছিলেন। বহু ভাষা শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন এখানে। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে শেখেন সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, হিন্দি, গুজরাটি, ইতালিয়ান, ইংরাজি, ফরাসি এবং জার্মান। পারিবারিক সূত্রে উর্দু আগে থেকেই জানতেন। বিশ্বভারতী ছাড়া পড়েছিলেন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়, মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় এবং জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়ে। পড়িয়েছেন কাবুলের কৃষিবিজ্ঞান কলেজ, বরোদা কলেজ, বগুড়ার কলেজ। অংশকালীন অধ্যাপক হিসেবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বভারতীতে। অল ইন্ডিয়া রেডিওর কর্মকর্তা হিসেবেও কাজ করেছেন। লেখালেখির সূত্রপাত শান্তিনিকেতনের ছাত্রজীবনে; হাতে লেখা বিশ্বভারতী পত্রিকায়। পরে হয়ে ওঠেন আনন্দবাজার, দেশ, সত্যযুগ, শনিবারে চিঠি, বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকার কলামিস্ট। লিখতেন অবশ্য সত্যপীর, ওমরখৈয়াম, প্রিয়দর্শী ছদ্মনামে। স্বনামে নিয়মিত লেখক হিসেবে তাঁকে পাই চতুরঙ্গ, মাতৃভূমি, কালান্তর, মোহাম্মদী, আল-ইসলাহ্ ইত্যাদি পত্রিকায়।

সৈয়দ মুজতবা আলীর মোট গ্রন্থের সংখ্যা তিরিশ। এর মধ্যে রয়েছে উপন্যাস, ছোটোগল্প, ভ্রমণকাহিনি, রম্যরচনা এবং প্রবন্ধ। এখানে আমরা তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যের আলোচনায় রাখছি তাঁর প্রবন্ধ ও রম্যরচনাকে। মুজতবা আলীর প্রবন্ধসাহিত্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা —রসনিবন্ধ, ব্যক্তিগত নিবন্ধ এবং বস্তুনির্ভর প্রবন্ধ। 'পঞ্চতন্ত্র'(১৯৫২) আমাদের বিচারে রসনিবন্ধগ্রন্থ। এর বেশিরভাগ নিবন্ধই সমকালীন ঘটনার অভিঘাতে রচিত। কিন্তু আলী সাহেবের পরিবেশনা-কৌশলে রচনাগুলি সমকালীনতাকে অতিক্রম করে হয়ে উঠেছে চিরকালের সাহিত্য। একটি ভাবনাকে হাস্যপরিহাসে, বাগ্‌বৈদগ্ধে এবং মননশীলতায় আকর্ষণীয় ভাবে প্রকাশ করাই হল রম্যরচনা বা রসনিবন্ধ জাতের রচনার বৈশিষ্ট্য। বিভিন্নদেশের অভিজ্ঞতা, বিদেশের কাফে-রেস্তোরাঁ, জাহাজ ভ্রমণের কথা এবং বিচিত্র মানুষজন— এসব বিষয় অত্যন্ত মনোরম ভাবে এবং কৌতুকচ্ছলে বর্ণনা করেছেন লেখক। বর্ণনার বিষয়েও বৈচিত্র্য কম নেই।

ব্যক্তিগত নিবন্ধে থাকে রচয়িতার ব্যক্তিমনের নিবিড় পরিচয়। এই ধরনের রচনার উদাহরণ হিসেবে আলী সাহেবের 'সুখী হবার পন্থা', 'শেষ চিন্তা', 'আড্ডা' প্রভৃতি রচনার কথা বলা যায়। সুখী কেমন করে হওয়া যায়, এবিষয়ে নানা মনীষীর নানা বক্তব্য তিনি আলোচনা করেছেন। শেষে আছে একটি সংস্কৃত শ্লোক। শ্লোকের তাৎপর্য ব্যাখ্যার পর আলী সাহেব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মন্তব্য তথা সিদ্ধান্তঃ এই শ্লোক নিশ্চয়ই বাঙালির রচনা নতুবা মাছের মর্যাদা বুঝবে আর কোন জাতি। 'শেষ চিন্তা' য় আছে সাহিত্য সম্পর্কে লেখকের আপন চিন্তার মনোজ্ঞ উপস্থাপন। সাহিত্য সম্পর্কে কোনো তত্ত্ব নির্মাণ করেননি তিনি। 'আড্ডা' রচনাটি শুরু হয়েছে উত্তম পুরুষের জবানিতে।সমাপ্তিতে আছে আড্ডাসুলভ গল্প। আড্ডা কী,কী তার বিশেষত্ব, তা নিয়ে রসস্নিগ্ধ আলোচনা আলি সাহেবের পক্ষেই সম্ভব। 'বইকেনা' এই জাতের বিখ্যাত রচনা। বইয়ের প্রয়োজনীয়তা যেমন সরসভঙ্গিতে করেছেন, তেমনই মনোরম ব্যঙ্গে তুলে ধরেছেন বাঙালির বই-বিমুখতার কথা।

মুজতবা সাহেব বেশ কিছু বিষয়-নির্ভর প্রবন্ধও রচনা করেছেন। যদিও রচয়িতার সরস বাচনভঙ্গি গুণে সেই সব রচনাও হয়ে উঠেছে উপভোগ্য। এই ধরনের প্রবন্ধের সামগ্রী হিসেবে আমরা পাই সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে আলোচনা, ভাষা সমস্যার মতো রাজনৈতিক বিষয়, পৃথিবীর ইতিহাসের কুখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক হিটলারের কথা। এ বিষয়ক গ্রন্থগুলির মধ্যে 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' (১৩৬৩), 'হিটলার' (১৩৭৭), 'গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন'(১৩৮৮) উল্লেখযোগ্য। 'কবিরাজ চেখফ' নামের প্রবন্ধটিতে রয়েছে রুশ লেখক আন্তন চেখফ-এর জীবনকথা ও তাঁর সাহিত্যের মূল্যায়ন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলী সাহেবের অকপট শ্রদ্ধার্ঘ্যের পরিচয় পাই 'গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে। লিখেছেনঃ ''আমাদের কাছে তিনি যে ছিলেন স্নেহাসক্ত গুরু, নিতান্তই মাটির মানুষ। কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করাও যে দুঃসাধ্য। হিমালয়ের পাদমূলে বসে বিচিত্র পুষ্পচয়নকালেও ক্ষণে ক্ষণে গৌরী-শিখরের বিরাট বিশাল গম্ভীর মহিমা হৃদয়কে নির্বাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিয়েছে।'' তাঁর নাৎসি নির্যাতন সম্পর্কিত লেখাগুলিতে ঋজু ভাষায় তুলে ধরেছেন হননোত্‌সবের সেই হৃদয়হীন দিনগুলি আবার 'হিটলারের প্রেম' প্রবন্ধে জীবন্ত করে তুলেছেন ব্যক্তি হিটলারকে। সমকালীন রাজনীতি নিয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনাতে পাই একাত্তরের যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের লিপিচিত্রণ। এছাড়া আলী সাহেবের বেশ কতকগুলি অভিভাষণ নিবন্ধ রয়েছে। যেমন— 'বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী শব্দ', 'বাঙালী মুসলমানের ভবিষ্যৎ সাহিত্য', 'মিশরের বিদ্যায়তন', 'সাহিত্য ও কালচার', 'মুসলিম সংস্কৃতির হেরফের', 'মরহুম কবি আব্দুর রাজ্জাক' ইত্যাদি।

সুতরাং আমরা বলতে চাই, মুজতবা সাহেব শুধু জনপ্রিয় কথাশিল্পী নন; হৃদয়হরণকারী শব্দশিল্পী। এর মূল রহস্য অবশ্যই তাঁর উপস্থাপন-কৌশল। তাঁর ভাষা গম্ভীর নয়,অথচ চটুলও নয়। ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে যে

কোনো শব্দের ব্যবহারে তাঁর কোনো ধরনের ছুৎমার্গ নেই। তিনি অবলীলায় লিখতে পারেন, 'আড্ডা প্রতিষ্ঠানটি হালফিল পুরোহাতা ব্লাউজের মতো ডাইয়িং ইন্ডাস্ট্রি —মৃতপ্রায়'। হালকা মেজাজে আড্ডার ঢঙে বলে গেলেও তাঁর অধিকাংশ রচনা জ্ঞান,অভিজ্ঞতা,শাস্ত্রচর্চা ও বিচার-সমালোচনায় পরিপূর্ণ। আন্তর্জাতিক চেতনায় সমৃদ্ধ এই লেখকের বিশ্বমানবিকতা, অসাম্প্রদায়িকতা এবং অননুকরণীয় রচনাশৈলী বাংলা সাহিত্যে তাঁকে বিশেষ সম্মানের অধিকারী করেছে বলা যায়।

২২.৬ প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) রবীন্দ্র-পরবর্তী এক বহুমুখী সাহিত্য প্রতিভা। কবি্, ছোটোগল্পকার, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও পত্রিকা-সম্পাদক রূপে যেমন তাঁর পরিচিতি, তেমনই তিনি সাহিত্য-সমালোচক তথা প্রাবন্ধিক হিসেবেও খ্যাত। শুধু খ্যাত বললে ঠিক বোঝানো যায় না। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুর এক স্বতন্ত্র ও সম্মানিত স্থান রয়েছে। এখানে আমরা তাঁর প্রাবন্ধিক-সত্তার পরিচয় প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে চাই।

বুদ্ধদেব বসু জন্মেছিলেন ঢাকার মালখানগড়ের বিখ্যাত বসু পরিবারে। জন্মমুহূর্তে মা-হারা বুদ্ধদেবের জায়গা হয় দিদিমা ও দাদামশাইয়ের কাছে। শিক্ষা শুরু হয় ঢাকাতে। মেধাবী বুদ্ধদেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। কর্মজীবন শুরু করেন কলকাতায় কলেজ-অধ্যাপক রূপে। সহকর্মীরূপে পেয়েছিলেন কবি বিষ্ণু দে ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতো মানুষদের। 'দ্য স্টেট্স্‌ম্যান'এর মতো পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। ফিরে এসেছেন অধ্যাপনায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ। কর্মজীবনে সুস্থিরতা কোনোদিনই আসেনি নানাকারণে। বিদেশের নানা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন বিভিন্ন সময়ে।

বুদ্ধদেব বসুর আসল পরিচয় তিনি এক আদ্যন্ত সৃজনশীল মানুষ। শৈশবেই কবিতা রচনা দিয়ে শুরু। পত্রিকায় লেখা ছাপা হচ্ছে তাঁর। ক্রমশ পেশাদার হয়ে উঠতে চাইছেন সাহিত্যিক জীবনে। শুধু কবিতা লিখে দায় সারেননি, কাব্য-সমালোচনাও যে একটা শিল্প হতে পারে,বুদ্ধদেব বসু তা দেখালেন। এইসূত্রে তিনি হয়ে উঠলেন অগ্রণী সাহিত্য-সমালোচক। সাহিত্য-সমালোচনা তাঁর হাতে 'সৃষ্টিকর্মে' পরিণত হয়েছে। সাহিত্য-সমালোচনা ছাড়া রয়েছে তাঁর ভ্রমণকথা এবং স্মৃতিকথামূলক রচনা।'সমুদ্রতীর' (১৯৩৭), 'আমি চঞ্চল হে' (১৯৩৭), 'সব পেয়েছির দেশে' (১৯৪১), 'দেশান্তর' (১৯৬৬) বুদ্ধদেব বসুর উল্লেখ্য ভ্রমণকথা। স্মৃতিকথা বা আত্মকথামূলক রচনা হিসেবে 'আমার ছেলেবেলা' (১৯৭৩), 'আমার যৌবন' (১৯৭৬) খুবই উপভোগ্য। ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধের পর্যায়ে তাঁর আরও কিছু রচনার নাম করা যায়। যথা 'পুরানা পল্টন', 'ক্লাইভ স্ট্রীটে চাঁদ', 'মৃত্যু-জল্পনা', 'আড্ডা', 'যে আধাঁর আলোর অধিক' ইত্যাদি।

বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য-সমালোচনার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ রবীন্দ্রসাহিত্য। এবিষয়ে তিনটি গ্রন্থ রয়েছে তাঁর। গ্রন্থগুলি হল 'রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য' (১৯৫৫), 'সঙ্গ-নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৩) এবং 'কবি রবীন্দ্রনাথ'(১৯৬৬)। এর বাইরেও রবীন্দ্রনাথ নিয়ে তাঁর লেখালেখি রয়েছে। রবীন্দ্র-অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও একজন বিদগ্ধ পাঠকের চোখে রবীন্দ্র কথাসাহিত্যের সমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি। রবীন্দ্র উপন্যাস 'চোখের বালি'কে বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় গ্রন্থ মনে করলেও সাহিত্য-সমালোচক বুদ্ধদেবের মতে, এই উপন্যাসটি 'কাঁচা লেখা সন্দেহ নেই'। এই উপন্যাসের উপসংহার তাঁর মনঃপূত হয়নি। 'নৌকাডুবি'কে চিহ্নিত করেছেন 'সমগ্র

রবীন্দ্রসাহিত্যে পশ্চাদপসরণের দৃষ্টান্ত' রূপে। কিন্তু 'গোরা' উপন্যাস নিয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত। রবীন্দ্র ছোটোগল্পগুলি ধরে ধরে অনবদ্য কবিত্বময় ভাষায় বিশ্লেষণ করেছেন বুদ্ধদেব। রবীন্দ্র-কবিতার আলোচনাতেও পাই গুণমুগ্ধ বুদ্ধদেবকে। বলা যায়, তিনিই প্রথম রবীন্দ্র-কবিতার ছন্দ নিয়ে সুচিন্তিত ও কাব্যবোধ সমৃদ্ধ আলোচনা করেন 'কবিতা' পত্রিকার পাতায়। 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধে রবীন্দ্র কাব্যকলার আপাত-সরল জটিলতা, কবিমনের গূঢ় দ্বন্দ্ব, তাঁকে অনুকরণের ব্যর্থ চেষ্টা ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর অভিমত বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করেছেন বুদ্ধদেব।

বুদ্ধদেব বসু নিছক সাহিত্য সমালোচক ছিলেন না, ছিলেন অনাগত ভবিষ্যতকে সঠিকভাবে চিনে নেওয়ার বিরল ক্ষমতার অধিকারী— দূরদ্রষ্টা। রবীন্দ্র পরবর্তী তথাকথিত রবীন্দ্রবিরোধী কবিদের কবিতা সমকালীন পাঠক-সমালোচক সেভাবে গ্রহণ করছিলেন না; এমন প্রেক্ষিতে আধুনিক কবিদের কাব্যগুণকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যাঁরা নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে গেছেন, বুদ্ধদেব বসু তাঁদের অন্যতম। কবি জীবনানন্দকে নিয়ে তিনি সবচেয়ে উচ্ছ্বসিত। চলতি স্রোতের বিপরীতে গিয়ে তিনি লেখেন ঃ 'বনলতা সেন' কিংবা 'হায় চিল' এর মতো নিখুঁত গীতিকবিতা সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে অল্পই আছে।" সত্যের খাতিরে মানতেই হবে জীবনানন্দের প্রতিষ্ঠার মূলে তিনিই ছিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেনদের মতো তরুণ কবিদের কবিতা আলোচনা করে তিনি তাঁদের উৎসাহিত করেছিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' প্রকাশিত হলে তাঁকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন ও সমাদর জানিয়েছিলেন তিনি। বুদ্ধদেব বসুর এই ধরনের 'কাজ' নিছক ব্যক্তিগত বিষয় হয়ে থেকে যায়নি, হয়ে উঠেছে রবীন্দ্র পরবর্তী আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসের অংশ। পাশ্চাত্যের কবি ও কথাসাহিত্যিকদের আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি বাঙালি পাঠককে সাহিত্য-রসাস্বাদনের একটি বড়ো ক্ষেত্রে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। পাশাপাশি রামায়ণ,মহাভারত ও শিশুসাহিত্য নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর রসালোচনাও কম উপভোগ্য নয়। সমালোচক হিসেবে তাঁর সার্থকতা এখানেই, তা হল —বক্তব্যের মৌলিকতা, সজীবতা এবং সর্বোপরি রসময়তা। বুদ্ধদেব বসুর ভাষা ও বাক্যগঠনের চমৎকারিত্ব ও কবিত্ব নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই ; তা প্রসন্ন, উজ্জ্বল এবং গতিময়।

২২.৭ সারাংশ

বাংলা সাহিত্যে প্রমথনাথ চৌধুরীই চলিত ভাষার প্রবর্তক। ভাষা ও রচনারীতির দিক থেকে বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। তাঁর রচনায় সাহিত্যগুণ ছাড়াও জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। গোপাল হালদার ছিলেন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। বামপন্থী রাজনীতি ছিল তাঁর মজ্জায়। নিজে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন বেশ কিছু কাল। গদ্য রচনায় তাঁর হাত ছিল পাকা। বিভিন্ন ধরনের রচনার মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেন তিনি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক ভাষা জানার ফলে সৈয়দ মুজতবা আলী একজন শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদরূপে স্বীকৃতি পান। তাঁর ভ্রমণ সংক্রান্ত গ্রন্থ, রম্য রচনা জাতীয় বিভিন্ন প্রবন্ধগ্রন্থ পাঠকের মন জয় করেছিল। বুদ্ধদেব বসু মূলত কবি, কিন্তু গদ্য সাহিত্যেও তিনি পরিশীলিত। গদ্য রচনায় তাঁর মননশীলতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। গদ্য রচনায় মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। তাঁর নিজস্ব জীবন কথা, রম্যরচনা, সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ এক অসাধারণ ঘরানা তৈরি করেছে। গদ্য রচনার লেখকের একটা নিজস্ব রীতি ছিল।

২২.৮ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর অবদান উল্লেখ করুন।

২) বাংলা গদ্যের বিবর্তনে প্রমথ চৌধুরীর ভূমিকা নির্ণয় করুন।

৩) বাংলা প্রবন্ধ রচনায় গোপাল হালদারের অবদান কতখানি তা লিখুন।

৪) সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক প্রবন্ধ রচনায় গোপাল হালদারের সামর্থ্যের পরিচয়টি পরিস্ফুট করুন।

৫) প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতবা আলীর কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৬) ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচয়িতা সৈয়দ মুজতবা আলীর পরিচয় লিপিবদ্ধ করুন।

৭) ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনায় বুদ্ধদেব বসুর অবদান উল্লেখ করুন।

৮) সাহিত্য সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর কৃতিত্বের পরিচয় দিন।

৯) রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনায় বুদ্ধদেব বসুর অবদান আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) প্রমথ চৌধুরীর 'চার ইয়ারী কথা'র পরিচয় দিন।

২) 'সবুজপত্র' পত্রিকাটি কার সম্পাদনায় কখন প্রকাশিত হয়?

৩) প্রমথ চৌধুরীর লেখা দুটি প্রবন্ধগ্রন্থের নাম লিখুন।

৪) গোপাল হালদারের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'রূপনারানের কূলে' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৫) গোপাল হালদারের লেখা সাহিত্যের ইতিহাসগুলির নাম উল্লেখ করুন।

৬) সৈয়দ মুজতবা আলী কোন ধরনের রচনায় সাফল্য পেয়েছিলেন উদাহরণসহ লিখুন।

৭) সৈয়দ মুজতবা আলীর 'পঞ্চতন্ত্র' কী জাতীয় গ্রন্থ পরিচয় দিন।

৮) বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিকথা 'আমার যৌবন' উপভোগ্য কেন তা লিখুন।

৯) বুদ্ধদেব বসু কোন কোন পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন? এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনটি?

১০) রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে লেখা বুদ্ধদেব বসুর দুটি গ্রন্থের নাম লিখুন।

২২.৯ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (৫ম খণ্ড)—সুকুমার সেন।

২) বাংলা সাহিত্যে গদ্য — সুকুমার সেন।

৩) বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস — সজনীকান্ত দাস।

৪) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৬-৮) — অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫) বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (৩-৪) — ভূদেব চৌধুরী।

৬) বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস — ক্ষেত্র গুপ্ত।

৭) রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্র — অন্নদাশংকর রায়।

একক-২৩ ❑ সবুজপত্র, কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, প্রবাসী

গঠন

২৩.১. উদ্দেশ্য
২৩.২ প্রস্তাবনা
২৩.৩ মূলপাঠ : সবুজপত্র, কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, প্রবাসী
২৩.৪ সারাংশ
২৩.৫ অনুশীলনী
২৩.৬ গ্রন্থপঞ্জি

২৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- বিংশ শতাব্দীর প্রতিনিধিস্থানীয় বাংলা সাময়িক পত্রিকাগুলি সমকালীন সৃজনশীল সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার বিকাশে কতখানি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল সেই সংক্রান্ত নানাদিক নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন।
- সমকালীন সাহিত্যিকদের প্রতিষ্ঠা দিতে এই পত্রিকাগুলির গুরুত্ব সম্পর্কেও কিছু ধ্যান-ধারণা অর্জন করতে পারবেন।

২৩.২ প্রস্তাবনা

সংস্কৃতি হল সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ। এর প্রকাশ বহুমুখী। ভৌগোলিক পরিবেশ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সংস্কৃতির যোগ ঘনিষ্ঠ। সংস্কৃতি বদলায়, তার ঘটে রূপান্তর। কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে সংস্কৃতি। আর এই সংস্কৃতির ধারক-বাহক হল সমকালীন প্রকাশিত বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকা। যদিও বা এখানে শুধু বিশ শতকের সাময়িক পত্রিকাগুলির কথা আলোচিত হবে। তবে সাময়িকপত্রের ইতিহাস বহুপ্রাচীন। চীনদেশে প্রথম একাদশ শতাব্দীতে সংবাদপত্রের প্রকাশনা শুরু হয়। ইউরোপের দেশ সমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম ইতালির ভেনিস শহরে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়। ইংল্যান্ডের রানি এলিজাবেথের রাজত্বকালে সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়— একথা সর্বজনস্বীকৃত। উপমহাদেশে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে রাজকর্মচারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম হাতে লেখা সংবাদপত্র চালু হয়। বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট' (১৭৮০ সাল) জেমস অগাস্টাস হিকি কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র 'দিগদর্শন' (১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস) শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয় জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায়। তবে, বাঙালি পরিচালিত প্রথম সাময়িক পত্র গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'বাঙ্গালা গেজেটি' (১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাস) প্রকাশিত হয়। কিন্তু তা ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। বাংলা ভাষায় প্রথম দৈনিক পত্রিকা কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে যদিও ১৮৩১ সালে

সাপ্তাহিকরূপে এর আত্মপ্রকাশ) প্রকাশিত হয়। যদিও বা আমাদের মূল আলোচনার জায়গা হল বিশ শতকের সাময়িক পত্রিকা, কিন্তু প্রারম্ভিক পর্বের একটু হদিশ না জানলে পরবর্তীকালের পত্রিকাগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারি। এই এককে পাঁচটি পত্রিকার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করব। এককটি থেকে শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্যের একটি নতুন গতিপথের সন্ধান পাবেন।

২৩.৩ মূলপাঠ : সবুজপত্র, কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, প্রবাসী

● **সবুজপত্র :** বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'সবুজপত্র' এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বাংলা সাহিত্যের নানান বিষয়ের উত্থান ঘটাতে এর জুড়ি মেলা ভার। বুদ্ধদেব বসু যথার্থই বলেছেন— ''... এর প্রথম দান প্রমথ চৌধুরী বা বীরবল। দ্বিতীয় দান চলিত ভাষার প্রতিষ্ঠা। তৃতীয় এবং হয়তো বা মহত্তম দান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রমথ চৌধুরী এবং রবীন্দ্রনাথ এ দুজনের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল সবুজপত্রের, প্রথম জনের আত্মপ্রকাশের জন্য, দ্বিতীয়জনের নতুন হবার জন্য'' ১৩২১ বঙ্গাব্দে বা ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে সবুজপত্রের প্রথম আত্মপ্রকাশ। ১৩২৭ এর চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত একটানা এই মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তবে মাঝে মাঝে দুমাসের যুগ্মসংখ্যাও বেরিয়েছে। মাঝে কিছু সময় বন্ধ থাকলেও ১৩৩৪ এর ভাদ্র সংখ্যার পর এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। পরে পত্রিকাটির সহ সম্পাদক হন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়। স্বল্পায়ু সত্ত্বেও সবুজপত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রজন্মে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যরীতি গঠনে একটি প্রধান শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল। প্রমথ চৌধুরী নতুন সাহিত্যরীতি প্রবর্তনের চেষ্টা হিসাবে কথ্য বাংলাকে অগ্রাধিকার দেন, যা 'বীরবলী' ভাষারূপে পরিচিতি লাভ করে। এরপর থেকে বাংলা সাহিত্যে কথ্য বাংলা প্রাধান্য লাভ করেছে।

এ ধরনের একটি সাময়িকী প্রকাশ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমথ চৌধুরীকে উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। এই পত্রিকাতে শুধু সবুজ রংই ব্যবহার করা হত। নন্দলাল বসু অঙ্কিত একটি সবুজ তালপাতা এর প্রচ্ছদে ব্যবহৃত হত। রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন ''কাগজটার নাম যদি কনিষ্ঠ হয় তা কি রকম হয়। আকারে ছোট-বয়সেও। শুধু কালের হিসাবে ছোট, বয়স নয়; ভারের হিসাবেও। অবশ্য পত্রিকাটির নাম 'কনিষ্ঠ' হয়নি, নাম ঠিক হয় 'সবুজপত্র'। রবীন্দ্রনাথ এই নামকরণে খুশি হয়ে লেখেন— ''সবুজপত্র উদ্গমের সময় হয়েছে বসন্তের হাওয়ায় সে কথা চাপা রইল না— অতএব সংবাদটা ছাপিয়ে দিতে দোষ নেই। আমি একটু ফাঁক পেলেই কিছু লেখার চেষ্টা করব।'' পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্র' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন ''সবুজপত্রের রাজা রবীন্দ্রনাথ, সামন্ত প্রমথ চৌধুরী।'' এছাড়াও এই পত্রিকায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, অমিয় চক্রবর্তী, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখরা নিয়মিত লিখতেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত সকল লেখায় মুক্তচিন্তা, গণতন্ত্র, যুক্তি এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রকাশ পেয়েছে।

পত্রিকাটির অশেষ সফলতার পাশাপাশি কিছু ত্রুটিও নজরে আসে। ছাপার ভুল পত্রিকাটির এক বড় দোষ, যা দেখে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বিরক্ত হতেন। এছাড়া সম্পাদক পত্রিকাটিকে বেশি আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেননি। তবে পত্রিকা সম্পাদক লেখেন ''কলম চালানো আমার শখ, কাগজ চালানো আমার ব্যবসা নয়।''

যাইহোক, সবুজপত্র বাংলা রচনায় চলিত ভাষার প্রবেশ ত্বরান্বিত করেছে, নিঃসন্দেহে এটি এর উল্লেখযোগ্য অবদান।

● **কল্লোল :** কল্লোল মূলত একটি সাহিত্যপত্র যা অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতের কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে। এটি নব্য লেখকদের প্রধান মুখপাত্র ছিল, যাঁদের অন্যতম প্রেমেন্দ্র মিত্র, নজরুল ইসলাম,

বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ। এই পত্রিকাকে অনুসরণকারী পত্রিকাগুলি হল 'কালিকলম' (১৯২৬), প্রগতি (১৯২৭) প্রভৃতি। কল্লোল সাহিত্যপত্রের সময়কালকে 'কল্লোল যুগ' হিসাবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কল্লোল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে প্রভাবশালী আন্দোলন সংগঠিত হয়। বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার সূত্রপাতে এই আন্দোলনের ভূমিকাই মুখ্য বলে বিবেচিত। কল্লোল সাহিত্যগোষ্ঠী সম্ভবত বাংলা সাহিত্যে প্রথম আধুনিকতার নবজাগরণের সূচনা করেন। এই গোষ্ঠীর লেখকরা ফ্রয়েড এবং কার্ল মার্ক্স এর প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে একইসঙ্গে নবীনতা ও প্রগতির দিশারী 'কল্লোল' পত্রিকা। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন দীনেশরঞ্জন দাস এবং সহ সম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগ, এই মাসিক পত্রিকাটির আয়ুষ্কাল ছিল সাত বছর। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকেরা রবীন্দ্র প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নতুন কিছু করতে চেয়েছিলেন। মূলত বিদ্রোহ, প্রতিবাদ, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই, অবদমিত কামনা-বাসনা এবং যৌন ক্ষুধা ছিল কল্লোলের সাহিত্য চর্চার প্রধান বিষয়। কল্লোলের ত্রয়ী লেখক হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং বুদ্ধদেব বসু। কল্লোল পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মোহিতলাল মজুমদার, মনীষ ঘটক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত দত্ত, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ সাহিত্যিকগণ। বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দির বন্দনা' জীবনানন্দ দাশের 'ঝরা পালক', অজিত দত্তের 'কুসুমের মাস', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা', শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুটির দেশ', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রসকলি' প্রভৃতি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কল্লোলের দ্রোণাচার্য মোহিতলাল মজুমদার, কলমচি হলেন মনীষ ঘটক এবং কুলবর্ধন হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। কল্লোল পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম রচনা দীনেশ রঞ্জন দাসের। 'কল্লোল' কবিতাটির দু-একটি লাইন এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য :

'আমি কল্লোল শুধু কলরোল ঘুমহারা নিশিদিন,
অজানা নয়নের বারি নীল
চোখে মোর ঢেউ তুলে তারি
পাষাণ শিলায় আছাড়িয়া পড়ি ফিরে আসি নিশিদিন।

কল্লোল পত্রিকার লেখকদের বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁরা বাস্তববাদী, মার্কসীয় অর্থে বাস্তববাদী নয়, তা শারীরিক ও জৈবিক বাস্তবতা। বাস্তববাদী ছাড়াও রোমান্টিকতা লেখকদের অন্য বৈশিষ্ট্য ছিল। তাই বলা চলে কল্লোলের কালে বাংলা সাহিত্যের পালা বদলের মহড়া চলেছিল।

● **কালিকলম :** এই পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে)। কল্লোলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছিল 'কালিকলম' পত্রিকা। যদিও ভাবাদর্শ এক, লেখকবৃন্দও প্রায় একই। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছিলেন কল্লোল আর কালিকলম 'একই মুক্ত বিহঙ্গের দুই দীপ্ত শাখা'। কল্লোলের ঘাটে বসেই কালিকলম প্রকাশনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মুরলীধর বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র, কলকাতা কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের বরদা এজেন্সি থেকে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। টেকসই অ্যান্টিক কাগজে ছাপা কালিকলমের সাইজ ডাবল ক্রাউন। দাম প্রতি সংখ্যা চার আনা। বার্ষিক ডাক মাশুলসহ সাড়ে তিন টাকা। প্রতি মাসের ৩০ তারিখে প্রকাশিত হত। মেয়াদকাল মাত্র চার বছর। দু'একটি সংখ্যা বাদে ১৩৩৬ সালের মাঘ মাসে বন্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়। কালিকলমের দ্বিতীয় বর্ষে এসে প্রেমেন্দ্র মিত্র ছেড়ে চলে যান। এরপর দুজনের সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হতে থাকে। আবার তৃতীয় বর্ষে এসে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কালিকলমের সঙ্গ ত্যাগ করেন। এরপর বন্ধ হওয়া পর্যন্ত মুরলীধর বসু নিজ স্কন্ধে এই পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব সামলান।

প্রথম সংখ্যায় শৈলজানন্দের ধারাবাহিক বড়গল্প 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস' এছাড়া 'দিদিমণি' নামে অপর একটি গল্প ছদ্মনামে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক'-এর দ্বিতীয় পর্বের ধারাবাহিক শুরু হয়। এছাড়া 'মগের মুলুক' ও 'মানুষের মানে চাই' কবিতা প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ) নজরুলের 'মাধবী প্রলাপ' কবিতা নিয়ে রক্ষণশীল পাঠক সমাজে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এ কবিতায় দেহজ আবেদন ও অশ্লীল শব্দ ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে। 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার সম্পাদক সজনীকান্ত দাস 'কালিকলম' ও কল্লোলের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ আনেন রবীন্দ্রনাথের কাছে।

কালিকলম পত্রিকায় ছাপা হত আধুনিক যুগের সাহিত্যিকদের গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ ও অনুবাদমূলক লেখা। পাঠকদের কাছে আকর্ষণের জন্য সংগ্রহ, চয়নিকা, বিচিত্রা, অসংলগ্ন, চিত্র ও সাহিত্য প্রসঙ্গ নামে ফিচার বিভাগ ছিল। সচিত্র মাসিক পত্রিকা হিসাবে 'কালিকলম' চিত্রমুদ্রণেও বৈশিষ্ট্য রেখে গেছে। বিশিষ্টদের— আলোকচিত্র ছাড়া তরুণদের আঁকা ছবি ছাপানো হত। যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ, মোহিতলালের ভোগবাদ, নজরুলের সাম্যবাদ প্রভৃতি এই পত্রিকায় স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া পত্রিকার পাতায় পাতায় নিম্নবিত্ত শ্রেণি জীবন্ত হয়ে উঠেছিল 'কয়লাকুটির দেশে' বা 'পোনাঘাট' গল্পে। সবশেষে বলা যায়, 'কালিকলম' পত্রিকা আসলে কল্লোলবৃত্তের বহির্ভূত ছিল না।

● **প্রগতি :** 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই ঢাকায় 'প্রগতি' পত্রিকা প্রকাশ হয়। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে বুদ্ধদেব বসু ও অজিত কুমার দত্তের সম্পাদনায় এই মাসিক পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। ১৩৩৭ সাল পর্যন্ত এই পত্রিকা চালু ছিল। পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক অজিত কুমার দত্ত এই পত্রিকা সম্বন্ধে লিখেছিলেন— ''কালিকলমের মতো কল্লোলের সঙ্গে বিরোধীতা করে অথবা কল্লোলের কাল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হবার উদ্দেশ্যে আমরা এ মাসিক পত্র প্রকাশ করিনি। আমরা যারা ঢাকায় ছিলাম, আমাদের একটি নিজস্ব সাহিত্য পত্রিকার প্রয়োজন বোধ করেছিলাম।''

'প্রগতি' পত্রিকা কী সম্পাদনা, কী লেখা, কী বক্তব্য— সব দিক দিয়েই কল্লোলের পথ অনুসরণ করেছিল। পত্রিকার বিশেষত্ব হল প্রতি সংখ্যায় একটি করে ছবি ছাপত। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায়— ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছবি ছেপেছিল এই পত্রিকা। তবে এই ছবি ছাপার সূত্রপাত করেছিল কল্লোল পত্রিকা।

অতি-আধুনিক সাহিত্যের মুখপত্ররূপে 'প্রগতি' স্বীকৃতি পেতে চেয়েছিল। প্রগতি যে কল্লোলের দোসর তার প্রমাণ মেলে প্রকাশিত গল্প, কবিতা, উপন্যাসের মধ্যে। পত্রিকায় প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন লেখকবৃন্দ হলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অজিতকুমার দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, মোহিতলাল মজুমদার, জগদীশ গুপ্ত, বিষ্ণু দে, মনীষ ঘটক, নজরুল ইসলাম প্রমুখ। এই পত্রিকা ছিল মূলক আধুনিকতার অগ্রদূত।

● **প্রবাসী :** 'প্রবাসী' বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে প্রবর্তিত একটি সাহিত্য সাময়িকী। এই মাসিক পত্রিকাটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হত। সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং কর্মাধ্যক্ষ আশুতোষ চক্রবর্তী। ১৩০৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৯০১) এর সূচনা সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যাটি এলাহাবাদের ইন্ডিয়ান প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। বার্ষিক মূল্য আড়াই টাকা। প্রথম সংখ্যার পৃষ্ঠা চল্লিশ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কমলাকান্ত শর্মা, দেবেন্দ্রনাথ সেন, নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, যোগেশ চন্দ্র রায় প্রমুখের লেখা ছাপা হত। এতে অজন্তা গুহার ফটো, জীববিজ্ঞানের উপর নিবন্ধ ও বিবিধ প্রসঙ্গ মুদ্রিত হয়েছিল।

১৯০১ থেকে 'প্রবাসী' প্রায় পঞ্চাশ বছর প্রকাশিত হয়। বেশিরভাগ সময় সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তিনি নারী-পুরুষের সমানাধিকারে বিশ্বাস করতেন এবং নারী প্রগতি বিষয়ক লেখা ছাপতেন, অধিকন্তু তিনি নারীদের লেখায় উৎসাহিত করতেন। তিনি প্রবাসীতে লিখেছেন — ''স্ত্রী শিক্ষার একান্ত আবশ্যিকতা এখন আর নতুন করিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই।... যে সকল মহিলা অল্প লেখাপড়া জানেন, তাহারাও অপরকে পড়িতে

ও লিখিতে শিখাইয়া দিতে পারেন। অল্পশিক্ষিতা বা অধিক শিক্ষিতা প্রত্যেক মহিলা বিদ্যাদানকে ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিলে অল্প সময়ের মধ্যে নিরক্ষর স্ত্রীলোকের সংখ্যায় অনেক হ্রাস হইতে পারে"। দেশীয় জিনিসের ব্যবহার, দেশে কলকারখানা গড়ে তোলা ও উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উপলব্ধি করেন। এ সম্বন্ধে বহু লেখা প্রবাসীতে আছে। শুধু সাহিত্য সেবক নয়, পাঠকদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার প্রচেষ্টাও তাঁর ছিল।

'প্রবাসী' পত্রিকা বাংলায় লোকসংগীত সংগ্রহে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা থেকে এতে 'হারামণি' বিভাগ প্রবর্তিত হয়েছিল। এই বিভাগে সারা বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত লোকসংগীত সংকলিত হত। হারামণির প্রথম ভাগে গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে' এই গানটি মুদ্রিত হয়েছিল। পরাধীনতার গ্লানি প্রতিনিয়ত পীড়িত করত রামানন্দকে। তাঁর স্বদেশ প্রেম ছিল প্রশ্নাতীত। প্রবাসীর মুখবাণীতে মুদ্রিত হয়েছিল গোবিন্দ চন্দ্র দাসের কবিতা—

নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে
পর-দাস-খতে সমুদায় দিলে।
পর দীপমালা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে সে তিমিরে।

এলাহাবাদ নিবাসী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রবাসীর জন্মলগ্ন থেকেই প্রস্তুতি পর্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যাইহোক সর্বভারতীয় আবেদন, প্রবাসী বাঙালির কথা, উচ্চ মানের দেশী বিদেশি চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের ছবি প্রকাশ করা, অলঙ্করণে ও বর্ণময় চিত্রসজ্জায় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মননশীল সংবাদ ও প্রবন্ধ পরিবেশনায় বহু বছর ধরে উৎকর্ষ বজায় রেখে 'প্রবাসী' সাহিত্য জগতে তার পথচলা অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

২৩.৪ সারাংশ

বাংলা সাময়িক পত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে ১৮১৮ সাল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সামাজিক ও ঐতিহাসিক চিত্রের চিত্রায়ণে সাময়িক পত্রগুলির একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। সংবাদপত্রের ব্যবহার শুধুমাত্র খবর জানার জন্য সীমাবদ্ধ থাকেনি। সংবাদপত্র কালে কালে হয়ে উঠেছে মেধা বিকাশের সিঁড়ি, বিনোদনের অন্যতম হাতিয়ার; এমনকী একটা গতির অধিকার আদায়ের মুখপাত্র হিসাবেও সংবাদপত্রের ভূমিকা শীর্ষেই। এমন কী সাময়িক পত্রকে কেন্দ্র করে ভাবাদর্শগত এক সাহিত্যিক গোষ্ঠীও সৃষ্টি হয়েছিল, যা সাহিত্যজগতকে উন্মাদনায় চঞ্চল করে তুলেছিল। এলাহাবাদ প্রবাসী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৯০১ সালে প্রকাশ করেছিলেন উচ্চাঙ্গের সাহিত্য পত্রিকা 'প্রবাসী'। বাংলার বাইরে থেকে প্রকাশিত হত বলেই পত্রিকার নাম হয়েছিল 'প্রবাসী'। পরে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ পত্রিকাটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে। আবার যৌবনের প্রাণধর্মই ছিল বীরবল ছদ্মনামে সম্পাদিত সবুজপত্রের চালিকাশক্তি। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকরা সচেতনভাবে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার আমদানি করেন। আর এই কল্লোলের বীজ বোনা হয়েছিল ঢাকায়। কল্লোল পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকরা আধুনিক বিদেশি সাহিত্যের দ্বারা অনেকটা অভিভূত ছিলেন। সেই প্রভাবের ফলে এরা যেন একহাতে শাস্ত্র আর এক হাতে শস্ত্র নিয়ে বের হয়েছিলেন। এই কল্লোল পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই ঢাকার প্রগতি ও কলকাতার কালিকলম পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তবে যাঁরা কল্লোল গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে এই পত্রিকা শুরু করেছিলেন, তাঁরা আবার ফিরে গেলেন কল্লোল গোষ্ঠীতে। সবুজপত্রে যেমন চলিত গদ্যরীতির প্রতিষ্ঠা ঘটল, তেমনি প্রবাসীতে নারী শিক্ষার

গুরুত্ব আর কল্লোল, কালিকলম এবং প্রগতিতে রবীন্দ্র বিরোধিতার ঘোষিত অধ্যায় শুরু হলেও সেই বিরোধিতায় ছিল তর-তম। এই পত্রিকাগুলি ছিল মূলত আধুনিকতার অগ্রদূত।

২৩.৫ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) বাংলা সাময়িক পত্রের সূচনা কীভাবে হয় তার পরিচয় দিন।

২) বাংলা গদ্যের বিকাশে বিশ শতকের বিভিন্ন সাময়িক পত্রের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩) বাংলা সাময়িক পত্রের উদ্ভব ও বিকাশে 'সবুজপত্র' পত্রিকাটির ভূমিকা আলোচনা করুন।

৪) বাংলা সাময়িক পত্রের বিকাশে 'কল্লোল' পত্রিকার ভূমিকা নির্ণয় করুন।

৫) বাংলা সাময়িক পত্রের আলোচনায় 'কালিকলম' পত্রিকার গুরুত্ব বিচার করুন।

৬) 'প্রগতি' পত্রিকা বাংলা সাময়িক পত্রকে কতখানি বিকশিত করেছিল তার পরিচয় দিন।

৭) 'প্রবাসী' পত্রিকা বাংলা সাহিত্যের বিকাশে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল— পরিচয় দিন।

৮) 'কল্লোল', 'কালিকলম', এবং 'প্রগতি' — এই ত্রয়ী পত্রিকা রবীন্দ্র পরবর্তী আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এক বৃত্ত গড়ে তুলেছিল — বিষয়টি বুঝিয়ে দিন।

৯) ভূদেব চৌধুরীর মতে " 'সবুজপত্র' বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন'-এর পরে প্রথম বিদ্রোহী বাংলা সাহিত্য-পত্র।" — এই বিদ্রোহের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

১০) 'প্রবাসী' "চিরজীবন অসত্য অবিচার ও অশুচির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে সৎ সুন্দর ও মঙ্গলকে।"— আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১) টীকা লিখুন : কল্লোল পত্রিকা।

২) 'সবুজপত্র' পত্রিকার গদ্যরীতির পরিচয় দিন।

৩) 'কল্লোল' পত্রিকার আবির্ভাব এক ঐতিহাসিক ঘটনা— কেন তা লিখুন।

৪) 'কালিকলম' পত্রিকাটির প্রকাশের কারণ ব্যক্ত করুন।

৫) 'প্রগতি' পত্রিকার নতুন লেখকেরা বাংলা সাহিত্যকে নতুন পথে পরিচালিত করেছিল কীভাবে তা ব্যাখ্যা করুন।

৬) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় দিন।

৭) 'প্রবাসী'-র সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত লেখকদের পরিচয় দিন।

৮) 'কল্লোল' ও 'কালিকলম'-এর উদ্দেশ্য প্রায় একই রকমের ছিল— ব্যাখ্যা করুন।

৯) সম্পাদনা, লেখা ও বক্তব্যে 'প্রগতি' পত্রিকা 'কল্লোল'-এর অনুসারী— কীভাবে তা দেখান।

১০) 'প্রগতি' পত্রিকার কয়েকটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করুন।

২৩.৬ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.।

২) সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (সম্পাদিত), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

৩) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।

৪) বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিবৃত্ত (১ম ও ২য় খণ্ড)— সন্দীপ দত্ত, গাঙচিল, কলকাতা।

৫। বাংলা পত্র পত্রিকা — সম্পাদক ও সম্পাদনা, সম্পাদনা— তাপস ভৌমিক।

একক-২৪ ❑ ভারতবর্ষ, শনিবারের চিঠি, পরিচয়, কবিতা, কৃত্তিবাস

গঠন

২৪.১ উদ্দেশ্য
২৪.২ প্রস্তাবনা
২৪.৩ মূলপাঠ : ভারতবর্ষ, শনিবারের চিঠি, পরিচয়, কবিতা, কৃত্তিবাস
২৪.৪ সারাংশ
২৪.৫ অনুশীলনী
২৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

২৪.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠে জানা যাবে—

- সাহিত্য চর্চায় সাময়িক পত্রের বিশেষ ভূমিকার কথা।
- সাময়িক পত্রের নানা আলোচনা কীভাবে শিক্ষার্থীকে সমৃদ্ধ করে তার নানা দিক। জানা যাবে সমকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির কথাও।
- নির্দিষ্ট পাঠক্রমের শিক্ষায় শিক্ষার্থী জ্ঞানার্জন করতে পারবে।
- বিশ শতকের সাহিত্যচর্চায় সাময়িকপত্র যে দিশার সন্ধান দিয়েছিল সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে সমৃদ্ধ করাই এই এককের উদ্দেশ্য।

২৪.২ প্রস্তাবনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাগুলির গদ্য বাংলা ভাষা গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। বাংলা গদ্য ভাষা বিকাশের সঙ্গে সাময়িক পত্রের এক বিশেষ যোগ থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্র করে, তেমনি বিশ শতকের প্রথমার্ধে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সাময়িক পত্রগুলোর সঙ্গে অনেক লেখক যুক্ত হয়ে পড়েন। এই সময়ে যে সমস্ত সাময়িক পত্রগুলো প্রতিনিধি স্থানীয় হয়ে ওঠে তার মধ্যে ভারতবর্ষ, শনিবারের চিঠি, পরিচয়, কবিতা, কৃত্তিবাস উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত সাময়িকপত্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাঠ্যপুস্তকের বেড়াজাল থেকে বাংলা গদ্যের মুক্তি ঘটায় সাময়িক পত্রিকাগুলি। দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন যাত্রায় সাময়িক পত্রের বাংলা গদ্য পাঠকের মন ও মননের কাছাকাছি চলে আসে। এই আলোচনায় বিশ শতকের পূর্বোল্লিখিত এই সমস্ত সাময়িক পত্রের ভূমিকা, বাংলা গদ্যের বিকাশ ও বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে তাদের প্রয়োজনীয়তার বিষয় গুরুত্ব পাবে। পূর্ববর্তী এককে এ সম্পর্কে আলোচনা যেমন আছে, তেমনি এই এককেও পাঁচটি সাময়িক পত্রিকা সম্পর্কে সম্যক আলোচনা করা হল।

২৪.৩ মূলপাঠ : ভারতবর্ষ, শনিবারের চিঠি, পরিচয়, কবিতা, কৃত্তিবাস

● **ভারতবর্ষ :** কলিকাতা ইভিনিং ক্লাবের দুই প্রবর্তক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের কাছে ক্লাব সভাপতি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একটা নতুন ধরনের মাসিক কাগজ বের করার প্রস্তাব দেন। তবে ক্লাবের আর্থিক সঙ্গতি এবং দশজনে কি এ কাগজ কিনবে এ নিয়ে তাঁর দূরাশাও ছিল। হরিদাস বাবু আর্থিক সহায়তা দিয়ে পত্রিকা বার করতে সম্মত হলেও তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে সম্পাদক হিসেবে দেখতে চান। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় উল্লসিত হয়ে বলেন— 'বেশ, তাহলে এ কাগজ এখনই বাহির হউক।' ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ৭ই চৈত্র পত্রিকা প্রকাশের পূর্বে একটি প্রচারপত্র বিলি করা হয়। তাতে লেখা হয় বাংলাদেশে অন্যান্য সভ্যদেশের তুলনায় মাসিক পত্রিকার অপ্রতুলতা রয়েছে। তাছাড়া এ পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। পত্রিকার নামকরণ D. L. Roy-এর দেওয়া 'ভারতবর্ষ' সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত হয়, ঠিক হয় D. L. Roy-এবং অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ হবেন প্রথম যুগ্ম সম্পাদক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রথম সংখ্যার প্রুফ দেখতে দেখতে অকস্মাৎ D. L. Roy-এর মৃত্যু হয়। ফলে হরিদাস বাবু জোর করে জলধর সেনকে পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব দেন। প্রথম সংখ্যা ১৩২০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও জলধর সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা আখ্যাপত্রে ছাপা হল 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত' কথাটি। শেষ সংখ্যা অবধি এই কটি শব্দ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত সূচনা অংশটি D. L. Roy তাঁর মৃত্যুর আগে রচনা করে গিয়েছিলেন তা থাকল এবং প্রচ্ছদ চিত্রের নাম ছিল 'ভারতবর্ষ'। তাতে ছিল সুনীল জলধি থেকে উঠে আসছে ভারতমাতা, মাথায় মুকুট, গলায় সাতনরী হার এবং ডানহাতে শস্যগুচ্ছের সম্ভার।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে 'ভারতবর্ষ' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রথম সংখ্যাতে বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছয়টি বহুবর্ণ ছবি পাঠকমহলে সাড়া জাগায়। পরবর্তীকালে প্রকাশিত সংখ্যাগুলিতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুকলা, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস এবং প্রত্নতত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত হয় সময়ের সাথে সাথে খেলাধুলা, নারী, শিশু, সিনেমা, সাহিত্য-সংবাদ, সাম্প্রতিক খবর (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়ের) এবং কার্টুনসহ বিভিন্ন বিষয় সংযোজিত হতে থাকে। এছাড়াও বই, গ্রামোফোন রেকর্ডসমূহের সমালোচনাও নিয়মিতভাবে পরিবেশন করা হত। খ্যাতনামা ব্যক্তিদের পরলোকগমনের সংবাদ 'শোকসংবাদ' হিসেবে নিয়মিত প্রকাশিত হত, মহিলা লেখকদের জন্য সম্পাদক জলধর সেন আলাদাভাবে ভেবেছেন তার প্রমাণ ১৩২২ এর কার্তিক সংখ্যা 'মহিলাসংখ্যা' হিসেবে চিহ্নিত। শুরুতে 'মাতৃ-মিশন' নামে মানকুমারী বসুর কবিতা এছাড়া গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, ইন্দিরা দেবী, কামিনী রায় প্রমুখের লেখা ছাপা হয়েছিল। ছোটদের জন্য 'কিশোর জগৎ' একটি বিভাগ যুক্ত হয়েছিল। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায়-কিশোর জগতে ছিল সত্যচরণ ঘোষের লেখা 'সুন্দরবনের বাঘ' নাম লেখা।

ভারতবর্ষকে জনপ্রিয় করেন সম্পাদন জলধর সেন। প্রায় ২৭ বছর তিনি সম্পাদনার কাজে যুক্ত ছিলেন। তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে ১৩৪৬ সংখ্যায় 'জলধর-স্মৃতি তর্পণ' প্রকাশিত হয়। কবি রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে কিংবা জাতীয় জনক গান্ধীজির প্রয়াণে ভারতবর্ষ পত্রিকা যথার্থ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছে বিশেষ স্মরণ সংখ্যা প্রকাশের মাধ্যমে। এছাড়া পত্রিকাতে হিন্দি সাহিত্য কিংবা গুজরাতি সাহিত্যের ক্রমবিকাশ প্রকাশিত হত। 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগে নতুন বইয়ের লেখকদের নাম, মূল্য ও বিষয়বস্তুর কিছুটা বর্ণনা থাকত। আবার 'মাসপঞ্জি' বিভাগে কোনো একটি মাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনার সংক্ষিপ্ত সংবাদ পরিবেশিত হত। 'খেলাধুলা বিভাগে'— ফুটবল, ক্রিকেট, সাঁতার, বিলিয়ার্ড, টেনিস, ব্যায়াম, শরীরচর্চা প্রভৃতি সংক্রান্ত খবর কয়েকটি পৃষ্ঠায় থাকত। পত্রিকার শেষ লগ্নে ব্যক্তিগত দ্বাদশ রাশির ফল ও ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্নের ফল প্রকাশিত হতে দেখা গেছে।

ভারতবর্ষ পত্রিকায় ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, জাদুকর পি.সি. সরকার প্রমুখরা এ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছেন। যামিনী রায়, সুরেশচন্দ্র ঘোষ, চারুচন্দ্র রায় এঁদের ছবি প্রকাশিত হত এই পত্রিকায়। পাশাপাশি সমকালীন সাহিত্যিকদের কবিতা, গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত, সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার প্রাণপুরুষ। শরৎচন্দ্রের তিরোধানের পর ১৩৪৪ ফাল্গুন সংখ্যায় 'অপরাজেয় কথাশিল্পী সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্রের 'জীবন ও সাহিত্য' শিরোনামে একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে— ভারতবর্ষ পত্রিকা।

● **শনিবারের চিঠি :** বাংলা ভাষার অন্যতম বিখ্যাত সাহিত্য-সাময়িকী 'শনিবারের চিঠি' যা বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। এটি ছিল একটি সাপ্তাহিক কাগজ। যোগানন্দ দাস এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তবে আদ্যোপান্ত শনিবারের চিঠির প্রাণপুরুষ ছিলেন সজনীকান্ত দাস। সাপ্তাহিক শনিবারের চিঠির ২৭ তম সংখ্যা ১৩৩১ সনের ফাল্গুন মাসে বেরোনোর পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। পরে ১৩৩৩ সনে পত্রিকাটির তিনটি বিশেষ সংখ্যা বের হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে 'জুবিলী সংখ্যা', আষাঢ় মাসে 'বিরহ সংখ্যা' এবং কার্তিক মাসে 'ভোটসংখ্যা'। প্রকাশ পাবার পর আবার বন্ধ হয়ে যায় পত্রিকাটি। দশ মাস পর ১৩৩৪ সনের ভাদ্রমাসে পত্রিকাটির মাসিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে। কিছুদিন পর সম্পাদক হন নীরদচন্দ্র চৌধুরী। কিন্তু নতুন প্রকাশক সজনীকান্তের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য হওয়ায় নীরদচন্দ্র পদত্যাগ করেন এবং সজনীকান্ত নিজেই সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৩৩৬ সনের কার্তিক মাসে পত্রিকাটি পুনরায় তৃতীয় বারের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। পরে ১৩৩৮ সনের আশ্বিন সংখ্যা থেকে সজনীকান্ত বাবুর মৃত্যু অবধি এটি প্রকাশিত হয়েছে।

'শনিবারের চিঠি' সাহিত্য পত্রিকাটি ১৯৩০-৪০-এর দশকে কলকাতা কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের জগতে বিশেষ সাড়া ফেলেছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পথিকৃত কল্লোল, প্রগতি, কালি-কলম, পরিচয়, পূর্বাশা, কবিতা প্রভৃতি পত্রিকাসমূহের সঙ্গে শনিবারের চিঠির নাম জড়িত হয় অবিচ্ছেদ্যভাবে। রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের সংখ্যায় সংখ্যায় তুলোধনা করে পত্রিকাটির সকলের মনোযোগের কেন্দ্র বিন্দুতে চলে গিয়েছিল। এর সঙ্গে কল্লোল গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব ছিল আক্রমণাত্মক; পাশ্চাত্য আধুনিকতার স্পর্শে উদ্বেলিত কল্লোলযুগের চারপাশ ঘিরে ছিল শনির চক্র। তবে শনিবারের চিঠি সে সময়কার সাহিত্য চেতনাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

শনিবারের চিঠিতে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মোহিতলাল মজুমদার, হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, পরিমল গোস্বামী। এঁদের ভাষা ছিল ব্যঙ্গময়; সমালোচনার লক্ষ্য ছিল পিত্ত জ্বালিয়ে দেওয়া। হাস্যকৌতুকের মাধ্যমে সমসাময়িক সাহিত্য চর্চাকে আক্রমণ করা এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। আর প্রায় সব রচনা বেনামে প্রকাশিত হত। সমকালীন পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ-নজরুল, প্রমথ চৌধুরী সহ কল্লোল গোষ্ঠীর কবিদের লেখা প্রকাশিত হলে, তা শনিবারের চিঠির গোষ্ঠীর মনোপুত না হলে প্যারোডি ও কার্টুনের মাধ্যমে তাদের লেখা নিয়ে চলত রসিকতা। সবচেয়ে বেশি শিকার হয়েছেন নজরুল। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'বিদ্রোহী' কবিতার প্যারোডিসহ প্রতিসংখ্যায় কোনো না কোনো তাঁর কবিতা নিয়ে ব্যঙ্গ করা হত।

'শনিবারের চিঠি' পত্রিকাতে ছিল কয়েকটি বিভাগ— 'সংবাদ সাহিত্য' এই বিভাগে সমকালীন সাহিত্য সংবাদ প্রকাশ করা হত। 'মণিমুক্তা'— এই বিভাগে সমকালীন সাহিত্য নিয়ে তীর্যক মন্তব্য ও থাকত টিপ্পনি। আবার 'প্রসঙ্গকথা' বিভাগে নীরোদচন্দ্র চৌধুরী সমসাময়িক পরিস্থিতি নিয়ে নিয়মিত লিখতেন। এছাড়া ছাড়া হত কার্টুন, প্যারোডি কবিতা, স্যাটায়ারধর্মী ছড়া, গল্প, নাটিকা ও উপন্যাস। ১৯৩৯ সনের শেষ দিক থেকে বদলে যায় এ

পত্রিকার বৈশিষ্ট্য। সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিতর্ক হওয়ার পরে সজনীকান্ত দাসের বোধোদয় হয়। পত্রিকাটি ব্যঙ্গবিদ্রুপ থেকে সরে এসে সৃজনশীল সাহিত্য রচনায় ব্যাপৃত হয়।

- **পরিচয় :** দীর্ঘ প্রায় নব্বই বছর অতিক্রম করে বাংলা সাহিত্য সাময়িকী হিসেবে 'পরিচয়' পত্রিকা আজও সাহিত্য পিপাসুদের কাছে এক অনবদ্য নাম। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই পত্রিকার পথচলা শুরু হয় আধুনিক কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায়। দীর্ঘ বার বছর তিনি ছিলেন এই পত্রিকার মূল কাণ্ডারী। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বর্তমানে এই পত্রিকার ডিজিটাল সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। বিশেষত কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে বিজ্ঞান নির্ভর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় জুন ২০২০ সালে। কথাসাহিত্যিক দেবেশ রায়ের প্রয়াণে বর্তমান সম্পাদক অভ্র ঘোষ ও পার্থপ্রতিম কুণ্ডুর তত্ত্বাবধানে জুনের এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তাছাড়া দেবেশ রায় ছিলেন এই পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক। তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনে দেবেশ রায় স্মরণ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

'পরিচয়' পত্রিকা ষষ্ঠ বর্ষ থেকে মাসিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পূর্বে এটি ত্রৈমাসিক ছিল। প্রথম পাঁচ বছর মলাটে রঙের বদল ছাড়া কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। সূচিপত্র ছাপা থাকত মলাটে। ১৩৪৫ সাল থেকে কয়েকটি সংখ্যায় যামিনী রায়ের ছবি মলাটকে করেছিল শ্রীমণ্ডিত। ১৩৩৮ শ্রাবণ সংখ্যা থেকে অর্থাৎ ত্রৈমাসিক, পরিচয়, পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় মলাটে ছিল গিরিজাপতি ভট্টাচার্যের সুন্দর হাতের লেখায় 'পরিচয়' নামটি। এই নাম দিয়েছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়। তবে পরিচয়ের প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের কোনো লেখা ছিল না। কারণ সম্পাদকমণ্ডলী ঠিক করেছিলেন কবির কাছে তাঁরা কোনো লেখা চাইবেন না। কিন্তু প্রথম সংখ্যা দেখে রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন তা স্মরণযোগ্য— ''যারা ওজন দরে বা গজের মাপে সাহিত্য বিচার করে তাদের জন্য এ পত্রিকা নয়, যারা মননশীল রুচিবান পাঠক তাদেরই উপযোগী এ কাগজ।'' এছাড়া 'পরিচয়' সম্পাদককে উৎসাহ দিয়ে কবি একটি চিঠি লিখেছিলেন। তাতে তাঁর বক্তব্য ছিল এরকম :

''কল্যাণীয়েষু সুধীন্দ্র তোমার কাগজখানি বেশ মর্যাদাবান হয়ে দেখা দিয়েছে— কালিদাস আষাঢ় সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছেন সেটা একে মানায় সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনি:। এই উন্নত ধ্বনিতে যাতে সুর ঠিক থাকে চেষ্টা করতে হবে।''

পরক্ষণে সম্পাদকমণ্ডলী বুঝলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা চাওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তা পূরণও করেছিলেন। দ্বিতীয় সংখ্যাতে তাঁর দুটি চিঠি ও একটি গ্রন্থ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সুধীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'পরিচয়'-এর প্রথম দশ বছরে (কার্তিক ১৩৩৮ — শ্রাবণ, ১৩৪৮) রবীন্দ্রনাথের চিঠি, প্রবন্ধ, কবিতা, গ্রন্থসমালোচনা মিলে ৩৬টি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল।

'পরিচয়' পত্রিকার পুস্তক পরিচয় বিভাগে সমালোচনা সাহিত্যকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। তৎকালে কোনো পত্রিকা সমালোচনা সাহিত্য বিজ্ঞানকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেনি। সেদিক থেকে প্রথম পাঁচবছরে ২০টি সংখ্যায় ৪০১টি গ্রন্থের সমালোচনা করে পরিচয় পত্রিকা বাংলা সাহিত্যে অনন্য নজির গড়েছিল।

- **কবিতা :** 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশের মূলে ছিল কবিতাকে সসম্মানে সুনির্বাচিত পাঠকের দরবারে পৌঁছে দেওয়া। এটি কবিতা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৪২ বঙ্গাব্দ (১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ)। প্রথম দুবছর সম্পাদক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। যৌথ সম্পাদক থাকলেও বুদ্ধদেবই ছিলেন এই পত্রিকার মূল কাণ্ডারী। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল ছয় আনা এবং বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রথম কবি হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর 'তামাসা' কবিতাটি এতে প্রথম ছাপা হয়। এরপর প্রেমেন্দ্র মিত্র এই পত্রিকা থেকে সরে গেলেন এবং তাঁর জায়গায় সম্পাদক হলেন সমর সেন। কিন্তু যুগ্ম সম্পাদক সমর সেন হলেও সম্পাদনা, প্রকাশনা

ও টাকাকড়ির হিসাব রাখতেন বুদ্ধদেব স্বয়ং। তথ্য হিসেবে প্রথম দুবছর সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র, পরের তিন বছর সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু ও সমর সেন এবং তারপর থেকে শুধু সম্পাদক হিসেবে নাম ছাপা হত বুদ্ধদেব বসুর।

১৯৩০ এর দশকে একদল তরুণ কবি বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-প্রভাব উপেক্ষা করে পাশ্চাত্যের আধুনিক কবিতার-রীতি অনুসরণ করে কবিতা রচনায় মেতে উঠেছিলেন। 'কবিতা' পত্রিকা ছিল এ সময়ে আধুনিক কবিদের অন্যতম মুখপত্র। বাংলা ভাষার গদ্যকবিতা সূচনা ও বিকাশ এ পত্রিকার হাত ধরে। সে সময় এই পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিল তরুণ কবিদের আড্ডা — 'কবিতা ভবন' এবং 'কবিতা ভবন প্রকাশনা'।

'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর দীর্ঘপত্র লেখেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুখকর মতামত জানিয়ে। পত্রিকা সম্পাদক ভয়ে ভয়ে কবিগুরুর কাছে কপি পাঠিয়েছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ একখানা তুলোট কাগজে এপিট-ওপিঠ ভর্তি অনিন্দসুন্দর হস্তাক্ষরে প্রশংসা বাণী লিখে পাঠালেন। পাশাপাশি তাঁর গদ্য কবিতা 'ছুটি' তৎসঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। 'কবিতা' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' কবিতা দিয়ে শুরু করলেন। আর কবিতা পত্রিকা প্রকাশের কালে বিস্ময়করভাবে সৃষ্টিশীল রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন বুদ্ধদেবের সারাজীবনের স্বাগত আশ্রয়। এই সময়ে প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ কবিকে লালন করেছে 'কবিতা' পত্রিকা। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, সমর সেন, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অজিত দত্ত, প্রতিভা বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অমিয় চক্রবর্তী, শামসুর রহমান, শঙ্খ ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আল মাহমুদ এবং বুদ্ধদেব নিজেও। শুধু কবিতা ছাপিয়ে বুদ্ধদেবের দায়িত্ব শেষ হয়ে যেত না, পছন্দের কবিকে নিয়ে একের পর এক গদ্যও লিখিয়ে নিতেন তিনি।

কবিতা পত্রিকার যুগকে (১৯৩৫-১৯৬০) বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কবিতার পরিপূর্ণতার যুগ বলা যায়। কবিতা, কবিতা-সমালোচনা, কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। রবীন্দ্র, নজরুল, জীবনানন্দ প্রভৃতি বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশিত হত কবিতা পত্রিকায়। এছাড়া কাব্যের রূপরীতি বিষয়ে খাঁটি গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা বেরিয়েছিল তৃতীয় বর্ষ বৈশাখ ১৩৪৫ সনে, এটি ছিল সমালোচনা সংখ্যা। এতে রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের স্বরূপ', জীবনানন্দ দাশের 'কবিতার-কথা', আবু সয়ীদ আইয়ুবের 'কাব্যের বিপ্লব ও বিপ্লবের কাব্য', বুদ্ধদেবের 'কবি ও তার সমাজ' প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

- **কৃত্তিবাস :** সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায় 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা প্রকাশের পেছনে কোনো সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল না, এর জন্ম অনেকটাই আকস্মিক। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দীপক মজুমদার ও আনন্দ বাগচী এই ত্রয়ীর মধ্যে ছিল এই স্পর্ধিত পত্রিকার প্রাথমিক ভাবনা। কেন না একদল তরুণ প্রতিভাবান উঠতি কবিদের কেন্দ্রে ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যে একটা বিপ্লব নিয়ে এলেন কৃত্তিবাসের হাত ধরে। পরবর্তীকালে এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন— শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু, তারাপদ রায়, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ মৈত্র, অরবিন্দ গুহ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শিবশম্ভু পাল, মনোরঞ্জন রায়চৌধুরী, বরেণ গাঙ্গুলী, ফণীভূষণ আচার্য, বেলাল চৌধুরী, কমলকুমার মজুমদার প্রমুখ গুণীব্যক্তিবর্গ। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে কৃত্তিবাস পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদনায়।

বাংলা সাহিত্যে 'কৃত্তিবাস' এক অন্য ঘরানার সাহিত্য পত্রিকা। 'কবিতা' পত্রিকা সেই সময় বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কবিদের কবিতা নিয়ে চলছে রমরমিয়ে। অথচ সমকালীন প্রথম সারির কবিদের কবিতা না দিয়ে এক দুঃসহ স্পর্ধার নিতান্ত তরুণদের কবিতা নিয়ে প্রকাশ হতে থাকল 'কৃত্তিবাস'। কৃত্তিবাসের জন্য কবি শঙ্খ ঘোষের

খাতা জোর করে এনেছিলেন সুনীল। প্রকাশিত হয় তাঁর 'দিন গুলি রাতগুলি' কবিতাটি। প্রথম সংখ্যা থেকে পঁচিশতম সংখ্যাকে বলা হয় কৃত্তিবাসের প্রথম পর্ব। ষাটের দশকের শুরুতে কলকাতায় এলেন গিনসবার্গ। কৃত্তিবাসের কবিরা বীটানিক কাব্যের অনুরক্ত হয়ে পড়লেন এবং তাঁদের কবিতা হয়ে উঠল তীব্র, উদাসীন, উন্মত্ত, ক্রুদ্ধ, ভয়ংকর, চতুর ও অতৃপ্ত ভাবের প্রতীক।

১৯৬৯ সালের পর কৃত্তিবাস দীর্ঘদিন বন্ধ থাকে। এরপর কৃত্তিবাস আর শুধু কবিতা বিষয়ক পত্রিকা হিসাবে থাকল না, এতে গদ্যও সমানতালে ছাপা হতে থাকে। যাইহোক বাংলা সাহিত্যের একটি অন্য ধরনের সাহিত্য পত্রিকা হল 'কৃত্তিবাস'।

২৪.৪ সারাংশ

যে-কোনো দেশের প্রবহমান রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি হল সাময়িকপত্র। দেশ বিদেশের সভ্যতার অগ্রগতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্তারের প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হয় সাময়িকপত্রে। তাই সমকালীন ঘটনাচক্র, হারিয়ে যাওয়া অতীত এবং আগামী দিনের ইঙ্গিত— এই তিন দিকের স্বরূপ-ই উদ্‌ঘাটিত হয় সাময়িকপত্রে। যুগোপযোগী নবচেতনার উদ্বোধন, পরিপোষণ ও প্রচারের জন্য সাময়িকী তাই একটি সর্বোৎকৃষ্ট সহজবোধ্য উপায়।

উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের সূচনা পর্যন্ত সাহিত্যিক সমাজে তখন একদিকে বঙ্কিম ঘেঁষা রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্যদিকে রবীন্দ্রানুসারী সমাজের বৈদিক দীক্ষা ও উপনিষদের সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতির ভাবধারায় পুষ্ট সাহিত্যিক চিন্তাধারার বিরোধ প্রকাশ্যে আসে সমকালীন সাময়িকপত্রগুলিতে। এই যুগের সাময়িকীগুলি সাহিত্যে শ্লীল বনাম অশ্লীল, সাধু বনাম চলিত ভাষা প্রভৃতি নিয়েও চালিয়েছিল তর্ক। সবুজপত্রের নীতি ও আদর্শের সঙ্গে সংঘাত বেঁধেছিল রক্ষণশীল 'নারায়ণ' বা 'সাহিত্য' পত্রিকার। এই দ্বন্দ্বের ফলে দেখা দেয় অতি আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। সাধু বনাম চলিত ভাষার বিরোধে জয় হয়েছিল চলিত ভাষার, যার জন্মদাতা 'সবুজপত্র'। আবার সাধারণের মনোরঞ্জনে বিবিধ সম্ভারে সজ্জিত ছিল 'প্রবাসী' ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা। 'প্রবাসী' ছিল অলঙ্করণে সর্বোৎকৃষ্ট। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়ও থাকত প্রচুর সাদাকালো ও রঙিন ছবি।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার বলশেভিক আন্দোলনের মাধ্যমে জনতার সমাজতান্ত্রিক সংস্কারের প্রতিষ্ঠা হয়। এর প্রভাবে ভারতেও শ্রমিক অন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। ১৯২০-তে 'নিখিলভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস-এর এবং ১৯২১-এ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়। ফলে এই সময়ে প্রকাশিত 'কল্লোল', 'কালিকলম' ও 'প্রগতি' পত্রিকায় একেবারে নীচের তলার মানুষের সংগ্রাম যন্ত্রণা প্রকাশ পায়। বিদেশি বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুদিত রচনার আধিক্য লক্ষ্য করা যায়— 'কালিকলম' (১৯২৬), 'কল্লোল' (১৯২৩) ও 'প্রগতি' (১৯২৭) পত্রিকায়।

অতি আধুনিক ও প্রগতিশীল মতবাদের পরিপোষক পত্রিকাগুলি হল কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি প্রভৃতি। বিভিন্ন মতের পক্ষে ও বিপক্ষে লড়াইয়ের সহযোগী পত্রিকা হিসেবে 'শনিবারের চিঠি'-র জুড়ি মেলা ভার। কল্লোল, কালিকলম, প্রগতিতে তৎকালীন সমাজের বাস্তবচিত্রটি প্রকাশিত, যাকে ব্যঙ্গের—ভঙ্গিতে আক্রমণ করত সজনীকান্ত দাসের 'শনিবারের চিঠি'।

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা নিয়ে বিশেষ সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ আগের মতো বিশ শতকেও অব্যাহত ছিল। বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত শুধু কবিতার উপর সাময়িকী ছিল 'কবিতা' (১৯৩০)। এর উদ্দেশ্য ছিল কবিতা যাতে ধারাবাহিক উপন্যাসের চাপে কুণ্ঠিত না হয়ে সসম্মানে প্রকাশের পথটি পায়। বিশ শতকের তিন

দশকের পর সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের থেকে পাঠকদের আগ্রহ দেখা দেয় বিনোদন ও জীবনধারণের অন্যান্য উপকরণ দিয়ে সাজানো পত্রিকার প্রতি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পাঠকদের এই প্রবণতা লক্ষ্য করে মন্তব্য করেন ''অধিকাংশ পাঠক গভীর বিষয়ে মনকে নিবিষ্ট করতে নারাজ। উদ্বোধনের চেয়ে উত্তেজনা তারা স্বভাবতই বেশি পছন্দ করে।'' মনোরঞ্জনের উপকরণে সাজানো এই সাংস্কৃতিক পত্রিকাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' (১৯৩১) পত্রিকা। এই পত্রিকার বৌদ্ধিক ভঙ্গি, একে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করেছিল। সুধীন দত্তের পরে 'পরিচয়' পত্রিকা ক্রমশ বামপন্থী সাহিত্যচর্চার নীতি অনুসরণ করে। স্বাধীনতা পরবর্তী অপর উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পত্রিকা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কৃত্তিবাস' (১৯৫৩)। যাইহোক নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে বাঙালি বাঁচিয়ে রেখেছে তার সাহিত্য সংস্কৃতিকে আর এই সাহিত্য-সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও বিপুলতা নানা যুগে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেই বিকশিত হয়েছে।

২৪.৫ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) সাময়িকপত্র বাংলা সাহিত্যের উন্নতি সাধনে কী কী ভূমিকা পালন করেছে তা আলোচনা করুন।

২) বাংলা সাময়িক পত্রের বিকাশে 'পরিচয়' পত্রিকা ইতিহাসের এক দিকচিহ্ন— আলোচনা করুন।

৩) বাংলা সাময়িক পত্রে 'কবিতা' পত্রিকা এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছিল— পরিচয় দিন।

৪) বাংলা সাময়িক পত্রের বিকাশে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার গুরুত্ব নির্ণয় করুন।

৫) ''বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে 'ভারতবর্ষ' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।''— আলোচনা করুন।

৬) 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকাটি ১৯৩০-৪০ এর দশকে বাংলা সাহিত্য জগতে কীভাবে বিশেষ সাড়া ফেলেছিল তার পরিচয় দিন।

৭) 'শনিবারের চিঠি' সমসাময়িক সাহিত্য চেতনাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ও আলোড়িত করেছিল— উক্তিটির যাথার্থ্য বিচার করুন।

৮) 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যোগসূত্রের বিষয়টি তথ্যসহকারে আলোচনা করুন।

৯) কবিতা পত্রিকার যুগকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কবিতার পরিপূর্ণতার যুগ বলা হয় কেন তা আলোচনা করুন।

১০) 'কৃত্তিবাস' বাংলা সাহিত্যে এক অন্য ঘরানার সাহিত্য পত্রিকা — কেন তা বিশদে আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১) 'পরিচয়' ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এক ও অচ্ছেদ্য— কেন লিখুন।

২) 'পরিচয়' ও 'কবিতা' পত্রিকা এক সময় বাংলা কাব্য আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল কীভাবে তা বুঝিয়ে দিন।

৩) 'কবিতা' পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।

৪) ‘কবিতা’ পত্রিকার সম্পাদকদের নাম লিখুন।

৫) ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকার সূচনা অংশে D L Roy কি লিখে গিয়েছিলেন।

৬) ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় কী জাতীয় লেখা প্রকাশিত হত— তার পরিচয় দিন।

৭) ‘শনিবারের চিঠি’ পত্রিকার ‘বিভাগ’ গুলির পরিচয় দিন।

৮) ‘পরিচয়’ পত্রিকার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

৯) টীকা লিখুন— ‘কবিতাভবন’।

১০) ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকার সঙ্গে যে সমস্ত কবিরা যুক্ত ছিলেন তাদের পরিচয় দিন।

২৪.৬ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.।

২) বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।

৩) সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (সম্পাদিত), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

৪) বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিবৃত্ত (১ম ও ২য় খণ্ড)— সন্দীপ দত্ত, গাঙচিল, কলকাতা।

৫) বাংলা পত্র পত্রিকা— সম্পাদক ও সম্পাদনা— তাপস ভৌমিক।

নোটস্

নোটস্

নোটস্